উত্তরবঙ্গ

সাহিত্য-সম্মিলন

ষষ্ঠ অধিবেশন

কার্য্য-বিবরণ

(দিনাজপুর)

দিনাজপুর-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৪

সূচী

উত্তরবঙ্গ

সাহিত্য-সম্মিলন

ষষ্ঠ অধিবেশন

দিনাজপুর।

সূচনা।

এই সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনের পরে দিনাজপুর নগরে পরবর্ত্তী অধিবেশন আহূত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তাহা হইতে না পারায় গৌহাটী-কামাখ্যায় ৬।৭ এপ্রিল (১৯১৩) সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। দিনাজপুর নগরে সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত উহার স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইলে জনসাধারণের উদ্যোগে ৩০শে মাঘ (১৩১৯) ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ডায়মণ্ডজুবিলি-থিয়েটার-গৃহে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। এই সভায় দিনাজপুরের শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব

এম, এ, প্রাজ্ঞ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

প্রথম প্রস্তাব

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বি, এল্

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ হরিচরণ সেন এল্ এম্ এস্

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আগামী গুড্ফ্রাইডের অবকাশে দিনাজপুর সদরে আহূত হইবে। এই সংবাদ সম্মিলনের কেন্দ্র-সভার নিকটে উহার স্থায়ী সম্পাদকের মধ্যবর্তিতায় বিজ্ঞাপিত করিয়া উত্তরবঙ্গেরও অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকগণকে যোগদানার্থ আহ্বান এবং যথারীতি এই সম্মিলনের সভাপতি-নির্ব্বাচনার্থ কেন্দ্রসভাকে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল্

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন-সঙ্ঘটনার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত করা হউক। আবশ্যক হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য-তালিকায় প্রারম্ভিক অধিবেশনে ১২১ জনের নাম লিখিত হইয়াছিল; এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর সভাপতি, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন এম এ বি, এল কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হউক। সম্মিলন-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সমিতি গঠনের ভার এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপরে ন্যস্ত করা হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের নাম

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব
" কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ "
" টঙ্কনাথ চৌধুরী (মালদুয়ার)
" ছত্রনাথ চৌধুরী "
" ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী (বাহিন)
" নগেন্দ্রবিহারী চৌধুরী (হরিপুর)
" করুণাকুমার দত্তগুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার
" নগেন্দ্রনাথ সেন ডেঃ ম্যাজিঃ
" যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল
" বিধুভূষণ ঘোষ
" অন্নদাপ্রসাদ দত্ত

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়-সাহেব এম, এ, প্রাজ্ঞ
" রাধাগোবিন্দ চৌধুরী
" শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী সব্ ইং
" ডাঃ গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী
" মৌঃ ইয়াকুনউদ্দীন আহাম্মদ গভঃ প্লীডার
" রজনীকান্ত বসু
" ললিতচন্দ্র সেন বি, এল্
" মধুসূদন রায় বি, এল্
" যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্
" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্
" গোবিন্দচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্
„ বৃন্দাবনচন্দ্র রায়
„ মাধবচন্দ্র সিকদার বি, এল
„ রমেশচন্দ্র নিয়োগী
„ আশুতোষ গুহ বি, এল্
„ মুন্সী জেহেরউদ্দীন্
„ „ আব্দুল খালেক্
„ ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি,
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ, হেডমাষ্টার জেলা স্কুল
„ তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী
„ সতীশচন্দ্র রায়
„ বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্
„ নরেন্দ্রনাথ লাহিড়া মুন্সেফ
„ হেমপ্রসন্ন রায়
„ মৌঃ মহাতাবউদ্দীন আহাম্মদ
„ শ্যামকরণ দুগার
„ সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল কোষাধ্যক্ষ

উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ই ফাল্গুন (১৩১৯) ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) তারিখের প্রথম অধিবেশনে ৮ই ও ৯ই চৈত্র শুক্র ও শনিবার সম্মিলনের অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছিল, অন্যূন ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক-নিযুক্ত করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক-সমিতির সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত অবিনাশচরণ সেন
„ যতীন্দ্রমোহন সেন
„ কুমুদনাথ সেন

শ্রীযুক্ত হেমপ্রসন্ন রায়
„ লালনচন্দ্র রায়
„ যতীন্দ্রনাথ রায়

সম্মিলনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত তিনটি শাখাসমিতি গঠিত হয়।

সাজসজ্জা-বিভাগ

সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার
" প্রফুল্লকুমার রায় ওভারসিয়ার
" কেদারনাথ ঘটক

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ওভারসিয়ার
" উমেশচন্দ্র ঘটক ঐ
" ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী
" শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আহার্য্য-বিভাগ

সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায়
" কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী
" ডাঃ ব্রজনাথ সান্যাল
" ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বসন্তকুমার সমাজদার
" ললিতচন্দ্র সেন বি, এল্
" উমেশচন্দ্র ঘটক
" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায়
" বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন রায়
" সীতানাথ ভট্টাচার্য্য
" যোগেশচন্দ্র খাসনবিশ
" পূর্ণচন্দ্র রায়

অভ্যর্থনা-বিভাগ

সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বি, এল্	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন
„ লালনচন্দ্র রায়	„ বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্
„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্	„ যতীন্দ্রমোহন সেন
„ যতীন্দ্রমোহন ঘোষ	„ নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্	„ মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্
„ তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী	„ মতিলাল সরকার
„ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	„ শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত
„ করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার	ষ্টেশন মাষ্টার
„ ভূপালচন্দ্র সেন	
„ কুমুদনাথ সেন	আসিষ্টাণ্ট ঐ
„ হেমপ্রসন্ন রায়	

অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উত্তরবঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের মত গ্রহণপূর্ব্বক ১১ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে কেন্দ্রসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, বি, এ, (ক্যাণ্টাব) বার-আট-ল মহোদয় যথা-রীতি এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই নির্ব্বাচন কেন্দ্রসভার ১৫ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে অনুমোদিত হইলে চৌধুরী মহোদয়কে সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি সানন্দে সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত হন।

অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-

সম্মিলনের চট্টগ্রাম-অধিবেশনের দিনও ইষ্টারের অবকাশে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সংবাদ ঐ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে দিনাজপুর-অভ্যর্থনা-সমিতির নিকটে জ্ঞাপনপূর্ব্বক উত্তরবঙ্গ-সম্মিলনের দিন অন্য সময়ে নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। বঙ্গীয়-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি কলিকাতা পরিষদের অনুরোধ অনুসারে এই অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাদের সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন; কিন্তু ১৩১৯ সালের শেষ ও ১৩২০ সালের প্রারম্ভে এমন কোনও সুবিধাজনক অবকাশ পাওয়া যায় না যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইতে পারেন। এই অবস্থায় অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ মহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ সদস্যগণের নিকটে সাক্ষাৎ সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াও এই সম্মিলনের দিন একান্তই পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত বিবেচিত হয় তাহা হইলে অতঃপর কোন্ দিনে তাহা করা যাইতে পারে ইহা স্থির করিয়া আনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে এই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের নামে প্রেরিত প্রতিনিধির নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার মারফতে ১২ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের লিখিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"গত ১০ই তারিখ আপনাদিগকে যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহাতে ইষ্টার বাদ দিয়া অন্য সময়ে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু যোগেশ বাবুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল যে, এখন আর উপায় নাই। সুতরাং যদি আপনারা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে ইষ্টারের ছুটীতেই সম্মিলন আহ্বান করিবেন। তবে একথাও আমাদের বলা আবশ্যক যে, সম্মিলন-

পরিচালন-সমিতির অধিকাংশ বিদ্বজ্জন চট্টগ্রাম যাইতে বাধ্য হইবেন; এবং তজ্জন্য আপনারা ক্ষুণ্ণ হইবেন না। এরূপস্থলে ইষ্টারের ছুটীতে দিনাজপুরে সভা না হইলেই ভাল হয়।"

উল্লিখিত পত্রখানি অভার্থনা-সমিতির ১৪ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের অধিবেশনে বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইলে নানা আলোচনার পর স্থির হয় যে, "পূর্ব্ব সভাতে আগামী ৮ই ও ৯ই চৈত্র শুক্র ও শনিবার সম্মিলনের অধিবেশন হওয়ার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ঐ প্রস্তাবই স্থির রহিল; এবং আগামী ৮ই ৯ই চৈত্র তারিখে সম্মিলনের অধিবেশনের আবশ্যকীয় আয়োজন করা হউক।"

এরূপ নির্দ্ধারিত হওয়ার পরে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি, এইচ্, ডি, প্রমুখ কতিপয় কলিকাতার সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত ও ১৩ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে লিখিত নিম্নোক্ত পত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভা-পতির হস্তগত হয়।

"মান্যবর মহারাজ

শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর

উত্তরবঙ্গ-সহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

আগামী ইষ্টারের ছুটীতে চট্টগ্রামে সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম যে, ঠিক ঐ সময়েই দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেয় স্তবঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিক সমবেত হন, ইহাই

প্রার্থনীয়। কিন্তু একই সময়ে দুইস্থানে অধিবেশন হইলে কোনটিতেই উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা আশানুরূপ হইবে না।

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যদি একই সময়ে দুইস্থানে দুইটি সম্মিলন হয় তাহা হইলে কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিবে। সমস্ত বঙ্গের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র মহারাজ বাহাদুরের নেতৃত্বে সাহিত্যিকদিগের এইরূপ কার্য্য হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে। আমরা সকলে মহারাজবাহাদুর ও দিনাজপুরের জন-সাধারণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন করুন।

আপনাদের কার্য্য কিছু অগ্রসর হইয়াছে বটে, এবং স্থানে স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্রও প্রেরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি আপনারা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি ১৩ ফাল্গুন, ১৩১৯।"

এই পত্রের উত্তরে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে উহার সম্পাদক মহাশয় প্রাগুক্ত সাহিত্যিকদিগকে যে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন মান্যবর ডাক্তার

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ

বিদ্বন্মণ্ডলী সমীপেষু—

সসম্মান নিবেদন মেতৎ :—

আপনারা গত ১৩ই ফাল্গুন তারিখের দস্তখতি একখণ্ড পত্র উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা গিরিজানাথ রায়বাহাদুর সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে মহারাজা-

বাহাদুর এবং দিনাজপুরের জনসাধারণের নিকট আপনারা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। আপনাদিগের ন্যায় সাহিত্যজগতের শীর্ষস্থানীয় মনীষিগণের অনুরোধ দিনাজপুরের জনসাধারণের নিকট অলঙ্ঘনীয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর এবং অভ্যর্থনাসমিতির সকল সভ্যই আপনাদিগের এই যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অবস্থানুসারে এক্ষণে আর দিন পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর কিনা, তাহা পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব চলিতেছে। নানা কারণে সে প্রস্তাব এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর নানা কারণে গত শারদীয় পূজার অবকাশের পর হইতে অনেক সময় কলিকাতা থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কারণে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রস্তাবিত অধিবেশন ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই। গত ৺সরস্বতী পূজার কিছু পূর্ব্বে মহারাজাবাহাদুর দিনাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তৎপর দিনাজপুরে সম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কথা উঠে। তদনুযায়ী জনসাধারণের একটি সভা হইয়া গত ৩০শে মাঘ স্থির হয় যে, আগামী ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সে সময়ে আমরা জানিতাম না যে, চট্টগ্রামে ঐ সময়েই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। চুঁচুড়ার অধিবেশনে এ কথা স্থির হওয়ার কথা প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সে সংবাদ আমরা কিছুই জানিতাম না। তৎপর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে জানান হয় যে, ইষ্টারের অবকাশে চট্টগ্রামে সম্মিলন হইবে, অতএব উত্তরবঙ্গ-সম্মিলন অন্য সময়ে হওয়া উচিত। পরিষদের অনুরোধ অনুসারে আমরা দিন

পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এবং আগামী বর্ষেও শীঘ্র এমন কোন সুবিধাজনক দিন পাওয়া যায় না যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইতে পারেন। এই অবস্থায় আমরা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য সভ্যগণের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করি। আমাদিগের শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর এই ভারাপিত হয় যে, যদি পরিষদের সভ্যগণ অন্যদিন অবধারণ করা একান্তই প্রয়োজনীয় বোধ করেন, তাহা হইলে অন্য কোন্ দিনে উত্তরবঙ্গ-সম্মিলন হইতে পারে তাহা যোগেশবাবু পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া আসিবেন। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ অন্য কোন দিনের উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে গত ১২ই ফাল্গুন তারিখের দস্তখত একখানি পত্র মহারাজা বাহাদুরের নামে যোগেশ বাবুর সহিত প্রেরণ করেন। সেই পত্রে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করেন যে "গত ১০ তারিখ আপনাদিগকে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহাতে ইষ্টার বাদ দিয়া অন্য সময়ে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু যোগেশ বাবুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল যে, এখন আর সে উপায় নাই। সুতরাং যদি আপনারা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ইষ্টারের ছুটিতেই সম্মিলন আহ্বান করিবেন। তবে একথাও আমাদের বলা আবশ্যক যে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির অধিকাংশ বিদ্বজ্জন চট্টগ্রাম যাইতে বাধ্য হইবেন। এবং তজ্জন্য আপনারা ক্ষুণ্ণ হইবেন না, এইরূপ স্থলে ইষ্টারের ছুটিতে দিনাজপুরে সভা না হইলেই ভাল হয়।"

এই পত্র পাইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি পুনরায় এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করেন এবং অন্য কোন সময় অধিবেশন সম্ভবপর নহে এই

বিবেচনায় অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টারের অবকাশেই দিন অবধারণ করিতে বাধ্য হন।

চট্টগ্রামের অধিবেশনে সাহিত্যগুরু শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতি হইবেন ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট গৌরবের বিষয়। সমগ্র বঙ্গের এই সম্মিলনীর গৌরবে আমরা সকলে গৌরবান্বিত। এই সম্মিলনীর সহিত দলাদলি করা বা সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার অভিপ্রায় আমাদিগের মনে কদাপি থাকিতে পারে না এবং নাই। "নায়কপত্রে" আমাদিগের সম্বন্ধে যে সকল কটূক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মহারাজা বাহাদুর এবং দিনাজপুরের জনসাধারণ অতি-শয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় সুধীগণের নামসংযুক্ত পত্রের সহিত ঐরূপ সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপের কারণ হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের উজ্জলরত্ন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইষ্টারাবকাশ ব্যতীত হাইকোর্টে এমন কোন অবকাশ নাই যে, তিনি দিনাজপুরে শুভাগমন করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন। সুতরাং তিনি যে সময়ে আসিতে সক্ষম হইবেন না এইরূপ সময়ে দিন অবধারিত করা পরিচালন-সমিতির পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে কলিকাতার মূল পরিষদ হইতে প্রতিবৎসর অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিই আগমন করিয়া থাকেন। মহাশয়দিগের সকলের চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভবপর না হইতে পারে। উত্তরবঙ্গ হইতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভবপর হইবে। যাঁহারা চট্টগ্রাম যাইতে পারগ নহেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিনাজপুরে আসিলে দুইটী সম্মিলনের কার্য্যই সুন্দর হইতে পারে। আমরা কদাচ সম্মিলন ব্যাপারে

বিরোধ ঘটাইতে প্রস্তুত নহি। আপনারা সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিক-গণের পরিচালক। আপনাদিগের নিকট দিনাজপুরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই মিনতি করিতেছি,—আপনারা দুইটি সম্মিলনই যাহাতে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনাদিগের উৎসাহ-বাক্যই আমা-দিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। একই সময় দুইটি কেন, অবস্থানুসারে যত অধিক সম্মিলন হইবে ততই সাহিত্য-পরিষদের এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। আপনাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি,—সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনারা সচ্ছন্দচিত্তে আমা-দিগের এই শুভ-অনুষ্ঠানের সহায়তা করুন এবং মহারাজ বাহাদুরের নিকট যে অনুরোধ-পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করুন। ইতি ১৮ই ফাল্গুন সন ১৩১৯ সাল।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে
বিনয়াবনত—
শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

ইতিমধ্যে নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়ের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্ মহাশয় সাক্ষাৎ করিয়া রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজ-পুর-অধিবেশন ইষ্টারের অবকাশে স্থগিত রাখার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তদনুসারে মাননীয় বিচারপতি চৌধুরী মহোদয় কেন্দ্রসভার সম্পাদকের নামে ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) ১২ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে ইষ্টারের ছুটীতে সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য নিম্ন-লিখিতরূপ টেলিগ্রাম করেন।

Surendrachandra Roychoudhury Secretary Parishad
Rangpur.

Sarada Babu requests postponement Rangpur Parishad as Sahitya Parishad meets Chittagong during Easter Holidays so please postpone.

Chaudhuri

মাননীয় চৌধুরী মহোদয়ের এই টেলিগ্রামের উত্তরে কেন্দ্রসভার সম্পাদক মহাশয় ১৩ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন—

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়
১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

মাননীয় বিচারপতি
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় সমীপে—

নমস্কারপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন,—

মহোদয়ের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছি।

আগামী ইষ্টারের অবকাশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের দিন অন্য কোনও উপযুক্ত অবসর বর্ষমধ্যে না থাকায় বাধ্য হইয়া স্থির করা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন অন্য সময়ে নির্দ্দিষ্ট করার জন্য আমরা বহুপূর্ব্বে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বস্তুগত্যা ৪ দিন মাত্র অবকাশ চট্টগ্রাম-সম্মিলনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদিগের সম্মিলনের দিন স্থগিত করিলেও উত্তরবঙ্গ হইতে অতি অল্প লোকই ঐ সম্মিলনে যোগদান করিবে। কেন না চট্টগ্রাম যাতায়াত বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ এবং উহার প্রধান আকর্ষণ চন্দ্রনাথ-তীর্থদর্শনের সময় মাত্র

৪ দিন অবকাশে যাতায়াত ও সম্মিলনে যোগদানের পর কিছুতেই কুলাইবে না। এ কারণে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, আগামী পূজার অবকাশে ঐ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলে বঙ্গের সকল স্থান হইতে সাহিত্যিক-সমাগমের সুবিধা হইত। এদিকে ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে সম্মিলন না করিলে একত্র এমন দুই দিনও ছুটী দেখিতেছি না, যে তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যোগদান করিতে সক্ষম হইবেন। আসাম হইতে আমাদিগের যে সকল উৎসাহী সভ্য বর্ষে বর্ষে সম্মিলনে শুভাগমন করেন তাঁহাদের পক্ষে আসাই একরূপ দুর্ঘট হইবে। আপনি সভাপতিরূপে উত্তরবঙ্গে শুভাগমন করিতেছেন ইহা অবগত হইয়া সকলেরই আমাদিগের এই সম্মিলনে যোগদান করার উৎসাহ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অসুবিধা করিয়া অন্যসময়ে সম্মিলন করা সঙ্গত হইবে কিনা বিবেচনা করিবেন। পূজার অবকাশে দিনাজপুর সম্মিলন সফল হইবে না। কেন না এখানে এমন কোনও আকর্ষণ নাই যাহাতে গৃহ, অথবা স্বাস্থ্যকর স্থানে না গিয়া সাহিত্যিকগণ ঐ সম্মিলনে যোগদান করিতে সম্মত হইবেন। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন কোচবিহার অথবা জলপাইগুড়ীতে হইবার সম্ভাবনা আছে। এই উভয় স্থানেই মার্চ্চ হইতে এপ্রিল মাসেই মহারাজার ও রাজার উপস্থিত থাকার কাল। সুতরাং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সম্মিলন করিয়া ৬ মাস মধ্যে আবার সম্মিলন করা আমাদিগের ক্ষুদ্রশক্তি পরিষদের পক্ষে অসম্ভব কিন্তু বৃহৎ পরিষদের পক্ষে সহজসাধ্য। বৃহৎ পরিষদের অধিবেশন পূর্ব্বে একবার পূজার অবকাশে মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আলয়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

এই সকল নানা কারণে আমরা দিন-পরিবর্ত্তন করিতে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকার প্রাদেশিক-সমিতির অধিবেশন

হওয়া সত্ত্বেও যখন কলিকাতা পরিষদের অধিবেশন পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতর প্রধান নগর চট্টগ্রামে হইতেছে, তখন এই ক্ষুদ্র সম্মিলন অনিবার্য্য কারণে সেই সময়ে সঙ্ঘটিত হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য একই সময়ে তিনটি সম্মিলনের সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছে; কিন্তু আশানুরূপ লোক সমাগম হইবে না বলিয়া কোনও সম্মিলনেরই জীবননাশ হইতে দেওয়া সুধী-মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে। অপিচ প্রত্যেক স্থান হইতে যাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কলিকাতা পরিষদের নেতৃবর্গকে ইহা জানাইয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। উত্তরবঙ্গের উদীয়মান নিজস্ব একটি অনুষ্ঠানে এরূপ ভাবে বাধা প্রদান করিলে আদৌ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। নানা কারণে উত্তর-বঙ্গের নিজস্ব সম্মিলনকে জীবিত রাখিতেই হইবে, ইহা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। উত্তরবঙ্গের এই নিজস্ব অনুষ্ঠানে কেবল উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই উৎসাহ। কলিকাতা হইতে সহানুভূতি প্রদর্শিত হইলেও প্রতিনিধি সমাগম খুব কমই হইয়া থাকে। বঙ্গীয় সম্মিলনের বৃহৎ অনুষ্ঠানে সর্ব্ববঙ্গের ন্যায় উত্তরবঙ্গের সহানুভূতি থাকিলেও সাহিত্যিক দীনতাহেতু গমনার্থীর সংখ্যা অতি কম। এরূপ অবস্থায় এক সময়ে দুই সম্মিলন হইলেও কোনও সম্মিলনেরই যে বিশেষ অসুবিধা হইবে তাহা আমার মনে হয় না। আপনার নিকটে প্রেরিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণসহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত প্রতিনিধির উপস্থিতির তালিকা পাঠ করিলেই আপনি এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আপনাকে সমস্ত অবস্থাই খুলিয়া লিখিলাম। এক্ষণে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন। সম্মিলনের দিন-নির্ণয়ের জন্য কেন্দ্রসভায় আপনার মতই অগ্রগণ্য হইবে। কেন্দ্রসভার বিগত অধিবেশনের নির্দ্ধারণের একপ্রস্থ নকল এতৎসহ পাঠাইলাম। আপনার পত্র পাইলে পুনরায় আর একটি অধিবেশন আহ্বান করিয়া দিন স্থির করা হইবে। অবশ্য আপনার নিজের এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের সকল স্থান হইতে প্রতিনিধিগণের আগমনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন।

দিনাজপুর হইতেও কলিকাতা-পরিষদের এবং আপনার মতামত গ্রহণার্থ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল মহাশয় কলিকাতায় গিয়াছেন।

ভবদীয়

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির মত পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় এবং কলিকাতার সাহিত্যিকগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও কেন্দ্র-সভার নির্দ্দেশমত অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা ১৪ই ফাল্গুন (১৩১৯) ৫ই মার্চ্চ (১৯১৩) তারিখে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

প্রস্তাব

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ভিন্ন স্থানের প্রথিতনামা সাহিত্যিক-বর্গের বিশেষ অনুরোধ উপেক্ষা করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় আগামী ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়ার যে প্রস্তাব ছিল তাহা পরিত্যাগ করা হউক।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা ১৭ই ফাল্গুন (১৩১৯) ৮ই মার্চ্চ (১৯১৩) তারিখে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের

সভাপতিত্বে আহূত উহার এক অধিবেশনে স্থির করেন যে, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আগামী দশহরার অবকাশে ৩০।৩১শে জ্যৈষ্ঠ শুক্র ও শনিবার আহূত হইবে। তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহ্বান-পত্রাদি প্রেরিত হয়।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন

কার্য্য-বিবরণ।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণ

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সভাপতি

" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ও
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক

" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ঐ

" বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মুন্সেফ

" যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাইরী-ফার্ম্ম

" মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী

শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর এম, আর, এ, এস্ জমিদার
„ ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার
„ গোবিন্দকেলী মুন্সী ঐ
„ অনাথবন্ধু চৌধুরী ঐ
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
„ দীননাথ বাগছী বি, এল্
„ উমাকান্ত দাস বি এল্
„ কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
সহঃ সম্পাদক রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
„ মদনগোপাল নিয়োগী ঐ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ
„ বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর, পল্লী-পরিষৎ
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
„ শশিমোহন অধিকারী সম্পাদক "বঙ্গজননী"
„ ধরণীধর অধিকারী
„ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান কর্ম্মচারী রঙ্গপুর
জমিদার সভা
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল রঙ্গপুর-পরিষৎ কর্ম্মচারী
„ কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার
„ সতীশচন্দ্র নিয়োগী
„ ভুবনমোহন সেনগুপ্ত
„ অনন্তকুমার দাস গুপ্ত পরিষদের চিত্রশিল্পী

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

শেখ রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদ

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সদস্য

শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগছী
- „ মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
- „ সুধীরকুমার রায় চৌধুরী
- „ নগেন্দ্রনাথ সরকার, ছাত্র-সভার সম্পাদক
- „ ভবশঙ্কর চৌধুরী
- „ হরিদাস বাগছী
- „ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী
- „ মাখনলাল রায়
- „ হেমচন্দ্র সমাজদার
- „ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
- „ চারুচন্দ্র সরকার
- „ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মালদহ

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ
- „ বিনয়কুমার সরকার এল, এ
- „ প্রমথনাথ মিশ্র
- „ রাধিকানাথ সিংহ
- „ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার
- „ রাইকিশোর পরামাণিক, মোক্তার
- „ ডাক্তার বৈষ্ণবচরণ দাস

শ্রীযুক্ত নবকুমার মজুমদার
„ শরচ্চন্দ্র দাস (গম্ভীরা গায়ক)
„ কুমুদনাথ লাহিড়ী
„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ সম্পাদক
জাতীয় শিক্ষা-সমিতি
„ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
„ ডাক্তার নলিনীকান্ত বসু
„ প্রসন্নকুমার রাহা (উকীল)
„ কালীপ্রসন্ন সাহা (উকীল)
„ ভূতেশচন্দ্র দত্ত (উকীল)

কোচবিহার

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুস্তফী

আসাম

(কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী, এম, এ,
„ গোপালকৃষ্ণ দে, সহকারী সম্পাদক
„ নিশিকান্ত বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক গৌহাটী বালিকাবিদ্যালয়
„ আনন্দরাম চৌধুরী লেবরেটারী আসিষ্টাণ্ট, কটন কলেজ

(গৌহাটী সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম, এ, সম্পাদক
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ,
„ রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত মীর মোজাম্মিল হোসেন

„ প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, বি, এ,

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

„ পণ্ডিত রমেশ চন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী

বগুড়া

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বি, এল, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার "সীতা-নির্ব্বাসন" প্রণেতা

„ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্

„ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার

„ ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র রায় অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট

„ ললিতচন্দ্র দাস সেরেস্তাদার মুন্সেফকোর্ট

„ নরেন্দ্রনাথ তরফদার শিক্ষক করোনেশন ইনষ্টিটীউসন

„ ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন "নির্ম্মলা" রচয়িতা

„ রমেশচন্দ্র রায়

„ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল,

„ নরেশচন্দ্র বসু বি, এল,

„ ভবানীচরণ মজুমদার, উকিল

„ পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য

„ সত্যভূষণ উপাধ্যায় ছাত্র-সভ্য

„ মহেন্দ্রচন্দ্র সেন „

শ্রীযুক্ত নীলমণি সান্ন্যাল ছাত্র-সভ্য
,, ভবেশচন্দ্র চৌধুরী ,,
,, যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার, বি, এস্‌সি
,, সারদানাথ খাঁন বি, এল
,, সতীশচন্দ্র শর্ম্ম নিয়োগী জমিদার আদমদীঘি
,, যতীশচন্দ্র সান্ন্যাল
,, মতিলাল সেন বি, এল
,, সুরেশচন্দ্র সেন জামালগঞ্জ
,, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, উকীল
,, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল সম্পাদক-সাহিত্য-সমিতি

রাজসাহী

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল,
,, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্, এ, পি, আর্, এস্
,, শ্রীরাম মৈত্রেয়
অধ্যাপক ,, পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ সম্পাদক রাজসাহী শাখা
সাহিত্য-পরিষৎ
,, ,, রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ
,, ,, রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, সম্পাদক
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি

পাবনা

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, এম, এ,
বি, এল, সম্মিলন-সভাপতি

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী

„ কালীকান্ত বিশ্বাস

অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিকগণ।

ঢাকা

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় (সঙ্গীতাচার্য্য)

„ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,

„ প্রসন্নকুমার বণিক্য

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত রওশন আলী চৌধুরী সম্পাদক (কহিনূর)

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল্ এটর্নী আট্-ল

„ পাঁচকড়ি বন্দ্যাপাধ্যায় বি, এ সম্পাদক “নায়ক”

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ

„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ঐ

„ অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, পি, আর্, এস্,

„ পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক

„ জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ আই, সি, এস্

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক “সাহিত্য”

„ জলধর সেন সম্পাদক “ভারতবর্ষ”

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

বহরমপুর

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ

কৃষ্ণনগর

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ

কার্য্য-প্রণালী

৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মধ্যাহ্নকাল ১২॥০
ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা।

১। অভ্যর্থনা সঙ্গীত।

২। মঙ্গলাচরণ।

৩। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

৪। সভাপতি নির্ব্বাচন।

৫। সঙ্গীত।

৬। সহানুভূতি বিজ্ঞাপকগণের নামোল্লেখ।

৭। সভাপতির অভিভাষণ।

৮। স্বর্গগত সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ।

৯। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক কর্ত্তৃক বিগত বর্ষীয় কার্য্যাবলীর উল্লেখ।

১০। বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

প্রথম দিন—৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

সময়—১২॥ টা হইতে ৩ টা।

সম্মিলনের অধিবেশন ৩০ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে এরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সভাপতি সহ যে ট্রেণ ৬ টা ৭ মিনিটের সময় দিনাজপুরে পৌছিবার কথা তাহা প্রায় বেলা ১০টার সময় আসায় ৮ টার পরিবর্ত্তে বেলা ১২॥ টার সময় সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করা হইবে ইহা সহরময় ঘোষণা করা হয়।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় মোটরগাড়ী যোগে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, কেন্দ্রসভা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, বি, এ, আই, সি, এস্ মহোদয়দ্বয় সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপনীত হন। বিরাট জন-মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় প্রথম সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন যে, রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের যে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, সেদিন এই সম্মিলন শক্তিসঞ্চার করিয়া সমস্ত উত্তরবঙ্গে আপন প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা বুঝিতে পারা যায় নাই। আজ বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ সাহিত্যপোষক মহারাজের আহ্বানে একত্রিত হইয়া মাতৃভাষার সেবা-যজ্ঞে সম্মিলিত

হইয়াছেন দেখিয়া প্রাণের আনন্দের সহিত এই সভার কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

প্রারম্ভিক সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয়ের আদেশে ঢাকা, উয়ারী নিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচিত নিম্নোক্ত মঙ্গলাচরণ গীতি গীত হইল।

জয় জয় সতি সুরভারতি ভারতসুখ-কারিণী,
ইন্দু-কিরণ কুন্দ-কুসুম সুন্দর রুচি-ধারিণী।
ত্বমসি শরণমিহ বুধজন, সকল কলুষ-নাশিনী,
করুণাসিন্ধু বারিবিন্দু দানৈর্বুধ তোষিণী।
ত্বমসি ভারতি সজ্জনগতিরিহ ত্রিতাপ-হারিণী,
ত্বমসি শক্তিরেকভক্তি রত্নমুক্তিদায়িনী।
এহি এহি দেহি দেহি জ্ঞানমাত্মরূপিণী,
দেহি কর্ম্ম দেহি শর্ম্ম ধর্ম্মভাববর্দ্ধিনী।
বাদয় ইহ পুনরহরহঃ সুন্দর পরিবাদিনী,
ভবভৈরব নটদীপক রাগৈর্জন মোহিনী॥

শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ সোম ও তাঁহার সহকারিগণ দিনাজপুর-রাজ-সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় রচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গান করিলেন—

সারঙ্গ-সুরফাঁকতাল।

গান

স্বাগত হে বঙ্গভূমি-তনয় সকল ;
ভারতের রত্ন সবে বিদ্যার মঙ্গল।

হৃদয় ভূমিতে এই প্রীতির আসনে
সুখী কর বসি সুখে নত ভ্রাতৃগণে ॥
ভক্তিপুষ্পে অর্ঘ্য পূত আনন্দাশ্রুজলে
ধর ধর আশুতোষ ! ধরহে সকলে ॥
ক্ষমহে আতিথ্য দোষ এস সবে মিলি
সে অমৃত বঙ্গবাণী-পদসেবা করি ॥
সকলের হৃদয় ভরুক সেই সুখে
সকলের ভেদবুদ্ধি যাক তাতে ঢেকে ॥
বিশ্বপতি দয়ারসে সে বঙ্গ রসনা ।
গঙ্গাসম সকলের পূরা'ক কামনা ॥

স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিলেন।

স্তোত্রপাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় নিম্নোক্ত "অভ্যর্থনা" কবিতা পাঠ করিলেন—

অভ্যর্থনা

কোরাস্

সাহিত্যিক-রথী—এস গো অতিথি,
এস গো তোমরা সবে,
তোমাদের পুণ্য পরশে সবার
এদেশ ধন্য হবে।

বাণীর-ভকত-সন্তান তোমরা
সেবিছ যতনে তায়,
তোমাদের পুণ্য কীর্ত্তিকলাপ
দেশ-বিদেশে গায়।

আরম্ভ।

দিনাজপুরবাসি, মনামদে আজ
মুরজ মন্দিরা বাজাও এস্‌রাজ,
কর সবে মিলে সুমঙ্গল গান
হৃদয়ে বহুক আনন্দ তুফান
এ দিন যেন না বিফলে যায়।

আন সবে ফুল্ল কুসুম তুলিয়া
যূঁই বেলা যাতী চামেলী মতিয়া,
দশদিক গন্ধে ক'রে ভরপূর
কুসুম চন্দন ছিটাও প্রচুর
আতর গোলাপ মাখিয়া তায়।

রোপি রম্ভা তরু প্রতি গৃহদ্বারে
মঙ্গল কলসী রাখ তার ধারে,
চ্যুতপত্র ফুল একত্র গাঁথিয়া
পথ-ঘাট দ্বার রাখ সাজাইয়া
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লইয়া করে।

দাও উলুধ্বনি পুরনারীগণ
লও আসি সবে করিয়া বরণ
বাণী-পুত্র সবে, যাদের প্রভায়
আলোকিত দেশ—জয়গীতি গায়
ধন্য বঙ্গমাতা অবনী প'রে !

কোরস্

এস গো অতিথি—সাহিত্যিক-রথী
এস গো তোমরা সবে,
তোমাদের পুণ্য পরশে সবার
এ দেশ ধন্য হবে।

বাণীর ভকত সন্তান তোমরা
সেবিছ যতনে তায়,
তোমাদের পুণ্য কীর্ত্তিকলাপ
দেশ-বিদেশে গায়।

যে দেশে এসেছ বাণী-পুত্রগণ,
সে দেশে আছিল বীর অগণন,
আছিল সে দেশে কবি চিত্রকর,
সে দেশে আছিল শিল্পী বহুতর,
বিজ্ঞান-জ্যোতিষ, সে দেশের ভাষা,
সে দেশের জ্ঞান সে দেশের আশা,
কিছু ক্ষুদ্র নহে রাখিও মনে।

ষষ্ঠ অধিবেশন

কবি নহি আমি   নহি চিত্রকর,
সে চিত্র আঁকিয়া   দেখাব সুন্দর,
হ'ত কালিদাস   রাফেল মিল্টন,
ব্যাস কি বাল্মীকি   হোমর বায়রণ,
রুমি টিসিয়ান   সাদি, টেনিসন,
কিংবা চিত্রকর   চৈন কোন জন,
দেখাইত তারা   সে দৃশ্য আঁকিয়া,
শ্রোতা কি দর্শক   থাকিত চাহিয়া,
দেহ রোমাঞ্চিত   ভাবে গদ গদ
পাইয়া অমূল্য   বাণীর-সম্পদ,
আনন্দের ঢেউ খেলিত প্রাণে।

হেথা,

পরিখা প্রাচীর   কত সরোবর,
ভগ্ন অট্টালিকা   ইষ্টক প্রস্তর,
যুগ যুগান্তের   ইতিহাস নিয়া
এখনো তাহারা   রয়েছে পড়িয়া,
কত হাসি অশ্রু   উত্থান পতন
চিহ্ন রেখে তায়   গেছে অগণন
প্রত্নতত্ত্ববিদে   দিবে পরিচয়
শতজিহ্ব হয়ে   সে সবে নিশ্চয়
কত সে কাহিনী অতীত কথা।

হেথা,

উত্তর গোগৃহে   হের কুরুসেনা
ঊর্ম্মিমালা মুখে   যেন চূর্ণ ফেণা,

নিনাদিছে শঙ্খ বীর শত শত
হুঙ্কারিছে মত্ত সৈন্য অবিরত
হের পিতামহে ভীষ্ম মহাবীরে
দ্রোণ কর্ণ আদি হের সে দ্রোণীরে,
কি ভীষণ রণ ভাবি একবার
একা ধনঞ্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী তার!
কি অপূর্ব্ব শিক্ষা অপূর্ব্ব সন্ধান
মূর্চ্ছাগত সেনা সবে হতজ্ঞান
অথচ কেহ না পাইল ব্যথা।

হেথা,

ভগ্ন অবশেষ দেখ আছে প'ড়ে
কালের মাহাত্ম্য জানাইতে নরে
বাণ-রাজপুরী প্রস্তরনির্ম্মিত
কারুকার্য্যে যাহা আছিল খচিত।
ভাব একবার সমৃদ্ধি উহার
কি ছিল, এখন কিবা আছে আর
শত কণ্ঠে যাহা হ'ত মুখরিত
শত দীপালোকে হ'ত উদ্ভাসিত

তাহে,

ঘোর অন্ধকার রাজ্য বিস্তারিয়া
শৃগাল শ্বাপদে বক্ষে আবরিয়া
আর্ত্তনাদ শুন করিছে কত!
দিনাজপুর-রাজ সে পূর্ব্ব পুরুষ
প্রাণনাথ রায় কীর্ত্তিতে নহুষ,

লোক হিতকর শত কার্য্য করি
অমর যাহারা নর-দেহ ধরি।
হের তাহাদের কীর্ত্তি অতুলন
গোপাল মন্দির, কান্ত-নিকেতন,
নানাদেশে যার প্রতিকৃতি নিয়া
রাখিয়াছে সবে আদর করিয়া
শিল্প শোভা যার, সে ভক্তি সম্পদে
পূর্ণ হবে মন শ্রীকান্ত শ্রীপদে
ক্ষণ তরে যার বাসনা যত।
সাহিত্যিক রথী এস গো অতিথি
এস গো তোমরা সবে ;
তোমাদের পুণ্য পরশে সভার
এ দেশ ধন্য হবে।
বাণীর ভকত সন্তান তোমরা
সেবিছ যতনে তায় ;
তোমাদের পুণ্য কীর্ত্তি কলাপ
দেশ বিদেশে গায়।

অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার নিবেদন পাঠ করিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন—

মা বাগ্বাদিনী বীণাপাণি! আজ অকৃতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদিত হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমারই ভক্ত, তোমারই

সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজি আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ বীণাপাণির বরপুত্রগণের সমাগমে দিনাজপুর সারস্বত-তীর্থ বলিয়া গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনবৃন্দ! এই গ্রীষ্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত, তদুপরি অসাময়িক বর্ষায় উৎপীড়িত ও প্রবাসের নানা অসুবিধা অভাবের মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থবোধ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে অনভ্যস্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অসমাদর, কতই অসুবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমাদের সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এত অসুবিধা, এত অযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমরা এই দুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কারণ আমরা জানি, আপনাদের সেবা করিলে—আপনাদের পরিচর্য্যা করিলে বীণাপাণি সরস্বতীরই পূজা করা হয়। যাঁহারা উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম-আকাঙ্ক্ষায় মানস-আকাশে বিশ্ব-প্রেম অনুভব করিতে পারেন, কল্পনার-রাজ্যে যাঁহারা বাস্তবতা আনিতে উপযুক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গমে যাঁহারা দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, সংসারের কল্লোল-কোলাহল মধ্যে অশান্তিকর বিষয়লিপ্সার পার্শ্ব দিয়াও যাঁহারা ভাবরাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে ও প্রেমরাজ্যে বিচরণ করিতে অধিকারী, খরতর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়-সরসী প্রেমের শান্তিময় কুসুম-সৌরভে আমোদিত,—তাঁহারা যে ভগবান্ পঞ্চাননের আত্মপ্রসাদের ন্যায় আমাদের পূজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্য বিল্বদলে প্রীত ও হৃষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাজপুরবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি

নারায়ণ, বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি।

আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্মৃতি, কতই অতীত কীর্ত্তি, কতই আর্য্যগীতি স্মরণ হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী এই দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আর্য্য ও প্রাচ্যের মিলন-রঙ্গস্থলী বলিয়া ধন্য হইয়াছিল। এখানকার 'সদানীরা' যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত স্রোতস্বতী বলিয়া গণ্য নহে; কিন্তু স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্য জলসিক্তা পবিত্রসলিলা 'সদানীরা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ইহারই তীরে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আর্য্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন-কালে এই স্থানই জ্যোতিষিক ও কোটিবর্ষ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থানেই খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোটিবর্ষীয় নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক সময়ে লীলাস্থলী ছিল। বাণরাজবংশের যত্নে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাঁহাদের যত্নে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কীর্ত্তি—কতই দেবসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই কীর্ত্তিসৌধ কালের করাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা সভ্যজগতের নিকট গৌড়-শিল্পের উজ্জল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই বাণবংশ ও গৌড়ের পালবংশের বহুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই দিনাজপুর জেলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব-উদ্ধারের এত দিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" সেই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কেবল গৌড়-বঙ্গবাসী বলিয়া নহে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের পাত্র ও আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখানে যেমন অতি

পূর্ব্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ত্তী কালেও ভারতের বাহিরে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে সুদূর চীনসমুদ্রতটবর্ত্তী অধুনা কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত সুপ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, অদ্যাপি দিনাজপুর-রাজবাটীতে রক্ষিত সেই কাম্বোজান্বয়ের শিলালেখ হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুদ্রকূলবর্ত্তী কম্বোজ হইতে বর্ম্মনৃপতিগণের শত শত শৈবকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শৈব-রাজবংশই সম্ভবতঃ কেহ কেহ এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সহিত কাম্বোজীয় শৈবকীর্ত্তি-স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই কাম্বোজবংশই পরবর্ত্তী জনপ্রবাদে পরম শৈব বাণরাজবংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে কিনা তাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আধিপত্যকালে ভারত-বহির্ভূত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনও তাহারা এই জেলার নানাস্থানে বাস করিতেছে। এই সকল জাতির প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি কর্ত্তব্য। উক্ত কাম্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন এই জেলার নানাস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার বুদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ দর্ভপাণির প্রশস্তি ও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্ব্বত্রই মহীপালের গান গীত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে এখানকার অতীতকীর্ত্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের ন্যায় এখানেও মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্প্রদায়েরও প্রতিপত্তি প্রসারিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শাক্ত-

প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। আপনারা গোপীচাঁদের গানে হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নাম শুনিয়াছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানাস্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে, স্বহস্তে বলি দিয়া থাকে, এমন কি কোন কোন গ্রামে তাহারা অগ্রে পূজা না করিলে অপর কেহ শক্তিপূজা করিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবের ও অপূর্ব্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবশ্যই আপনাদের অনুসন্ধেয়। মুসলান-প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন এবং তাঁহাদের পদার্পণে এই জেলার নানা-স্থানে দরগা, মস্‌জেদ ও তকৃত নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে মুসলমান পীরের আস্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আস্তানার সংবাদ দিতেছি, পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫॥০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাই সা নামক এক পীরের আস্তানা এবং তাহারই নিকট বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে। উক্ত বৌদ্ধস্তূপের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল-স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরেও বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের ২॥০ ক্রোশ পশ্চিমে যোগীগুফা নামে একটি বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে। ইহার চারিদিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন ক্রোশ দূরে বুদালস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোট নাম হইয়াছে কি না, তাহাও আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইরূপে এই জেলার নানাস্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু

কীর্ত্তি নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজা গণেশের অভ্যুদয়। তিনি আমাদের উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকার দত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি "দত্তখান" বলিয়া পরিচিত। সেই মহাত্মা মুসলমান-প্রভাব খর্ব্ব করিয়া সমস্ত গৌড়-মণ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার যত্নে গৌড়ীয় হিন্দু-সমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ দাতা ছিলেন। বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাস তাঁহারই নিকট পূজা পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাদের দেখিবার, ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে বুঝিয়াই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি।

আমি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নহি, অথবা সাহিত্যিকগণের মধ্যেও একজন সামান্য সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার রাখি না। আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং আপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যবোধে সেই সকল কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আশা করি, আমার ধৃষ্টতা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই আজ কর্ত্তব্যবোধে আপনাদের নিকট

উপস্থিত করিলাম। ইহাতে যদি কিছু আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, আপনারা দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণটুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

আজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার অবসর দিয়া বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল স্থানের বঙ্গজননীর কৃতীসন্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এই শুভ-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হউক, উত্তরবঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাণীর কল্যাণে আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই পরম মঙ্গলালয় ভগবানের নিকট ও আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন বি, এল্, মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্; বি, এ, (ক্যাণ্টাব) বার-আট্-ল, মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, মহাশয় সভাপতি মহোদয়ের নানা বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্, মহাশয় নিজের স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন—বাঙ্গালার মধ্যে এমন একজন লোকও বর্ত্তমান নাই যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভা-পতির আসন গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারে। এ প্রস্তাব আর অনুমোদনের আবশ্যক নাই। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ইনি সমুদ্রতীর পুরীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাগ্‌যন্ত্রের পীড়া নিবন্ধন ইনি

স্বীয় অভিভাষণের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা অবশিষ্টাংশ পাঠ করাইবেন।

অতঃপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্; বি, এ (ক্যান্টাব) মহোদয় মাল্য বিভূষিত হইয়া তুমুল করতল নিনাদের মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ডাকিয়াছেন তাই আসিয়াছি। আমার এখন চিকিৎসকের আজ্ঞা অবহেলা করিবার বয়স নহে। গত রবিবারেও আমি মনে করিনাই যে সম্মিলনে যোগদান করিতে পারিব।

এই দিনাজপুরে আমি জজ সাহেবের আদালতে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বে অর্থের জন্য আসিয়াছিলাম এবার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া আসিয়াছি। অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি নিজেই যতদূর পারি অভিভাষণ পাঠ করিব অবশিষ্টাংশ অপরে পাঠ করিবেন এজন্য আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সভাপতি মহাশয় অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করিবার পর অবশিষ্টাংশ "নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় পাঠ করিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ

প্রাচীন ঋষিরাও সভা-সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতি-ছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি, তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

"সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
চেনা সংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর সঙ্গতেষু॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নামবৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্বো মনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহবা।
তদাবর্ত্তায়ামাস ময়ি বো রমতাং মমঃ॥"

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন। আমি যেন উপস্থিত পিতৃ-দিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসর্গের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই, স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আদি-কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকার-ভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি, তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি! ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে

অনার্য্যভাব জিহ্বাগ্রে অনার্য্যভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা। আমাদের কিসের অধিকার আছে? নির্ম্মল হৃদয় নির্ব্বাক্, অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ম্মিনী, পঙ্কিল পদে সে পথে চলা যায় না। অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে, আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

"ইদং ধাতুং ন আভর পিতা পুত্রভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন্ পুরুহূতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরসীমহি॥"

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন। সচন্দ্র জ্যোতিঃ-প্রকাশিতনেত্রা উষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী আলোক বিকাশিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা; আমরা নিদ্রাতুর, কখনও তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

উষা জ্বলন্ত বলিয়া "ভাস্বতী", আলোকের উৎস বলিয়া "ওদতী", অন্যকে অলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা", রক্তিম বলিয়া "অরুষী", শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী", শুদ্ধ বলিয়া "রিতাবরী", জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী" যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি, সঞ্চারিণী বলিয়া "সুনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারি না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতা-বক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী ও রিতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন, সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও সূর্য্য-পত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন—দ্বিধাশূন্যা, সংশয়শূন্যা, অপরের অবলম্বনরহিত। বীর্য্যশালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন :—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধন্যন্নঃ পরঃ কিং চনাম॥"

R. V. 10.129.

Nor aught no naught existed ; you bright sky was not, no heaven broad woof out streched above, what covered all ? what sheltered ? what concealed ?

Was it the waters' fathomless abyss ?
There was not death—There was naught immortal.
Maxmuller. p. 290.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহিনা।
নূনমৃতা বদংতো অনৃতং রপেম।
R. V. 10. 10. 4.

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে ? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না হইলে, অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন আলোকে আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই তাহা যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা সম্পূর্ণ না থাকিতেই আমরা শিক্ষক, মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন,

তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়-তার অবতারণা রাজসূয়-যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা পণ্যস্ত্রী বারবনিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকে-রাই আহুতি দিতে সক্ষম; আহুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদি কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎকারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি। তুমি আপনি অবলম্বন রহিত? কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না

পাইলে বায়ু-বিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিল'ইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যলোকাবৃতা। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টিগোচর নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানবহৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকোচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা, কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠি কাটিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ করে না। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা-বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি, Beranger, Napoleonএর সমসাময়িক ছিলেন। Napoleonএর পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন, "আর লিখিব না বলিতে পারি না, কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর লিখিতে চাই না, জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে, মনে হইলে অকাতরে

ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না, সে কথা যদি বেচা-কেনা চলে চলুক—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই—আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন।" অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া আমাকে মাপ করিবেন। কারণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস করিতে বাধ্য মনে করি। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্য-জগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানস-জাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়া ল'ন, কঙ্কালে পুনর্জীবন দেন। তাঁহারা রচনার মধ্যে দেবদেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতরে প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ-বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানব-হৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলা কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতি সাধনা করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর, কুৎসিত, সত্য, মিথ্যা, অনুরাগ, বিরাগ সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ মনুষ্য-হৃদয়ে জ্বলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহারে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে তাহা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় না; তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিম্বা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন-রাগের মূর্ত্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ড চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা, নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী জগতের রাজ্য অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখা পড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই

সময়ের পূর্ব্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন,; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন Rogen Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন "although to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter in English tongue for Englishmen" তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা ল্যাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতি সৃজন করেন যখন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an instax cotes to stir up some other of mutability to listen travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, 'নবজলধরপটল সংযোগে' প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গলা ভাষা সোণার হাতকড়ি ও বেড়ী পড়িয়াছিল। পুস্তকের নাম 'Hecatompathia' ও 'প্রত্নকম্রতত্ত্বনন্দিনী' প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই, more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাহাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা হইয়াছে। 'রাজা' সতী অসতী, 'শনি' ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে

করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। ল্যাটিন, দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। morality plays, Interludes, Senecan Tragedies, Chronicle Plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলে-মেয়ের উপর যখন চোক পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ও প্রতিভা নূতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। Saekville ও Shirleyর মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। এই নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রীভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্নভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপ-পুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত, আমরাই; তাহার সম্যক্ উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব-হৃদয়ের দরদ-দিয়া-মাখা—এই সত্য-মিথ্যাজড়িত মানব-সমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না। Renan এক স্থানে বলিয়াছেন, জগদীশ্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর

তোমার আশীর্ব্বাদ! সত্য যদি সর্ব্বত্র বিকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্চাচারী মানব-সমাজের অন্তর্নিহিত, রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাঁহার পরেও জনকতক কবি, সে স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নব জীবনের স্রোত বহিয়াছিল, ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আবেগ মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরবহ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিতে যত্নবান্ হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢালা। মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাঁধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচ্‌কচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরাজী-সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্য দেশ, কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান্ সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বের কেল্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। Conquering Frankরাও সেই ভাষার মধ্যে নূতন

ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাব'র তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil war গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাস পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন, বহুদিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাঁহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া কোনরূপে পরিত্রাণ পান, কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon, সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং নূতনতেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া একজন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্যজগতে Cornneille, Racine পরে Moliere এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারই পথবর্ত্তী, ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদৃত। Plicads দিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল না, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। French Revolutionএর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটি চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী-সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের

মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Base, মহৎ ও নীচ জাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত বিটপী কিংবা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। Moncheir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাট্য-শালায় খুনোখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলায় উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়া-ছিল, সেই জাতির কবিই বা কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ Victor Hugoর কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের Classic schoolএর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যাঁহারা আধুনিক তাঁহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাঁহারা উন্মাদের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন। তাহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহাই হইল। তাঁহারা শুদ্ধমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ভদ্রসমাজের কালো Hat, Coat ছাড়িয়া—বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায়

যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী, অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইহার প্রায় সকলেই সাহিত্য-সেবক, অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune, Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugoর কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাঁহার প্রথম নাটক Cromwellএর উপক্রমণিকা পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gantier এই উপ-ক্রমণিকাকে সাহিত্যে Mount Sinaiএর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 25th Feb. 1830, যে দিন Hernani অভিনীত হয়, 14th Julyএর মত তাহা পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য-জগতকে নূতন আলোকে আলোকিত করিলেন। পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট কবিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিকদলও স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবকবৃন্দ সারাদিনের খাদ্য-দ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার আরম্ভ জানিয়া, ভিতরে পুলিশ বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তোলনমাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier

Derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হইবামাত্র, বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। Derobe নূতন রকমের বিশেষণ আবার তাহার উপর একচ্ছত্রের শেষভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ Derobe, ভাষার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিক গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাঁহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন-গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। একজন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugoর নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্ত্বের জন্য ৬ হাজার Franc দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন; বলিলেন, ১ম অঙ্ক শেষ হইতে দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দিব ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ করা না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না; তিনি ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন ও অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্য পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিশ ও সৈনিক শান্তিরক্ষা করিল। কিছু দিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল—পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়া লইলেন। Hernani নাটক কল্পনায় উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত নহে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত।

আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাদব করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্য-সেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে ছুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামা-জোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খলে ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব-প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দিই। আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়ামের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালাভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরেজী phraseএ, কি sentenceএ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরেজি ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরেজি কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই, ইংরেজি এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থবোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত

পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরেজি ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটি যেন ভুলিয়া না যাই যে, শব্দমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিম্বা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্রজ্ঞ ঋষিপুরুষ, তিনি দেবতুল্য, তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ীপেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গালা-সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজি না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজি-ভাষা জারজ, Froude বলেন Mongrel, তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একেবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়নশাস্ত্রকে কিমিতিনিমিতি বলাতে পাগলামি আছে। জোর করিয়া Geometryর ও Chemistryর জাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙামিতে গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collic স্কচ্ কুকুরের নামে আনন্দ বহন করিতে দেখা

গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট-বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা-কেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্য জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, বিলাতি সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর; বুঝি কথার অভাব প'ড়ে। ভাষাতে নূতন ভাববিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না, আধ আধ-ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলো, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব? তরু লতা, জাতিযূথি, সোণার আলা, সাজের বেলা, জোছনা রাতি সবই অতি সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গলা-ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য জগতে নাই, বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বলি, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?" রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা-স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড়, জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে,

বাঙ্গালী ঢাল-তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ-পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে-আল্‌তা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব—যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহমুগ্ধ হইয়া কত দিন যাপন করিবে? তোমার মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না; বেশে তুমি অতি সুন্দর কবি, আমার বিশ্বাসে ত তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝর-প্রসূত মন্দাকিনী-বারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে। আমি একস্থানে বলিয়াছি সত্য জগতে "অহং"-এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্যে কাহারও বিশেষ অসম্মতি নাই। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবা-মাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়। সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইজন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয়-জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু যথার্থ যাহাকে সাহিত্য বলে তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার

সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহাস কতকটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্যে যে "সাধনার" কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখন গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষারই স্থান সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যকে বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেই রকম বিভিন্ন ভাব মিশ্রণে ভাবের বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns আপনারা সকলেই জানেন Scotlandএর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অল্পসল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset, Italianএ কবিতা লিখিয়াছিলেন, Heine Frenchএ সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়। আমি ইংরেজ-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর ডাকিয়া-ছিলেন' অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ইংরাজীতে (called on me)র অনুবাদে এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের ডাকিয়াছেন বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ (They have asked me) এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধ-

পালিত শিশু ও Mellin's food প্রভৃতিপায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তি কত অপচয় হয়; আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যত দিন পর্য্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষার অর্থ যতখানি বুঝাইব, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই, তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক উপলব্ধি না হইলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্যও বলীয়ান্ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক্ মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা পাশ্চাত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। একজন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, একভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ একপক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে; তেমনই অপরপক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা, তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব

ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য সাহিত্যে আমি অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, Russian কিম্বা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-বিদেশের কথা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ সাদাসিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনের উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকাল-কার ইংরাজী-সাহিত্যে ইংরাজ-জাতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাসের সময় Les Chansens de geste এবং পরে Chante Fables এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেরও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি, গম্ভীরা, চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন? বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্নে এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দুএকটি বলিতে চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্রে ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমার

নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি এবং সেও আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অতি বাল্যকালে তাহার সুমধুর সংগীত শুনিয়াছি; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। সে যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গান মাত্র রচনা রাখিয়া যাইত, তাহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় রহিত। সে যেথানে গিয়াছে সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখন হবেও না। তাহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকের স্থান হবে না। কিন্তু তাহার স্মৃতি চিরদিন আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলে মেয়েরা—সে যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিল—তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে এবং তাহারাও সেই দেশের ছেলে-মেয়ে বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে হে দ্বিজেন্দ্র! তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

পূর্ব্বোক্ত রাজ-সভাপণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গায়কগণ কর্তৃক গীত হইল—

মায়ের মন্দির-দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে।
পূজার সঙ্গীত উঠে জাগি
ভক্ত হৃদয় মাঝে॥
লইয়া পূজার অর্ঘ্য
বাণীর চরণ তলে;
এসেছে সুযোগ্য সুত
মায়েরে পূজিবে ব'লে,
ভরিয়া পূজার ডালা
সচন্দন শতদলে,

সাজিয়া এসেছে সবে
পবিত্র পূজারী সাজে ॥
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে
থেক'না আর মিছে কাজে
এস সেজে পুণ্য সাজে।
পূজার মন্দির-দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে ॥
দিগন্ত মুখরি উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে মধুর তান।
গীত-গন্ধ ভরা প্রাণ পূর্ণ করা
জাগিছে স্বর্গের গণ।
কুমুদ কহ্লার পূজা উপচার
অঞ্জলি করহে দান।
সুললিত ছন্দে আবাহন মন্ত্রে
পুলক পূর্ণিত প্রাণ ॥
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে
থেক'না আর মিছে কাজে।
এস সেজে পুণ্য সাজে।
মায়ের মন্দির-দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে ॥

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রামপ্রেরকগণের নামোল্লেখ করিলেন।

সহানুভূতি বিজ্ঞাপকগণের নাম

অনারেবল মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজার

F. C. French, Esq. I. C. S. Commissioner of the Rajshahi Division.

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতা

„ রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী বাহাদুর, তেঁওতা

„ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই, কামাখ্যা

„ মোহিনীনাথ বিসি জোয়ারী, রাজসাহী

„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল্, বহরমপুর

„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারিকেলডাঙ্গা

„ কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর

„ ছকমল চোপড়া, কলিকাতা

„ অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর

„ দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব, কলিকাতা

„ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, দার্জ্জিলিঙ্গ

„ কামিনীকুমার বসু, শিলচর

„ প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, দেওয়ান কোচবিহার

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, কলিকাতা

„ চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ, বড়মরিচা কোচবিহার

„ হরিশ্চন্দ্র দত্ত বি, এল্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যার্থনা সমিতির সম্পাদক, চট্টগ্রাম

„ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটী

„ কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল্, পাবনা
„ কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত
„ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল্
„ কামিনীকুমার রায়
„ মহারাজ বাহাদুর সিং, বালুচর
„ অনারেবল রায় হরিমোহন চন্দ বাহাদুর, দার্জ্জিলিঙ্গ
„ কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া
„ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমুলজানি, ময়মনসিংহ
„ কিশোরীমোহন রায় সম্পাদক "সুরাজ" পাবনা
„ রাধারমণ মজুমদাব, জমিদার রঙ্গপুর
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট রঙ্গপুর
„ বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল্ বগুড়া
„ উত্তমচন্দ্র বরুয়া কামরূপ
„ গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা নীলাচল, আসাম
„ সারদাচরণ ধর মুন্সী, শিলং
„ দৌলত আবিদ, সোণামুড়া
„ শান্তিনাথ শর্ম্মা পাণ্ডা, কামাখ্যা গৌহাটী
„ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল্, মুনসেফ গাইবান্ধা
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কদমতলা, চুচুড়া
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি
„ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর নদীয়া
„ অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, কটক
„ সেতাবচাঁদ নাহার আজিমগঞ্জ
„ কুমার সিং নাহার আজিমগঞ্জ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় আইহাই, দিনাজপুর

শ্রীযুক্তা ও শ্রীযুক্ত ইউসুফ স্কোয়ার আই, সি, এস্

রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ও তাঁর পত্নী

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু শিলচর

„ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, কলিকাতা

„ আমীরউদ্দীন আহম্মদ, কোচবিহার

নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের মৃত্যু বার্ত্তা সম্মিলন-সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক দুঃখের সহিত বিঘোষিত হইল—হিতবাদী সম্পাদক সখারামগণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সাহিত্য-সভার সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সুবলচন্দ্র মিত্র, নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক মহাশয় সম্মিলনের বিগত ১৩১৭, ১৩১৮ সনের কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিলেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

১৩১৭ ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্য্য-বিবরণ

এই সম্মিলনের ৺কামাখ্যাশৈলে আহূত বিগত পঞ্চম অধিবেশনে তৎপূর্ব্ববর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ যে অনিবার্য্যকারণে উপস্থাপিত করিতে পারা যায় নাই তাহা সাহিত্যিকগণের কাহারও অবিদিত নাই। কারণটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হইলেও ইহা তৎকালে যেরূপ সার্ব্বজনীন সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা প্রাগুক্ত সম্মিলনে গৃহীত

প্রস্তাবদ্বয় মধ্যে আদ্য প্রস্তাবের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। সম্মিলন পরিচালন-সমিতির কর্ম্মব্যবস্থার গুরুভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তৎপ্রতি এতাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ উত্তরবঙ্গীয় তথা সর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। অপিচ সম্মিলন সম্পর্কিতের প্রতি সম্মান দানে প্রকারান্তরে সম্মিলনেরই গৌরববৃদ্ধি করা হইয়াছে। তদর্থে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা সমপস্থাবলম্বী হিতৈষীগণের নিকটে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাপন করিয়া ১৩১৭ ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কর্ম্মপঞ্জী একত্রে উপস্থাপিত করিতেছি।

এই সম্মিলনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের তৃতীয় অধিবেশনে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে উহার স্থায়ী পরিচালক সমিতিরূপে গণ্য করা হয়। (গৌরীপুর সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ প্রথম-ভাগের ৫৩ পৃষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)

এই পরিচালন সমিতি সম্মিলনের আরব্ধ কার্য্যগুলি শৃঙ্খলাসহকারে ক্রমে সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসামের পল্লীতে পর্য্যন্ত সাহিত্যের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

এই সার্ব্বজনীন সাহিত্যিক জাগরণ এই প্রদেশে নানা ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তাও একারণে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে সাহিত্যালোচনার প্রবর্ত্তনাই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ গৃহীত পন্থা চতুষ্টয় যথা (ক) নানাস্থানে সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা, (খ) স্বল্প সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গে নব সাহিত্যিকদলের গঠন (গ) সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠা ও (ঘ) বাঙ্গালা ও সন্নিহিত অসমীয় সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধন।

এই বিভাগ চতুষ্টয়েই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উত্তর-বঙ্গ-সম্মিলনের চেষ্টায় স্থাপিত বগুড়া সাহিত্য-সমিতি ও মালদহ সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রাগুক্ত কার্য্য বিবরণেই বর্ণিত হইয়াছে।

বগুড়া সাহিত্য-সমিতি

বগুড়া সাহিত্য-সমিতি নীরবে কর্ম্ম করিলেও বগুড়ার পুস্তকাগার সংলগ্ন ক্ষুদ্র চিত্রশালা তাহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এই চিত্রশালা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়ন প্রাপ্ত হইয়া বিশেষজ্ঞগণের সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি

মালদহ সাহিত্য-সমিতি এক্ষণে ভিন্নাকার ধারণ করিয়া মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। নানা সদ্‌গ্রন্থের ও শিক্ষার প্রচার দ্বারা এই সমিতি এক্ষণে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সমিতির অনন্যকর্ম্মা সদস্যগণ মালদহের পুরাতত্ত্ব ভৌগোলিক বিবরণাদি সঙ্কলনেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের যত্নে তথায় একটি স্থানীয় চিত্রশালারও সূচনা হইয়াছে। মালদহের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান কার্য্য ঐ সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের যত্নে নানা প্রাচীন পুঁথি ও মূর্ত্তি ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া ভোলাহাট জাতীয় বিদ্যালয়ে আপাততঃ রক্ষিত হইতেছে। পরে ঐ সকল সংগৃহীত দ্রব্য সদরে নীত হইয়া একটি চিত্রশালা স্থাপিত করার কল্পনা আছে। স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের নেতৃত্বে নবকলেবর ধারণ পূর্ব্বক উত্তরবঙ্গের গৌরবের স্থল হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই সমিতি গৌড় পাণ্ডুয়া প্রদর্শক ও বঙ্গানুবাদসহ শেখ-শুভোদয়া নামক গৌড়ের সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশার্থ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সত্বরেই উহাদের প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি

প্রাগুক্ত সমিতিদ্বয়ের পরেই আমরা সমগ্র ভারতের গৌরবস্থল বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ম্মের উল্লেখ করিব। উত্তর-বঙ্গে অচিরকাল মধ্যে এই সমিতি যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা ভারতেতর দেশেও গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইতেছে। গৌড়ের সর্ব্ববিভাগের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় এই সমিতি হস্তক্ষেপ করিয়া ইতিমধ্যেই গৌড়-রাজ-মালা ও গৌড়-লেখ-মালা নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতি উত্তরবঙ্গেও নানা স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাজসাহিতে যে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সরকারী চিত্রশালা ব্যতীত বঙ্গের আর কুত্রাপি এরূপ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ মহাদয়ের অকাতর অর্থব্যয় ও শ্রম এবং ঐতিহাসিকবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমুখ সদস্যগণের গভীর গবেষণা, ঐকান্তিকতা শ্রমসহিষ্ণুতাই এই সমিতির সাফল্যের কারণ।

কামরূপ-অনুসন্ধান সমিতি

গৌড় অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্নিহিত কামরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছিল, কেননা এই উভয়দেশের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক নানা ব্যাপার এরূপভাবে জড়িত আছে যে একের অভাবে অন্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাব দ্বারা এই অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হওয়ার পর একবর্ষ মধ্যে তাহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-পরিচয় প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই সমিতির চেষ্টায় অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের আলোচনা সহ পাঠ এবং কামরূপের অন্যান্য রাজগণ

প্রদত্ত তাম্রশাসন "কামরূপ শাসনাবলী" আখ্যায় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। পরে উহাকে পৃথক্ গ্রন্থাকারে চিত্রাদিসহ মুদ্রিত করা হইবে। এই সমিতির কর্ম্মবিবরণ সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে উপস্থাপিত করা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তদনুসারে সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার কর্ম্মবিবরণ সহ অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন আপনারা তাঁহার নিকটেই উহা শ্রবণ করিবেন এবং সম্মিলন বিবরণীর সহিত ঐ কার্য্য-বিবরণীও যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে।

ইহার পরেই পুরাতত্ত্বালোচনায় রঙ্গপুর-পরিষৎ নিজে বিগত দুইবর্ষে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহারও একটু উল্লেখ প্রয়োজন।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সংসৃষ্ট অনুসন্ধান-সমিতি ও চিত্রশালা।

রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর ও রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নবনির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্ মহোদয়ের নেতৃত্বে রঙ্গপুরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির অনুসন্ধান ও প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ সংগ্রহার্থ একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই অচির গঠিত সমিতির কর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় সংগৃহীত কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি একখানি প্রস্তর ফলক এবং শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্ব সংগৃহীত বিবিধ উপকরণ ও গ্রন্থাদি রক্ষার নিমিত্ত মহামান্য ভারত সম্রাট্ এড্ওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থ ভবনের সঙ্গে চিত্রশালা গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। উদ্দেশ্যের "ঘ" সংখ্যক বিষয়টি এতদ্দ্বারা ও অন্যান্য চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। এই সকল স্থানীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার দ্বারা উত্তরবঙ্গে

প্রত্নতত্ত্বালোচনার ভিত্তি দৃঢ় হইতে চলিল। এই প্রসঙ্গে সদাশয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট হইতে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে মন্তব্যলিপি প্রচারিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুকূল। স্থানীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠায় ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে নানা প্রকারে সাহায্য করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অর্থসাহায্যও প্রদত্ত হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই উদার মন্তব্য সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্য সাহিত্যিক মণ্ডলী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক সমিতি গুলির উল্লেখ করিয়া পল্লীগ্রামেও যে এরূপ অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে তাহার পরিচয়রূপে রঙ্গপুরের অন্তর্গত বেলপুকুর পল্লীগ্রামের সাহিত্য-পরিষৎ ও বগুড়ার অন্তর্গত [illegible] পল্লীর সাহিত্য সমিতির নামোল্লেখ করিতেছি। প্রথমোক্ত সমিতি রঙ্গপুর পরিষদের সংগ্রহ কার্য্যে নানারূপে সাহায্য করিতেছেন।

এতদতিরিক্ত সাহিত্য-সমিতির বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি নাই। উত্তরবঙ্গ ও আসামের বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতিগুলি তাঁহাদের কর্ম্ম পরিচয় বর্ষে বর্ষে সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সম্মিলন কার্য্যবিবরণের সহিত তাহা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারি। আশা করি ঐ সকল সমিতির কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সম্মিলন-পরিচালক-সমিতিকে সাহায্য করিবেন। সংবাদ না দেওয়ায় অনেক সমিতির কর্ম্ম পরিচয় আমরা বিশদরূপে প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া থাকি ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। একত্রে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের এরূপ একটা বিবরণ বর্ষে বর্ষে সম্মিলনের পরিচালন সমিতির তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইলে কার্য্যবিবরণের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং ভবিষ্যতে উহা বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে সন্দেহ নাই।

এই সকল সাহিত্য সমিতির সদস্যগণ মধ্যে বর্ষে বর্ষে বঙ্গভাষার লেখক সংখ্যা আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত উত্তরবঙ্গসম্মিলনের প্রতি অধিবেশনে প্রবন্ধসহ নূতন লেখকগণ উপস্থিত হইতেছেন। উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যিক পঞ্জী যাহা গৌরীপুর সম্মিলনের কার্য্যবিবরণীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এই প্রকারে তাহার আকার এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বর্দ্ধিত কলেবরে ঐ সাহিত্যিক পঞ্জী পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙ্গালা ও অসমীয় সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা কল্পে বিগত কামাখ্যা সম্মিলন আহূত হইয়াছিল। ৺মায়ের কৃপায় এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। ঐ সম্মিলনের উজ্জ্বল কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রাচীনকীর্ত্তি রক্ষা

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির নিদর্শন মধ্যে যে কয়েকটি রক্ষা করার নিমিত্ত সম্মিলনে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তন্মধ্যে দিনাজপুর বাদাল গ্রামের গরুড়-স্তম্ভটির মূলদেশ পূর্ব্বতন এক কালেক্টারের চেষ্টায় বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উহা সম্প্রতি আর নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

পালরাজ ভবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বাগ্দেবীর মন্দির, সাহইস্মাইল গাজীর সমাধিমন্দির রক্ষার্থ ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা হইয়াছিল এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুসন্ধানও করা হইয়াছে; ঐ গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের পরে তৎসম্বন্ধে কিরূপ বিবেচিত হইয়াছে তাহা আজও জানিতে পারা যায় নাই। হিন্দু ও মুসলমানের নিজ নিজ সম্বন্ধে পবিত্র এরূপ দুইটি ঐতিহাসিক স্মৃতি নিদর্শন রক্ষা কল্পে মহাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টি আমরা পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি।

বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন কালঞ্জেশ্বরীর মন্দির সংস্কার-কল্পে দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ঐ মন্দির সমীপবর্ত্তী পঙ্কিল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে মূল-মন্দিরটির সংস্কার হইলে মহারাজ বাহাদুরের নাম মন্দিরের সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গসাহিত্যের জনক-স্থানীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আদি কর্ম্মভূমি রঙ্গপুরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ সাহায্য সংগ্রহ করিতেছেন। অচিরে এই স্মৃতি রক্ষার্থ ফলকসহ একটি স্তম্ভ বা তদ্রূপ কোন নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হইবে।

অতঃপর সম্মিলন সমক্ষে নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করার অবসর আসিয়াছে। দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে মদনবাটী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক কেরী সাহেব একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক "মথি লিখিত সুসমাচার" নামক গ্রন্থ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে প্রচার করিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে এরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে। মদনবাটী বঙ্গসাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থের আদি স্থান হইলে তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার অধীন শিবপুর গ্রামের দক্ষিণে ক্ষুদ্র ঝাড়-বিশিলা গ্রামে অম্বিয়াবাণী, জঙ্গনামা, হেতুজ্ঞান, মহরমপর্ব্ব প্রভৃতি বঙ্গ-ভাষায় রচিত বিবিধ মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা কাজি হেয়াতমামুদের সমাধি স্থানে আজও কোন স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহম্মদীয় ভ্রাতৃগণ সাহায্য করিলে এই স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া যাইতে পারে। রাজসাহী জেলার ওয়ালিয়া থানার অন্তর্গত বরবরিয়া গ্রামে আত্রায়ী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচয়িতা কবি অদ্ভুতাচার্য্যের বাসবাটী ছিল, ঐ স্থানও পরিচিহ্নিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সাহিত্যসেবী কুমার

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই মহাকবির সুবৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থের আদিকাণ্ড রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এবম্বিধ আরও রক্ষাযোগ্য নিদর্শন রক্ষার্থ আপনারা সম্মিলন হইতে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারেন।

কেন্দ্র-সমিতিকে অর্থসাহায্য করার জন্য পৃথক কোনও আয়োজন না করিয়া উত্তরবঙ্গ ও আসামে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গৌরীপুরে গত তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া এই জেলাত্রয় প্রধানতঃ সম্মিলনের এই নির্দ্দেশ পালন করিয়াছেন। মালদহ, রাজসাহী ও কোচবিহার অংশতঃ পালন করিয়াছেন কিন্তু পাবনা, জলপাইগুড়ী, দার্জ্জিলিঙ্গ এই জেলাত্রয়ে সদস্য সংখ্যা বিরল, নাই বলিলেও চলে। আসাম কিয়ৎ পরিমাণে সদস্য দিয়াছে। সদস্য সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি না হইলে সম্মিলনের উদ্দিষ্ট বিষয় গুলির সমাধান দুরূহ হইবে। এজন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করা সম্মিলন-হিতৈষীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গকে যে সাহায্য করিতে ছিলেন তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহারা ভিন্নরূপ কথা তুলিয়াছেন। সম্মিলনে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্মিলন-সম্পাদক।

এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণার্থ বগুড়ার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বেণী মাধব চাকী বি, এল্, মহাশয়ের প্রস্তাব রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্যগণের

নিম্নলিখিত নাম তালিকা পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে সভাপতি মহাশয় সন্ধ্যার পর সাহিত্যিকগণের বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবেন। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির নাম তালিকা পাঠের পর বগুড়া সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রদাস গুপ্ত বি, এল্ মহাশয় আর কয়েকজনের নাম যোগ করিতে অনুরোধ করিলে তাহাও তালিকা ভুক্ত করা হইল।

সমিতির সদস্যগণের নাম তালিকা।

১। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী
সম্মিলন-সভাপতি।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্,
সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতি।

৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক।

৪। শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

৫। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্,
অভ্যর্থনা-সমিতির-সম্পাদক।

রঙ্গপুর সদর

৬। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

গাইবাঁধা

৭। শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর রায় বি, এল্,

নীলফামারী

৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল্

কুড়িগ্রাম

৯। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার

বগুড়া

১০। „ বেণীমাধব চাকী বি, এল্,

১১। „ সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল্,

মালদহ

১২। „ বিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল্

১৩। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

রাজসাহী

১৪। „ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্, এ,

১৫। „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্,

নাটোর

১৬। „ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

নওগা সবডিবিসন

১৭। „ শ্রীরাম মৈত্রেয়

আসাম

১৮। „ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,

১৯। „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ

সম্মিলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার পরীক্ষার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে অর্পিত হইল—

সাহিত্য

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

„ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ,
" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্,

বিজ্ঞান

" পঞ্চানন নিয়োগী এম্, এ,

বিবিধ

" বিনয়কুমার সরকার এম্, এ,
" হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বারিপাতনিবন্ধন অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সম্মিলনের কার্য্য স্থগিত থাকে।

(অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা)

১। সঙ্গীত—
২। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের মন্তব্য।
৩। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদকের কার্য্যবিবরণী পাঠ।
৪। বিবিধ প্রস্তাব।
৫। প্রবন্ধ পাঠ।
৬। আলোকচিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা।

বৃষ্টি থামিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সভামণ্ডপ হইতে স্থানীয় নাট্যশালায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার অনুমোদন ক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল।

এই অধিবেশন প্রারম্ভে নিম্নোক্ত সঙ্গীত হইল,—

মূলতান—একতালা।

গান।

জনম অবধি যে ভাষা শ্রবণে
ঢালিছে স্বরগ অমিয়া,
মরমে মধুর পশে যার সুর,
শোক, তাপ, দুখ মুছিয়া।
মায়ের প্রথম আহ্বান পুণ্য
যে ভাষায় শুনি শ্রবণ ধন্য
দয়াময় নাম সে যে যে ভাষায়
যার প্রেমে হিয়া প্লাবিয়া (গলিয়া)
সহস্র ভাষা এখানে না ভাযে
আপনায় তুচ্ছ মানিয়া।
প্রাণ মুগ্ধ করা হেন মধু বাণী,
বিনা সাধনায় সিদ্ধি-বিধায়িনী,
হরিযে বিষাদে আনন্দ দায়িনী,
ধরায় মেলেনা খুঁজিয়া,
শিরায় শিরায় শান্তি ধারা বয়
যে বাণী শুনিয়া বলিয়া।
রাজরাজেশ্বরী সকল ভাষার,
এ বঙ্গ-ভারতী জননী আমার,
পূজিতে তাঁহারে আয়োজন এই
দীন উপচার লইয়া

ধন্য হইব বাণীর চরণ
বাণী-সুত সনে পূজিয়া।
এস ধনী মানী জ্ঞানী সুধীজন,
এস দীন হীন এস অভাজন,
মায়ের সন্তান সবাই সমান,
এস সব ভেদ ভুলিয়া।
আজি ভাই ভাই মিলে একঠাঁই,
ধন্য হই মায়ে পূজিয়া।

সঙ্গীত অন্তে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় দিনাজপুর-সম্মিলন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সারগর্ভ ও সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—

দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে মন্তব্য।

এবার উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুরের অধিবেশন লইয়া সাহিত্যিক মহলে বেশ একটু আন্দোলন হইয়া গেল। ইহা দিনাজপুরবাসীর পক্ষে আনন্দের কথা। সাহিত্য-চর্চ্চায় বা সাহিত্যানুশীলনে দিনাজপুর বিশেষ অগ্রগামী নহে এবং দিনাজপুরের অধিবেশন সাহিত্যিকগণের বিশেষরূপ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে এরূপ কল্পনা আমাদিগের হয় নাই। তথাপি ঘটনাচক্রে, দিনাজপুরে এবং চট্টগ্রামে একই সময়ে বাঙ্গালা দেশের দুই প্রান্তে সম্মিলনের দুইটি অধিবেশনের প্রস্তাবে সাহিত্যিকগণের প্রতিবাদ দিনাজপুরের অধিবেশনটিকে আমাদিগের আশার অতিরিক্ত উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। দিনাজপুরে গত ইষ্টারের অবকাশে সম্মিলন বসিবার কথা ছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। চট্টগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের সময় দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ

সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব করায় আমাদিগের কার্য্য এবং আমাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচক বেশ একটু তীব্র ভাষায়, এমন কি লৌকিক ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া, নানা কথা সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন। আমরা চট্টগ্রাম-সম্মিলনের সময়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও ঐ সম্মিলনটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হয় কতকটা এই অভি-প্রায়ে দিনাজপুরে ঠিক ঐ সময়েই আর একটি সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম কিনা তাহার যথোচিত কৈফিয়ত আমরা তৎকালেই দিয়াছি। মূল-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারেই আমরা ইষ্টার-অবকাশে সম্মিলনকে আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যকার এই সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যিকবর্গকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে চাই যে, আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সফলতার বিরোধী কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা তো দূরের কথা, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, এবং যে-সকল সমালোচক আমাদিগকে একতরফা বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা যুক্তি এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করেন নাই। বঙ্গের সমগ্র সাহিত্যিকবর্গের চেষ্টা এবং উদ্যমের ফল যে-সম্মিলন তাহাকে ব্যর্থ করিবার কল্পনা বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ মূল-পরিষদের শাখা। শাখা কর্তৃক মূলের অবজ্ঞা কখনই সম্ভব নহে। তবে আমরা পূর্ব্ব হইতেই সম্মিলনের সময়াবধারণ করিয়া কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম বলিয়া মূল পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণের মত গ্রহণ করিয়াই কার্য্যে ব্রতী হইতেছিলাম। কলিকাতায় পত্র লিখিয়া ও প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আমরা ঐ মত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সাহিত্যসেবিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব মনে করিয়া ইষ্টার অবকাশে সম্মিলনের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এই সম্মিলনের উদ্যোগ করিতে বাধ্য

হইয়াছি। বন্ধুগণ! আপনারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই অসহনীয় গ্রীষ্মের মধ্যে শারীরিক নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাণীর পদসেবার জন্য আজ এই মণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগের "ভগবতী ভারতী"র প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি এবং তাঁহার সেবার জন্য তীব্র অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা আপনাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্তরূপ আয়োজন করিতে পারি নাই এবং আপনারা প্রত্যেক বিষয়ে নানা অসুবিধা অনুভব করিবেন ইহা অনিবার্য্য; কিন্তু ভক্ত যখন মাতৃমন্দিরে পূজোপকরণ সহ উপস্থিত হয়, তখন তাহার বাহ্য সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য থাকে না; তিনি অন্তরে যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকেন; একথা জানি বলিয়াই আজ আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আয়োজন সত্ত্বেও মার এই পূজামণ্ডপে আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহস করিয়াছি। আমাদিগের শত অপরাধ আপনারা মার্জ্জনা করিবেন এবং আমাদিগের কার্য্যে শত শত ত্রুটি থাকিলেও আপনারা আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সাদরে গ্রহণ করিবেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের এইটি ষষ্ঠ অধিবেশন। সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা আপনাদিগের নিকট আজ উপস্থিত করিব,—ভরসা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সাহিত্য-সম্মিলনগুলি সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টাতেই সংঘটিত হইতেছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ মূল-সাহিত্য-পরিষদের শাখা মাত্র। এজন্য কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, মূল পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সাহিত্য-সম্মিলন তো প্রতি বৎসর হইয়াই থাকে, আবার উত্তর-বঙ্গের একটা সাহিত্য-সম্মিলন কেন? আর এই সেদিন চট্টগ্রামে অত বড় একটা সম্মিলনের পর আবার এই ক্ষুদ্র সম্মিলনের আয়োজন

কেন? সাহিত্য-সম্মিলনগুলি যদি কেবল মাত্র একটি করিয়া বাৎসরিক উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয় এবং পরস্পরের সহিত পরিচয় এবং আনন্দ-বর্দ্ধনই যদি ইহার চরম ফল হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনকে কেবল মাত্র কতকগুলি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এবং পরস্পর পরিচয় এবং তদ্দ্বারা আনন্দবর্দ্ধনই ইহার উদ্দেশ্য এরূপ মনে করিলে সাহিত্য-সম্মিলনকে বড়ই খাটো করা হয়। বঙ্গভাষাকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত করিয়া ভাষার এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-কল্পেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কেবল কলিকাতায় বসিয়া মুষ্টিমেয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নহে। এই জন্যই প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মিনের উদ্যোগ হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের যে-সকল শাখা-সভা স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের দৃষ্টিও এই পথে পতিত হওয়ায় তাঁহারাও এক একটি করিয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেন। আমরা সর্ব্বদাই নিজ নিজ বিষয়কর্ম্মে এতই বিব্রত যে, সাহিত্য-সেবানুরাগ আমাদিগের হৃদয়ে প্রায়ই স্থান পায় না এবং যাঁহারা ভগবতী ভারতীর সেবানুরক্ত তাঁহাদিগেরও উপযুক্তরূপ সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কত নীরব সাহিত্যিক অজ্ঞাতভাবে কাল কাটাইতেছেন যাঁহাদিগের বীণা একটু আঘাত প্রাপ্ত হইলেই মুখরিত হইয়া উঠিতে পারে, কত অতীত গৌরবের পুঞ্জীকৃত স্মৃতিচিহ্ন নানা স্থানে নিহিত রহিয়াছে যাহা এক হইতে বহু ঘটনাবলীর প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে, বঙ্গসাহিত্য-গঠনোপযোগী কত মূল্যবান সামগ্রী নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে যাহাকে একত্রিত এবং কেন্দ্রীভূত করিলে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্যকে নানা অলঙ্কার-সুশোভিত করা যাইতে পারে। সাহিত্য-

সম্মিলন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া এই নীরব সাহিত্যিক-দিগকে মুখর করিয়া তুলিবে; যাঁহারা সাহিত্য-সেবানুরাগী কিন্তু সময় এবং সুযোগ অভাবে সাহিত্য-সেবায় বিরত, তাঁহাদিগকে বাণীর পূজার জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়া দিবে; ইতিহাসের এবং বঙ্গসাহিত্যের যে-সকল অমূল্য উপাদান অপরিজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে সেইগুলিকে কুড়াইয়া আনিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; কিন্তু এই সম্মিলনকে প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিতে হইলে কেবল মাত্র বড় বড় সহরে প্রথিতনামা সাহিত্যিকগণের একটি করিয়া সভা প্রতিবর্ষে আহ্বান করিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া দিবার জন্য তাহার রুদ্ধ দ্বারে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিতে হইবে। এজন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিষৎ স্থাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিতে হইবে। আবার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা-পরিষৎ তাঁহাদিগের কর্ম্মভূমির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যতদূর সম্ভব সহিত্যালোচনার জন্য সম্মিলন আহ্বান করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবকগণের কার্য্যের সহায়তা করিবেন। অতএব, সাহিত্য-সম্মিলনকে কেবলমাত্র সাহিত্য-রথীগণের একটি বিচার সভায় পরিণত করিলে চলিবে না। ইহাকে একটা আড়ম্বরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। ইহাকে সর্ব্বসাধারণের আপনার জিনিষ করিতে হইবে। যাঁহারা সাহিত্য-জগতে অপরিচিত অথচ প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যের উন্নতি কামনা করেন তাঁহাদিগকে সম্মিলনে উপযুক্তরূপ স্থান প্রদান করিয়া সম্মিলনের কার্য্যে তাঁহাদিগের সহায়তা লাভ করিতে হইবে।

এই কারণেই বঙ্গদেশের নানা স্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র সম্মিলনের আয়োজন একান্ত প্রয়োজন। এ জগতে "বড়"র আদর এবং সম্মান সর্ব্বত্র; কিন্তু "ছোট"কে অবহেলা করিলে চলিবে না। "ছোট"র মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে; নতুবা "বড়"র দাঁড়াইবার শক্তি থাকিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে গত ইষ্টার অবকাশে দিনাজপুরের এবং চট্টগ্রামে দুইটি সম্মিলনের একই অধিবেশনের উদ্যোগের কথা আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রাম সম্মিলনকে খাটো করিবার অভিপ্রায়ে বা তাহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল এ কথা যাঁহারা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তাঁহারা অত্যন্ত অন্যায় বিচারে আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। আমরা তৎকালে বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতে চাই যে, বাগ্দেবীর পূজার আয়োজন কোন একস্থানে খুব আড়ম্বরের সহিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য কোন স্থানে পূজার আয়োজন হইলে দেবীর অসম্মান হয় এরূপ যুক্তি গ্রহণ করিতে পারি না। বঙ্গদেশে যখন এমন দিন আসিবে যে উত্তরবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম-বঙ্গ দক্ষিণ-বঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মায়ের পূজার মঙ্গল-শঙ্খ ভক্ত সাধকগণকে আহ্বান করিবে এবং একই সময়ে বঙ্গের নগরে নগরে এবং পল্লীতে পল্লীতে নানাবিধ পূজা-সম্ভার সহ পূজকগণ সমবেত হইবেন, তখন মনে করিব বাঙ্গলাদেশ প্রকৃত-পক্ষেই জাগিয়া উঠিয়াছে, ভগবতী ভারতীর পূর্ব্বাশিষ আমরা লাভ করিয়াছি। আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি বঙ্গদেশে এরূপ দিন আসুক, সুধীসমাজে বঙ্গবাসীর সাহিত্যোদ্যম দৃষ্টান্তস্বরূপে পরিগণিত হউক।

সাহিত্য-সম্মিলনীর আর একটি মহদুদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলেও সম্মিলনকে মুষ্টিমেয় সাহিত্যরথীর চেষ্টার ভিতরে

আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। লোকশিক্ষা যাহার উদ্দেশ্য তাহার দ্বার অবারিত থাকিবে, ক্ষুদ্রকে তাহাতে স্থান দান করিতে হইবে। সর্ব্ব-সাধারণকে ইহার ভিতরে টানিয়া লইতে হইবে। এজন্য সাহিত্য জগতে অপরিচিত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যালোচনায় উৎসাহ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঁহাদিগের বড় বড় সাহিত্য-সভায় উপস্থিত হইয়া আপন যোগ্যতার পরিচয় দিবার সাহস এবং সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র সম্মিলনগুলিতে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যানু-শীলনের সুযোগ এবং সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। এরূপ না করিলে সাহিত্য চিরকাল একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, কখনও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইবে না।

আজ দিনাজপুরবাসীর পরম সৌভাগ্য যে তাঁহারা দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সাহিত্য বিষয়ক নানা কথা শুনিবার এবং দিনাজপুরের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিনাজপুরের অবস্থার কথা উত্থাপন করিলে অনেকেই মনে করিবেন যে, এই স্থানের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করাই সাহিত্যসেবিগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় এটি ঠিক নহে। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীনের পক্ষপাতী। প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রাচীন গৌরবস্মৃতি প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস এবং বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান ব্রত। কিন্তু এই প্রাচীনের অনুসন্ধান এবং প্রাচীন তথ্য আবিষ্কারের ঝোঁক সময় সময় এত অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে মনে করেন সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র কার্য্য প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার এবং ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সম্ভব এবং অসম্ভব নানা প্রকার অনুমানিক সিদ্ধান্ত স্থির করা।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন-সকল সংগ্রহ করা এবং তাহা হইতে দেশের প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান গঠিত করা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য হইলেও একমাত্র কার্য্য নহে। আমরা বর্ত্তমান সময়ের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। বর্ত্তমানে আমাদিগকে বাস করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানকে গঠিত করিয়া ভবিষ্যতের উপযোগী করিতে হইবে। এই জন্যই অতীতের আদর্শ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। অতীতের আদর্শ বুঝিতে হইবে বর্ত্তমানকে গঠন করিবার জন্য। বর্ত্তমানকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের শিক্ষা কোন পথে যাইবে, আমাদিগের জাতীয় আদর্শকে কি করিয়া গঠিত করিতে হইবে, আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অভাবগুলি কি উপায়ে পূর্ণ করা যাইতে পারে, ইহাই আমাদিগের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সাহিত্য পরিষদকে এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে। সাহিত্য সম্মিলনকে ইহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলন যখন যেখানে অধিষ্ঠিত হন তখন সেই স্থানের শিক্ষার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবেন; স্থানীয় সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্যানুশীলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন; এবং এইরূপে দেশের প্রকৃত অভাব নির্ণয় করিবেন।

দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলন দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্পদের অবস্থা জানিবার জন্য উৎসুক হইতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্পদের বিশেষ কোন চিত্তাকর্ষক বিবরণ আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিব না। আমাদিগের মধ্যে দুই একজন নীরব কবি এবং আড়ম্বরহীন গ্রন্থরচয়িতা না আছেন এমন নহে; কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে ধরা দিতে নিতান্তই নারাজ। তথাপি বঙ্গ-সাহিত্যকে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুই এক-জনের নাম আমি এস্থলে উল্লেখ করিব। পরলোকগত কবি এবং শাস্ত্রাধ্যাপক

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সংস্কৃত-সাহিত্য এবং শাস্ত্রাদির আলোচনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি বিশেষভাবেই সেবা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'নিবাত-কবচ-বধ মহাকাব্য' তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত সঙ্গীতগুলি আজিও গায়কের মধুর কণ্ঠে আমাদিগের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি যে-সকল গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যশোরাশি সুদূর মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাই প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া দিনাজপুরকে ধন্য করিয়াছে। সাহিত্যিকগণ তাঁহার রচিত "ভগবচ্ছতকে" তাঁহার ভক্তির এবং ভাবের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন বলিয়া মনে করি। তাঁহার রচিত অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ 'রসকাদম্বিনী', 'কাব্যপেটিকা', 'দিনাজপুর-রাজবংশ' তাঁহার কবিত্বের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই।

"পাগলের পাগ্‌লামী" রচয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাবুক এবং ভক্ত কবি। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া রহিবে। ইনি আপাততঃ রাজসাহী-জেলাবাসী হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইনি দিনাজপুরেরই লোক এবং আমরা ইঁহাকে আপনার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি।

'দিনাজপুর-পত্রিকা' নামে এখানে একখানি মাসিক পত্র ছিল। কিছুদিন হইল পত্রিকাখানি পরিচালনের পক্ষে বহু অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায় লুপ্ত হইয়াছে। একখানি মাসিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

স্থানীয় 'ডায়মণ্ড জুবিলি' নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরিচরণ

সেন মহাশয় রঙ্গালয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিয়া বঙ্গসাহিত্যকে নানারূপে অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার রচিত 'সীতারাম', 'অরুন্ধতী' এবং 'অদৃষ্ট' দৃশ্যকাব্যগুলি স্থানীয় সাহিত্যানুশীলনের হিসাবে উল্লেখযোগ্য বটে। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও তিনখানি নাটক আছে। স্থানীয় জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয় বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী গ্রন্থ রচনা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি দিনাজপুরের অধিবাসী না হইলেও সম্প্রতি এখানে উপস্থিত থাকায় তাঁহার নাম এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

স্থানীয় জনৈক ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালার সাময়িক-পত্রের একজন সুপরিচিত লেখক। তাঁহার রচিত, রিয়াজউস্-সালাতিন, মোগল-রাজবংশ, পাঠান-রাজবংশ, ইসলাম-কাহিনী, ব্রতমালা প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রবন্ধাদি সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের নিকট সুপরিচিত। স্থানীয় সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের রচিত 'জেঠা মহাশয়' এবং 'আনন্দময়ী' বেশ ভাবপূর্ণ গ্রন্থ।

দিনাজপুরে সাহিত্য-চর্চ্চার প্রসঙ্গে দিনাজপুরে শিক্ষার অবস্থার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে চাই। দিনাজপুর জেলার বিস্তৃতি ৪০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা মোটামুটি প্রায় ১৭ লক্ষ। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্থানের বিস্তৃতি অনুসারে লোকসংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ইহার মধ্যে হিন্দু ৮ লক্ষ ৫৯ হাজার এবং মুসলমান ৪ লক্ষ ২৮ হাজার এবং বাকী অন্যান্য জাতি। এ বৎসর দিনাজপুর জেলার শিক্ষা-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, যে সকল ছাত্র এই জেলাতে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগের সংখ্যা মোট ১৭ হাজার। ইহার মধ্যে বালক ৩২ হাজার ৪ শত এবং বালিকা সাড়ে চারি হাজার। অর্থাৎ

বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার উপযুক্ত বয়স্ক মোট লোকসংখ্যার হিসাবে শতকরা ২৪জন বালক এবং ৩ জন বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। গড়ে ৭টি গ্রামের মধ্যে এবং ৩ বর্গমাইল মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে; সুতরাং এখানে শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বে যাঁহারা সন্তানগণের শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সন্তানাদির শিক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট স্কুল-কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আমাদিগের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নিম্ন-শিক্ষার ভার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ের হস্তেই সম্পূর্ণভাবে আছে একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারেন যে, আমাদিগের নিম্ন-শ্রেণীর এবং উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা আমাদিগের বালকগণ প্রাপ্ত হইতেছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিলে আমাদিগের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালাভ হইতে পারে না। আমাদিগের ধর্ম্ম, আমাদিগের সমাজ, আমাদিগের ভাষা, আমাদিগের আচার-ব্যবহার, আমাদিগের অভাব এবং তাহা পূরণের উপায় প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে আমরা কোনই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার সুবিধা পাই না। এক কথায় বলিতে গেলে—আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগকে স্বদেশের সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা দেয় না। এজন্য বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদির অভাব সম্পূর্ণরূপে দায়ী না হইলেও প্রধানতঃ দায়ী, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত, আমাদিগের দেশের শিক্ষাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা। আমাদিগের বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীগণের যে সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে সরল ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট

নহেন। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে শিক্ষার প্রকৃত সংস্কারের উপায় হইবে। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষৎ আবার উত্তর-বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাদি রচনার বন্দোবস্ত করিবেন। দিনাজপুর কৃষিপ্রধান স্থান, এখানকার বালক এবং যুবকগণের শিক্ষার জন্য এ স্থানের উপযোগী শস্যাদির উন্নতি এবং এ স্থানে যে সকল উত্তম ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার উন্নতিবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রস্তুত হইলে সাধারণের শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এজন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা এসকল বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক করিবার আয়োজন করিতে হইবে। এস্থানে গো-জাতির ক্রমশই অবনতি হইতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় লোকদিগের এ বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু গো-জাতীর উন্নতি কিসে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থাদি রচিত হওয়া উচিত।

দিনাজপুরের লোকসংখ্যা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় ১৭ লক্ষ। দিনাজপুরের প্রকৃত অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মুসলমান এবং হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের সংখ্যা অতি কম। মুসলমান এবং পলি অথবা ভঙ্গ-ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিই দিনাজপুরের প্রধান অধিবাসী। এ স্থানের লোক প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানীয় লোকের হস্তে অতি অল্প পরিমাণেই আছে; এত অল্প, যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দিনাজপুরকে বুঝিতে হইলে এই দুই জাতিকে বুঝিতে হইবে। কোন স্থানের দুই চারিজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইলে সে স্থানটিকে প্রকৃতপক্ষে বুঝা হইল না। জাতীয় উন্নতির মূলসূত্র লক্ষপতির প্রাসাদে খুঁজিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। যাহারা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ

করিয়া সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দেশের অন্নসংস্থানের উপায় করিতেছে, তাহাদিগেরই ভগ্ন কুটীরে আমাদিগকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য যাইতে হইবে। ঐ দরিদ্র কুটীরবাসী কৃষকই জাতীয় জীবনের প্রাণ। ঐখানে আমাদিগের উন্নতি এবং অবনতির মাপ-কাঠি রহিয়াছে ঐ দরিদ্রের সুখ এবং দুঃখ, বিপদ এবং সম্পদ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, অভাব এবং অভিযোগের প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদিগের চিন্তা এই কৃষককুলের অবস্থার প্রতি নিয়োগ করিবেন; যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহাদিগের কর্ম্ম ইহাদিগেরই উন্নতির জন্য পরিচালিত করিবেন; যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান চাষার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উৎসর্গ করিবেন, যাঁহারা কবি তাঁহাদিগের গাথায় এই অন্নহীন বঙ্গসন্তানের দুঃখ-কাহিনী গাহিয়া বঙ্গবাসীকে তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ সমগ্র শিক্ষিত সমাজের পরিষৎ; সুতরাং সাহিত্য-পরিষৎ, এই সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত, নানারূপে লাঞ্ছিত এবং উৎপীড়িত জাতি-সকলের জন্য, প্রকৃত সাহিত্য রচনার ব্যবস্থা করিবেন। নতুবা সাহিত্য-পরিষদের একটা খুব বড় কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীতের তুলনা করিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং ঐতিহাসিক তাঁহাদিগের পক্ষে দিনাজপুর একটি মহাতীর্থ। অতীত যুগের কত প্রাচীন স্মৃতি "পুনর্ভবার" এবং "আত্রেয়ীর" জলপ্রবাহ আজিও বহিয়া লইয়া যাইতেছে। কত অসংখ্য ভগ্ন এবং অভগ্ন প্রস্তর এবং ইষ্টকরাশি, কত অসংখ্য পরিখা, গড় এবং দীঘি, কত প্রাচীন কালের মন্দির এবং মসজেদ হিন্দু-মুসলমানের অতীত গৌরবকাহিনী আজিও প্রকৃত দর্শকের প্রাণে জাগাইয়া

দিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-সকলের আলোচনার চেষ্টা করিব না। কেননা ইহা আমার পক্ষে একেবারেই অনধিকারচর্চ্চা হইবে। দিনাজপুরের গৌরব স্বদেশবৎসল বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, যিনি আপনাদিগকে আজি এই শুভ সম্মিলনের জন্য দিনাজপুরে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অভিভাষণে দিনাজপুরের প্রাচীনত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর আপনাদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিবেন। সেখানে দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন আপনারা দেখিতে পাইবেন, সেগুলি যে-কোন সভ্য দেশের অধিবাসীকে অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত না করিয়াই পারে না। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং বিশেষ চেষ্টা করিয়া যে-সকল প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন সংগ্রহ করিতেছেন তাহা প্রত্নতত্ত্ব-বিদগণের বিশেষ প্রীতিবর্দ্ধন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৌরাণিক যুগের সময় হইতে দিনাজপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রচলিত কিম্বদন্তী, স্থান এবং নদীগুলির নাম হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। এই নগরের দুই প্রান্তদেশ দিয়া দুইটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। একটি পুনর্ভবা অপরটি গর্ব্বেশ্বরী। পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা এবং গর্ব্বেশ্বরীর কোন পৌরাণিক বিবরণ যদিও সংগ্রহ করা যায় না, তথাপি এইসকল স্রোতস্বতীর নামকরণ যে-সময়ে হইয়াছিল, তৎকালে এস্থানের সভ্যতা এবং সাহিত্যানুরাগের কিঞ্চিৎ আভাষ এই নামকরণ হইতেই পাওয়া যায়। এই নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরে এক্ষণে যেখানে ৺কান্তজীউর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত, সেই স্থানটিতে বিরাট রাজার উত্তর গো-গৃহ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কান্তনগরে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মৃৎপ্রাচীরশ্রেণীর কোন সন্তোষজনক ঐতিহাসিক

বা কিম্বদন্তীমূলক বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহা কোন বৃহৎ রাজ-অট্টালিকার প্রাচীর বলিয়াই অনুমিত হয়। গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণগড়ের পৌরাণিকত্ব আছে কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী পণ্ডিতগণ আলোচনা করিবেন, তবে করদহতে শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এ প্রবাদ প্রচলিত আছে। পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত হাবড়া গ্রামে বিরাটপাটে রাজা বিরাট তাঁহার সৈন্যসামন্ত রক্ষা করিতেন, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এবং ভগ্নস্তূপগুলি একমাত্র প্রমাণ। বিরাটপাটের উত্তরে কীচক-দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজপর্য্যন্তও বিরাজমান রহিয়াছে। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক স্থানে সীতাদেবী তাঁহার নির্ব্বাসনকালে বাস করিয়াছিলেন এবং এই প্রবাদের পোষকতায় করতোয়া-তীরে বাল্মীকিমুনির আশ্রম এবং তর্পণঘাট বাল্মীকিমুনির স্নান এবং তর্পণের ঘাট ইত্যাদি ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত ঘাটনগর-রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং আগরা-দণ্ডনের হোরা রাজার বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কতকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে কে বলিতে পারে? দিনাজপুর জেলার পল্লীগ্রামগুলির নামের প্রতি দৃষ্টি করিলেও জানিতে পাই যে, নামগুলি প্রায়ই দেবদেবীর নাম-সংযুক্ত এবং সম্পূর্ণ সংস্কৃতমূলক। ইহা হইতেও এ স্থানের প্রাচীনকালের সাহিত্য-সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগের পর হিন্দু-রাজত্বের এবং মুসলমান-রাজত্বের সময় দিনাজপুরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে হিন্দুরাজগণের এবং বৌদ্ধরাজগণের রাজত্ব-কালে দিনাজপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। তৎপর স্বদেশবৎসল আদর্শ-ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এবং উত্তর-বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন সাহিত্য-রথী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়প্রমুখ কর্ম্মিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং যত্নে রামপুর-বোয়ালিয়াতে উত্তর-বঙ্গের পুরাকীর্ত্তির যে সঙ্কলন হইয়াছে, তাহা দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং এই সকল অসংখ্য মূর্ত্তি এবং অন্যান্য-বস্তুর ভিতরে যে অতীত কালের ইতিবৃত্ত সন্নিহিত আছে তাহা কতকালে উদ্ধার হইবে কে বলিতে পারে ? কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বঙ্গসাহিত্যের যে সকল অমূল্য উপাদান সংগ্রহ এবং তাহার বিবরণ সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তজ্জন্য সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহাদিগের নিকট চিরকাল ঋণী রহিবে এবং ইঁহাদিগের দীর্ঘ জীবন এবং অক্ষয় যশের জন্য ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করিবে। দিনাজপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন,। দিনাজপুরবাসী যিনি যতদূর পারেন এই সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিলে সমিতির বিশেষ উপকার হইতে পারে। ঐতিহাসিকের নিকট যে সকল স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ তাহারই মধ্যে কয়েকটির এইস্থানে উল্লেখ করিব মাত্র। গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণগড়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। মোল্লা আতাউদ্দিন সাহার মসজেদ এবং দরগা, ধল দীঘি, কাল দীঘি, বখতিয়ার খিলিজির সেনানিবাস এবং গোরস্থান, মহীপাল দীঘি, ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী বাদাল-স্তম্ভ বা ভীমের পান্টি, পির বজরুদ্দিনের মসজেদ এবং গোরস্থান, ধীবর দীঘি, আগরা তুগুল প্রভৃতি বহু পরিচিত এবং অপরিচিত স্থান হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান-রাজগণের কীর্ত্তি অদ্যাবধি ঘোষিত করিতেছে।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের সহিত দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষরূপে সংস্পৃষ্ট। মুসলমান-রাজত্বের সময় এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। মুসলমান-রাজত্বকালে ইঁহারা রাজ্যশাসন এবং বিচারাদি কার্য্য স্বাধীন নরপতিগণের ন্যায়ই করিতেন। দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে ইঁহাদিগের নির্ম্মিত মন্দিরাদি এবং ইঁহাদিগেরই খনিত দীর্ঘিকাদি আজিও এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং লোকহিতৈষণার পরিচয় দিতেছে। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ ৺কান্তজিউ দেবের মন্দিরটি বাঙ্গালাদেশে একটি অতুলনীয় কীর্ত্তি এবং এই বংশের দেবসেবার আন্তরিকতার পরিচয়-স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া গোবিন্দনগর, প্রাণ-নগর, গোপালগঞ্জ, আনন্দ-সাগর, মাতা-সাগর, শুক-সাগর, রাম-সাগর, প্রভৃতি এই বংশের বহু কীর্ত্তি দর্শকগণকে আজিও চমৎকৃত করিতেছে। এই সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন যিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং যাঁহার অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের ফলস্বরূপ এই সাহিত্য-সম্মিলন, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের নানা উপাদান সংগ্রহের জন্য যেরূপ চেষ্টা এবং যত্ন করিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। সমবেত প্রতিনিধিগণের জন্য দিনাজপুর রাজবংশের প্রধান কীর্ত্তি কান্তনগরের মন্দির দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া ইনি আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহা-দিগের প্রতি কমলার কৃপা আছে তাঁহারা যদি সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে এইভাবে স্বয়ং যোগদান করেন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া আইসে।

সাহিত্য-পরিষৎ যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সাধন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। স্থান এবং প্রয়োজন-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থসকল রচনার কার্য্যটি অতিশয় ব্যয়-সাধ্য। আজি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ এই সম্মিলনের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে দেখিয়া প্রাণে আশা হয় যে, এমন দিন আসিয়াছে যে অর্থের অভাবে যাহা প্রকৃত জাতীয় উন্নতির পক্ষে হিতকর এরূপ কোন কার্য্য বন্ধ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দিনাজপুরের মাড়োয়ারী-ব্যবসায়িগণ আমাদিগকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাতে দেশের

পক্ষে অশেষ মঙ্গল সূচিত করিতেছে। সুদূরস্থিত মাড়োয়ার হইতে আগ-মন করিয়া ইঁহারা বঙ্গদেশকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, বাঙ্গালীর আশা-ভরসা, বাঙ্গালীর উন্নতি এবং অবনতির সহিত ইঁহাদিগেরও সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, উন্নতি এবং অবনতি বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। এ সত্য ইঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা অতি সুখের বিষয়। আমাদিগের মাড়োয়ারি-ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জন্য ইঁহারা বড় ব্যস্ত হন না। কিন্তু আজি এই সম্মিলনের জন্য এই সাহিত্যসেবা-প্রাঙ্গণে তাঁহারা যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত যোগদান করিয়াছেন তাহাতেই মনে হয় ইঁহারা চিরকাল লক্ষ্মীর বরপুত্র হইলেও সরস্বতীর কৃপালাভের জন্য প্রকৃতই উৎসুক হইয়া-ছেন। ইহা দেশের মঙ্গলের কথা। ইহা এই ক্ষুদ্র সম্মিলনের ও একটি গৌরবের সহিত উল্লেখ করিবার বিষয়।

দিনাজপুর-সম্বন্ধে একটি অবশ্য-উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। সেটি আমাদের ভাষা। রঙ্গপুর দিনাজপুর অনেকের নিকট "বাহের দেশ" এবং "হুজুর" দেশ বলিয়া পরিচিত। দিনাজপুর বাঙ্গালা দেশের কোন দিকে অবস্থিত এবং আসামের নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে এই অদ্ভুত স্থানটি থাকিতে পারে এরূপ জ্ঞান কোন কোন প্রদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল, এরূপ কাহিনী আমরাও শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হয় একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যায় যে, আজ বঙ্গদেশের যাঁহারা কোন সন্ধান রাখেন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ হাস্যোদ্দীপক জ্ঞানের পরি-চয় পাওয়া যায় না।

দিনাজপুরের ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে, এটি রঙ্গপুর এবং পূর্ণিয়ার ভাষার একটি সংমিশ্রণ। দিনাজপুর

বঙ্গদেশান্তর্গত হইলেও বিহার-প্রদেশের সহিত বিশেষভাবে সংস্পৃষ্ট এবং দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা ভাঙ্গা খোট্টাই ভাষা বটে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষণে যেখানে বারসই রেলষ্টেসন হইয়াছে, সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলটি পূর্ব্বে বিহারান্তর্গতই ছিল। তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই, এ দেশের অনেক হিন্দু-পরিবার মিতাক্ষরা আইন-শাসিত এবং পূর্ণিয়া-অঞ্চলের আচারবিশিষ্ট। আবার পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষার সহিত রঙ্গপুরের ভাষার অতি অল্পই পার্থক্য আছে। রঙ্গপুরের প্রচলিত ভাষার সহিত গ্রন্থাদির পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনাজ-পুরের ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থাদির সহিত আমাদিগের এ পর্য্যন্ত কোনরূপ পরিচয় হয় নাই। দিনাজপুরের ভাষা নিম্নশ্রেণীর অধিবাসী-গণের মধ্যেই প্রচলিত। যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমরা এ ভাষার কোনই পরিচয় পাই না।

দিনাজপুরবাসী আজি সাহিত্যিকগণের এই সম্মিলনে আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এক নবীন উৎসাহের সহিত সাহিত্যিক-গণের অভ্যর্থনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ভগবৎ:সমীপে প্রার্থনা করি, আমাদিগের এই উদ্যম সফলতা লাভ করুক, আমাদিগের এই চেষ্টা সাহিত্যপরিষদের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুক। বিদ্যায় এবং সৌজন্যে, রাজসম্মানে এবং জনসাধারণের পরিচালনে, স্বদেশ-প্রীতিতে এবং চরিত্রমাধুর্য্যে যিনি উত্তর বঙ্গকে এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে ভূষিত করিয়াছেন, সেই সৌম্যমূর্ত্তি আশুতোষ আজ এই সম্মিলনকে পরিচালিত করিতেছেন। দিনাজপুরবাসী তাঁহার নায়কত্বে এই সম্মিলনে উপস্থিত নানা স্থানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের নিকট বহু জ্ঞানলাভ করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। ভগবতী ভারতী দিনাজপুর-

বাসীর এই দীর্ঘকাল পোষিত আশাকে ফলবতী করুন, আমাদিগের এই সম্মিলন ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া মাতৃভাষার সাধনারূপ একই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় চেষ্টা তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রকারের সাহিত্যোদ্দম জাতীয় উন্নতির পথে লইয়া যাউক, ইহাই ভগবৎ-সমীপে আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয় বলিলেন—দিনাজপুর অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় যে, অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে এক অংশে বলিয়াছেন যে, দিনাজপুরের পুরাতত্ত্ব-উদ্ধার জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশের ইতিহাস সঙ্কলন করাই ঐ সমিতির প্রধান কার্য্য। সুসমাচার এই যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১২ খণ্ডে ভারতের ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। এই ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা স্বনামধন্য পারসীক-বণিক টাটার সুযোগ্য পুত্র বহন করিবেন। এই দ্বাদশ খণ্ড মধ্যে বঙ্গদেশের ইতিহাস দুই খণ্ডে লিখিত হইবে। আমাদের ন্যায় অক্ষমদিগের উপরেই উক্ত খণ্ডদ্বয়ের রচনার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সুসমাচার শ্রবণে সদস্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের মন্তব্য শ্রবণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিলেন—একটা নদীতে কখনই জ্ঞানের পিপাসা মিটিতে পারে না। যত বেশী সম্মিলন হইবে ততই জ্ঞানবৃদ্ধির ও প্রচারের সুযোগ হইবে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে নানা সম্মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে। (১) প্রাদেশিক বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে; (২) স্থানীয় লোকদিগকে কাজের অবসর দিলে অনেক কাজের লোক বাহির হইবে, কর্ম্মের অবসর দিলে কর্ম্মী প্রস্তুত হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বিগত গৌহাটী-সম্মিলনে গঠিত

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম বর্ষের নিম্নলিখিত কার্য্য-বিবরণ ঐ সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় পাঠ করিলেন।

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

১—মহাপীঠ নীলাচলে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনে কোচবিহারের অন্যতর জমিদার ও রাজমন্ত্রণা-সভার সদস্য মৌলবি আমানতউল্লা আহম্মদ চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাবে এবং রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"এই সম্মিলন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করিবেন এবং তদ্দ্বারা এতদঞ্চলের প্রাচীন পুথি, প্রত্নতত্ত্ব ও মানব-তত্ত্ব সংগ্রহ এবং বিবিধ জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সঙ্কলন ও ঐ সকল বিষয়ের বিবরণ বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল তাহা এক বৎসর পরে সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন। তিনিই এই সমিতির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সংগৃহীত অর্থের ন্যাস-রক্ষক নিযুক্ত হইলেন।"

সমিতির সদস্যদিগের নাম :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন
„ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কবিবিশারদ
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ

শ্রীযুক্ত শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ
" তারানাথ কাব্যবিনোদ
" প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী
" গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা
" উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া
" রজনীকুমার দাস
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" উমেশচন্দ্র দে
" গোপালকৃষ্ণ দে

ইহাতে আবশ্যকমত সময় সময় অন্য নামও যুক্ত হইতে পারিবে।

২।—এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধারণ্যে বিজ্ঞাপন দ্বারা ১৩১৯ সালের ২২ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় সোণারাম-স্কুলগৃহে গৌহাটিস্থ অসমীয়া ও বাঙ্গালী অনেক ভদ্রলোকের সমবায় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন বিএ বিএল্ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রারম্ভিক অধিবেশন

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে এই সমিতির নামকরণ ও উদ্দেশ্য একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁহার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এই ঃ—

নামকরণ

"কামরূপ" এই নামের সহিত কত গৌরবমণ্ডিত ইতিবৃত্ত এবং মহিমময়ী কীর্ত্তিকাহিনী জড়িত রহিয়াছে; যাহার স্মরণ এবং কীর্ত্তনে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। এহেন পুণ্যভূমির তথ্যানুসন্ধান জন্য মহাপীঠ নীলাচলে কামরূপেশ্বরী ভগবতী কামাখ্যাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে

এই সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে জন্মলাভ করায় এই সমিতির নাম "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি" রাখা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য

এতদঞ্চলের অনুসন্ধানযোগ্য যাবতীয় বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান দ্বারা জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করা ও ভাষার উন্নতি-সাধন এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই বিস্তৃত দেশের নানাবিধ তথ্য অবগত হইবার জন্য জ্ঞানের সাধনা দ্বারা নবশক্তি লাভ করিয়া বহুবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ সাধনায় আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি—যে কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই সাধনায় সিদ্ধ তিনিই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি এইরূপ সাধক প্রস্তুত করিবেন এই আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া সিদ্ধপীঠে উদ্ভূত হইলেন। পীঠাধিষ্ঠাত্রী মহা-শক্তির করুণা-কণাই ইহার ভরসার সম্বল।"

কার্য্য-প্রণালী ও কর্ম্ম-চারী-নিয়োগ

তৎপর নানা আলোচনা দ্বারা স্থির হয় যে, এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্র প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত সমস্ত স্থান লইয়া হইবে। অতঃপর কয়েকজন নূতন সভ্য নিযুক্ত হন এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

২ জন কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী
„ কালীচরণ সেন কোষাধ্যক্ষ

৩ জন সহকারী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ লক্ষ্মীনাথ বড়া
„ গোপালকৃষ্ণ দে

"মন্ত্রণার্থ উহাঁরা আবশ্যকমত ২।১ জনকে লইয়া মন্ত্রণা-সভা করিবেন। সাধারণ সভার প্রয়োজন হইলে সমস্ত সভ্যদিগকে লইয়া তাঁহারা সভা করিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) অনুসন্ধানের ফল অন্যূন তিনমাসে একবার সভায় পেশ করিতে হইবে। আবশ্যক মত মন্ত্রণা-সভা বিশেষ অধিবেশন ডাকিতে পারেন।

(২) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মুখপত্রস্বরূপ রঙ্গপুর-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক যেন অনুসন্ধান-সমিতির ফল-স্বরূপ প্রবন্ধাদি তিনি পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

(৩ মন্ত্রণা-সভা-সমিতির সম্পূর্ণ নিয়মাবলী গঠন ও সাধারণ্যে প্রচারার্থ আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিয়া একমাস মধ্যে সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

৩।—ইহার পরে নিয়মমত কোনও সভা হয় নাই বটে ; তবে সমিতির কার্য্য অল্প-সল্প যাহা হইয়াছে তাহার বিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

৪।—বর্ত্তমানে কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি সমষ্টিভাবে অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অধিকতর কার্য্যকরী করিবার সূচনা করিলেন বটে কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হইতে ব্যষ্টিভাবে এই অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে।

পূর্ব্বাভাস

"কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনুসন্ধান-সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী সমিতির আবির্ভাবের সহায়তা এবং ইহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়াছে এই নিমিত্ত সে গুলির একটা মোটামুটি বিবরণ এস্থলে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৩১৩ সালের পৌষমাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয় "পরশুরাম-কুণ্ড" পরিভ্রমণ করিয়া ইংরাজীতে যে

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন উহা প্রথমতঃ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে "Statesman" "Times of Assam" এবং Weckly Cronichle পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল, অবশেষে পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের উকীলসরকার অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর বি-এ বি এল কর্ত্তৃক ইহার বিষয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গের গোচরীভূত হয়; ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ পরশুরামের রাস্তা নির্ম্মাণে হাত দেন এবং এতদ্বিষয়ক সরকারী মন্তব্যের প্রথমেই সেই "Diary of a Pilgrim to Parsuram Kunda" এর উল্লেখ হইয়াছিল। আবার বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ বর্ষ পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সন) পঠিত হইয়া পরিষদ-পত্রিকার ৫ম ভাগে ৩।৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত সভায় প্রবন্ধালোচনা-কালে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"গত গৌরীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতি-রূপে তাঁহার অভিভাষণে আভাস দিয়াছিলেন যে, সুদূর বদরিকাশ্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী পরশুরাম কুণ্ডের পথ-ঘাটের বিষয় আজও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহা তাঁহাদের আসামসম্বন্ধে ঔদাসীন্যের অকাট্য প্রমাণ। এইরূপ আভাস দেওয়ার পর বঙ্গসাহিত্য-সমাজের কলঙ্ক মোচনার্থ তিনি নিজেই (বহুশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই দুর্গম স্থানে গমন করিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করেন) তাহার আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আসামের অতীত কাহিনী বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার গণ্ডীর বাহিরেই যে এতকাল পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও বহু শিক্ষিত বঙ্গবাসী আসামের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া

আসামের অঙ্কেই জীবনপাত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য-রূপে এই বঙ্গসন্নিহিত গৌরবময় প্রদেশের তত্ত্বান্বেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই।” ইত্যাদি

বস্তুতঃ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরশুরাম কুণ্ড ভ্রমণে একযাত্রায় নানা-বিধ ফল ফলিয়াছিল ১ম ঃ—ভৌগোলিক-তথ্য (কুণ্ডের সংস্থানাদি) প্রবন্ধ-মুখে প্রচার, ২য় বঙ্গভাষায় পরশুরাম-কুণ্ড সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের প্রথম প্রকাশ, ৩য় পরশুরামযাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পথ-প্রস্তুতের উপায় নির্দ্দেশ ইত্যাদি। অতএব তিনি যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের ধন্যবাদার্হ তৎপক্ষে আর সন্দেহের কথা কিছু আছে কি?

৫।—এই যাত্রার ফল কেবল পরশুরামে পর্য্যবসিত হয় নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরশুরাম হইতে ফিরিবার সময়ে পথে বিশ্বনাথ ও তেজপুর পরিদর্শন করিয়া ইংরাজীতে Notes on the ruins at Tezpur শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আসাম প্রদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পরি-চালক শ্রীযুক্ত কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন এবং যাহাতে গৌহাটি সহরে একটি চিত্রশালা (Museum) স্থাপিত হইয়া তাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তির স্মারক-প্রস্তরাদি তাহাতে সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য একটি প্রস্তাব করেন। কর্ণেল গর্ডন বাহাদুর, প্রবন্ধটি এসিয়াটিক সোসাইটিতে এবং ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। প্রবন্ধ আংশিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুদ্রিত হয় পরে Malabar Quarterly Reviewতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। পশ্চাৎ “আসাম-ভ্রমণ” নামধেয় বাঙ্গালা প্রবন্ধাকারে তেজপুর ও বিশ্বনাথ ভ্রমণ-কাহিনী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

চিত্রশালা-স্থাপনের এই প্রস্তাব যেন শুভমুহূর্ত্তেই করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তেজপুরস্থ বাণরাজবাটীস্থ ধ্বংসাবশেষ কিরূপভাবে কোথায়

রক্ষিত হইবে এতৎসম্পর্কে ১৯১৩ সনের ২২শে জানুয়ারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পরে এ বিষয়ে আরও কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে।

৬।—১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যোড়হাট গমন করিয়া আহোম-রাজগণের শেষ রাজধানী পরিদর্শন করেন। তৎপর পৌষমাসে বড়দিনের মধ্যে ডিমাপুর গিয়া কাছাড়-রাজগণের প্রাচীনতম কীর্ত্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। ঐ সময়েই শিবসাগব গিয়া জয়সাগর, রঙ্গপুর, শিবসাগর ও গড়গাওঁ পরিদর্শন করিয়া আইসেন। ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে মাইবঙ্গ গিয়া কাছাড়-রাজগণের আরও কীর্ত্তিকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় গ্রহণ করেন। ঐ সকল অনুসন্ধানের ফল ও তল্লিখিত আসাম-ভ্রমণ ২য় ও ৩য় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

৭।—তৎসময় বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা সংস্থাপিত হওয়ায় এইরূপ প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিকবিষয়ক অনুসন্ধানের প্রসার বৃদ্ধি হয়। যাহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একাকী করিতেছিলেন তাহাতে অপরেরাও আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে প্রভৃতি আসামের নানাবিধ তথ্য-বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করিলেন। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ যিনি অনেক পূর্ব্ব হইতেই আসামের ঐতিহাসিক তথ্যাদি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন তিনিও এই সভায় যোগ দিলেন। অধিকন্তু সুখের বিষয় এই যে, আসামের অধিবাসী প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়প্রমুখ আসামদেশীয় দুই একজন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা দ্বারা এই কার্য্যে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।

৮।—ব্যষ্টিভাবে যে কাজ হইতেছিল সমষ্টিভাবে সেকার্য্য প্রথমতঃ

কেবল প্রবন্ধাদির আলোচনাতেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অন্যবিধ আকারে পরিণত হইতে লাগিল। একাধিক জনে মিলিয়া ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত বস্তুর অনুসন্ধান-কার্য্যও আরব্ধ হইল। ১৩১৬ সনের চৈত্রমাসে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে গৌহাটীতে আসেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় এবং আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গৌহাটি সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী কোনও কোনও স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহাতে একটি কাজ হইল। ৺শ্রী কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিম দ্বারের পরিচায়ক একটি লিপি একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে খোদিত আছে; সেই প্রস্তর-খণ্ড Preservation of ancient monument, act অনুসারে সংরক্ষিত হইয়াছে। সেই প্রস্তরটির চতুষ্পার্শ্বে লোহার খুঁটা পুতিয়া একটা লৌহ শিকল দ্বারা ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূচনা

তথ্যানুসন্ধান জন্য অভিযান

৯।— পর বৎসরে (১৩১৭ সালে) সমষ্টিভাবে তিনটি এবং ব্যষ্টিভাবে একটি তথ্যানুসন্ধানের অভিযান হয়।

১ম ঃ—ইদের বন্ধ উপলক্ষে পৌষমাসে কটন কলেজের কতিপয় অধ্যাপক এবং বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার কতিপয় উৎসাহী সদস্য মিলিয়া দিষপুর নামক স্থানটি দেখিয়া আইসেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের স্মারকচিহ্ন। এতদুপলক্ষে আহোমরাজগণের সময়ে নির্ম্মিত গৌহাটির দক্ষিণ দিক-সংরক্ষক একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ইষ্টক-চিহ্ন এখনও ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতদুপলক্ষে একটি রসাল প্রবন্ধ লিখেন। গৌহাটিস্থ সাহিত্যানুশীলনী সভায় উহা পঠিত হয়।

২য় ঃ—বড় দিনের বন্ধে বড়পেটায় সত্রাদি প্রেক্ষণার্থ একটি অভিযান করা হয়। মহাপুরুষ ৺শঙ্করদেবের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে এবং বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত মল্লনারায়ণ দাস মহাশয়, আরও ২।১ জন সহ মিলিয়া উক্ত মহাপুরুষের অবস্থান-ভূমি বড়পেটার নানা স্থান পর্য্যটন করেন। এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ সাহিত্যানুশীলনী সভায় পাঠার্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন।

৩য় ঃ—ইংরেজী নববর্ষের ১ম দিবস নবগ্রহ-পাহাড়ে পরিভ্রমণ করা হয়। এস্থানে প্রাচীনকালে কোন মানমন্দির ছিল কিনা তদ্বিষয়ে খোঁজ করাই এ অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তদুপলক্ষে নবগ্রহের ও শিলপুখুরির লিপি পাঠ করা হয়। এতৎসম্বন্ধে বিবরণ শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে সাহিত্যানুশীলনী সভায় পাঠ করেন।

এই গেল সমষ্টিভাবের কথা। ব্যষ্টিভাবে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে সেন্‌সাসের কার্য্যোপলক্ষে হাজোনামক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সাহিত্যানুশীলনী সভায় তথা হইতে সংগৃহীত ৩ খানি কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টক প্রদর্শন করেন। উহা বর্ত্তমানে কার্জ্জন-হলে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্য চিত্রসহ সত্বরেই লিপিবদ্ধ করিয়া অনুসন্ধান-সমিতির মারফতে সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবেন।

১০ ঃ—১৩১৮ সালে ঈদৃশ ঐতিহাসিক অভিযান একটিমাত্র হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কাছাড়ের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের সহযোগে কাছাড়ের শেষ রাজধানী খাসপুরস্থ মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনার্থ গমন করেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণী ruins at khaspur শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের নিকটে দাখিল

করেন। এবং যাহাতে ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরাদি সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে প্রস্তাব করেন। তাঁহার অনুজ্ঞামতে প্রবন্ধটি Dacca Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে এই প্রবন্ধ কাছাড়-রাজমন্ত্রির বংশ-সম্ভূত উক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর কর্ত্তৃক কাছাড়ের ডিপুটীকমিশনর বাহাদুরের গোচরীভূত হইলে তিনি খাসপুরে গমন করিয়া তাঁহার Diaryতে ইহার অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপে আসল ব্যাপার মহামান্য চীফ্ কমিশন বাহাদুরের গোচরে আইসে। তৎফলে বিগত ১৪ই মে তারিখের আসাম-গেজেটে ঐ সকল মন্দিরাদি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক Under ancient monument preservation act. সংরক্ষিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে।

১১।—১৩১৭ সালের আরও দুইটি বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অপর কয়েকজন তথ্যানুসন্ধায়ী মহোদয়-সহযোগে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আসামের প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ ও ঐ গুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা; ২য় ধারাবাহিকরূপে আসামের পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও সামাজিক তথ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা। প্রথম বিষয়ের ভার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করেন, ইহার ফলে "হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি" খানি সংগৃহীত হইয়া গৌহাটিস্থ সাহিত্যানুশীলনী সভায় ও উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়া সচিত্র ভূমিকা সহকারে কাছাড়ের প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহোদয়ের সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; অসমীয়া দুইখানি পুথি বিষয়ক একটি সচিত্র প্রবন্ধ রঙ্গপুর-পরিষদের এক অধিবেশনে আলোচিত হইয়া ঐ পরিষদ পত্রিকায়-মুদ্রিত ও প্রচলিত হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি পুথি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং 'দীপিকাছন্দ' নামক সুপ্রাচীন বলিয়া কথিত অপর একখানি অসমীয়া গ্রন্থের সমালোচনা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর এই কার্য্যভার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ও দুখানি পুথির বিবরণ লিখিয়া সাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রেরণ করেন। উহা ঐ সভায় পঠিত হইবার পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ আসামের পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও সামাজিক তথ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে "প্রাচীন কামরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন, যাহা উক্ত সম্মিলনের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর ১৩১৮ সালে "কামরূপের সামাজিক-প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে কামাখ্যা-অধিবেশনে পঠিত হয় এবং বিগত ফাল্গুন মাসের "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। তিনি এতদ্বিষয়ক আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে "বিশ্ববার্ত্তায়" প্রকাশিত করেন।

১২।—এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচায়ক বস্তু-সংগ্রহও কিছু কিছু হইতে লাগিল। হাজোর ইষ্টকের কথা বলা হইয়াছে। তৎপর "মাইবঙ্গ" হইতে একটি ভগ্ন শিলামূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আনিয়া তৎপার্শ্বে রক্ষা করিলেন। ক্রমশঃ আরও দুই একটি বস্তু যথা—প্রস্তরের সিংহ-মূর্ত্তি ইত্যাদি আহরণ করা হইয়াছে।

১৩।—১৩১৮ সাল হইতে গৌহাটিস্থ সাহিত্যানুশীলনী সভা অভি-যানাদির প্রতি তেমন সাগ্রহ নয়নে দৃষ্টিপাত না করাতে তাদৃশ কার্য্যস্রোত একটু মন্দীভূত হইয়া পড়ে—ব্যষ্টিভাবে একটি অভিযান মাত্র হইয়াছিল—সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তথাপি প্রাগুক্ত উৎসাহী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ, পুস্তক-বিবরণী সংকলন এবং বস্তু-আহরণকার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

১৪।—১৩১৮ সনের শেষার্দ্ধে ৺মহামায়া কামাখ্যাপীঠে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন প্রস্তাব স্থির হইল। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অনুকরণে কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি সংস্থাপন সম্ভবপর কিনা, এতৎ-সম্বন্ধে তদীয় বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে কামাখ্যা-সম্মিলন-উপলক্ষে এ বিষয়ে যথোচিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার সংকল্প স্থির হইল। অতঃপর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর ৺কামাখ্যা অধিবেশনের "বিষয়নির্দ্ধারণ কমিটি"র আলোচনাকালীন শ্রীযুক্ত গোপাল-কৃষ্ণ দে মহাশয় কমিটিতে প্রশ্ন করেন যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দুইবারই আসামপ্রদেশে অধিবেশন হইল কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যিকগণ হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি না পাইবার কারণ কি? দেখা যায় উহাঁদের একটা ধারণা এই জন্মিয়াছে যে বাঙ্গালীরা তাঁহাদের ভাষাকে বড়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, ইহাকে একটা ভাষাই মনে করেন না—এমন কি এই ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিবার জন্য বাঙ্গালীরা যথাসাধ্য প্রয়াস করেন। আর এই সম্মিলনের ভাণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধার অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিকল্পেই যত্ন করেন কিন্তু আসামী ভাষার জন্য কিছুই করেন না। অতএব এইভাব দূর করিয়া যথার্থ সৌহার্দ্দ জন্মাইবার জন্য আসামীভাষার ও আসামের তথ্যাবিষ্কার দ্বারা আসামের সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি করা যাইতে পারে তাহার একটা উপায় নির্দ্ধারণ হউক। অনেক আলোচনার পর স্থির হয় যে, সংকল্পিত কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির দ্বারাই এই মিলন-কার্য্যের শুভসংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাই এই সমিতি এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, যাহাতে যে সকল আসামবাসী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক নানা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ৺কামাখ্যা-সম্মিলনে আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছিলেন—

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির গঠনকল্পনা।

তাঁহাদিগকেও সমিতির মধ্যে সদস্যরূপে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষায়ও ইহার অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিধান করা হইয়াছে।

১৫।—অনুসন্ধান-সমিতির গঠনের পর নানা কারণবশতঃ বিশেষ-ভাবে অভিযানাদি কার্য্য না হইলেও যাহা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) ঃ—১৩১৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তি দিবস কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে কামাখ্যাপাহাড়ের পাদমূলস্থ শিলালিপি (যাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) পাঠ ও তল্লিখিত পরিখা ও প্রাচীরের অনুসন্ধান করেন। শিলালিপি লিখিত বিষয়টি এই ঃ—আহোমরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহের আদেশক্রমে শ্রীমদ্দহিঙ্গীয়া বড়ফুকন কর্ত্তৃক প্রাগজ্যোতিষপুরের শিলেষ্টকাদি নির্ম্মিত পশ্চিমদ্বারের দক্ষিণভাগ দুইশত পঞ্চাশধনু পরিমিত প্রাচীর ও দুইশত বাইশ ধনু পরিমিত পরিখাদ্বারা ১৬৫৪ শকে অলঙ্কৃত হইল।

শিলালিপিপাঠ

(২) ঃ—১১ই মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে ও তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সোনারাম চৌধুরী, (কমিশনার আপিসের জনৈক কর্ম্মচারী) গৌহাটি সহরস্থ সার্কিট-হাউসের হাতায় যে শিলালিপি রহিয়াছে তাহা পাঠ করেন। তাহার সংক্ষিপ্তসার এই ঃ—শক্রবংশাবতংশ সৌমারেশ্বর স্বর্গদেব শ্রীশ্রীমৎশিবসিংহের আদেশক্রমে ডুবরাকুলকমল দিনকর শ্রীমত্তকণ ডুবরা বৃহৎফুকন দেবসভাকার দুর্গম প্রাকারবেষ্টিত (বিজয়নামক দক্ষিণদ্বার-বিশিষ্ট) বিচিত্র দরবারমন্দির ১৬৬০ শকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(৩) ঃ—১২ই মাঘ পুনঃ তারকেশ্বর বাবু, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং গোপালবাবু নবগ্রহ ছত্রাকার প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন কিন্তু

ইহাতে দুইবৎসর পূর্ব্বকৃত কার্য্যালোচনা ভিন্ন বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই।

(৪):—১৪ই মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং গোপালবাবু আমিনগাঁও হইতে ২॥০ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামে চিলা নামধেয় পর্ব্বতগাত্রস্থ শিলালিপি পাঠ করেন। তাহার বিবরণ এই:—

"শিলাচলের পূর্ব্বভাগে ১২৪৮ ধনু পরিমিত রঙ্গমহাল নামক গড়খাই ১৬৫৪ শকে মহারাজ শিবসিংহের আদেশক্রমে দিহিঙ্গীয় বড়ফুকন কর্ত্তৃক খনিত হইল।" কামাখ্যাপাহাড়ের পাদমূলস্থ শিলালিপি এবং এই শিলালিপি একই বৎসরের। পরে ফিরিবার সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শরাইঘাট যুদ্ধক্ষেত্র এবং অন্য একটি গড় পরিদর্শন করা হইয়াছিল। এই সকলের বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ হইলে, আসাম-ইতিহাসের অনেক তথ্য দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৫):—তারপর এই বৎসরের জন্য শেষবার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একাই বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়া মন্দিরস্থ শিলালিপি পাঠ করেন এবং অরুন্ধতী-গুহা দর্শন করেন। তদ্বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের "মানসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিগত মাঘমাসে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের গৌহাটিতে আসিবার কথা ছিল। তখন সমিতির পক্ষ হইতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আসাম-প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পরিচালক কর্ণেল গর্ডন বাহাদুর দ্বারা নগেন্দ্রবাবুর গৌহাটি হইতে তেজপুর গমনাগমনের ব্যয় মঞ্জুর করাইয়াছিলেন এবং তেজপুর গিয়া যাহাতে তিনি তত্রত্য পর্ব্বত-গাত্রলিপি পাঠ করিতে পারেন তদর্থে সুবিধা করা হইয়াছিল। কিন্তু

দুঃখের বিষয় কোনও কারণে নগেন্দ্রবাবুর গৌহাটিতে আগমন ঘটিয়া উঠে নাই।

১৬।—এই বৎসরের কার্য্যাবলীর মধ্যে কামরূপ-শাসনাবলীর অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্য আসামের পণ্ডিতরত্ন মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন"খানি ১৩১৬ সালে গৌহাটি-সাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রদর্শন করেন। ইহা বহুপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই দ্বারায় 'আসাম'-নামক পত্রে, পরিশেষে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার হর্ণলি দ্বারা ইংরাজীতে আলোচিত হয়। যাহাই হউক, এই তাম্রশাসনখানির বঙ্গানুবাদ এবং হর্ণলি সাহেবের পাঠ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়া পরিষদ-পত্রিকায় ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত অন্যান্য তাম্রশাসনও এইরূপে বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

কামরূপ-শাসনাবলী

ইতিমধ্যে অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতর সম্পাদক আসাম-প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নবাবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করেন এবং শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। সাহিত্যানুশীলনী সভায় ইহারও আলোচনা হইয়াছিল।

অতঃপর যখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি-অনুসারে ইন্দ্র-পালের তাম্রশাসন সমালোচনায় হাত দেন, তখন কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির পত্তন হইল; তিনিও তাঁহার কর্ম্মফল সমিতিতে অর্পণ করিয়া পূর্ব্বে আলোচিত বলবর্ম্মার শাসনকে ১ম সংখ্যক কল্পনা করিয়া ইন্দ্রপালের

তাম্রশাসনকে কামরূপ-শাসনাবলীর ২য় সংখ্যক করিয়া সমিতির নিয়মানুসারে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করেন—তাহা ঐ পরিষদের এক অধিবেশনে পঠিত হইয়া রঙ্গপুর পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর এই অনুসন্ধান-সমিতি যাঁহার দ্বারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে তাঁহারই কৃপায় অভাবনীয় উপায়ে এক অতি প্রাচীন তাম্রশাসন বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের হস্তে আসিয়া পতিত হইয়াছে। ইহা এতৎপ্রদেশে এযাবৎ প্রাপ্ত সমস্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহার সম্বন্ধে "সাহিত্য-সংবাদ"পত্রের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় যে সংবাদটুকু প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রাণস্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয় সম্প্রতি এক প্রাচীন তাম্রশাসনের আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত পরগণা পঞ্চখণ্ডে ৬ হাত মাটীর নীচে ঐ তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐ তাম্রশাসন-পত্রের পাঠোদ্ধারে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঐ তাম্রশাসন-খানি কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাং কামরূপে ইহাঁকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া যান। তবেই দেখা যায় যে, শাসনপত্রখানি ৭ম শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছিল। ভাস্করবর্ম্মা তদীয় স্কন্ধাবার কর্ণসুবর্ণ হইতে শাসন আদিষ্ট করিয়াছেন। এই শাসনে তাঁহার দ্বাদশ পুরুষের নাম আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, মধ্যে ৩য় ফলকখানি নাই; সেই নিমিত্ত সম্প্রদানীভূত ব্রাহ্মণের নাম-ধাম, তথা, প্রদত্ত ভূমির ঠিকানা কিছুই জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক অতি প্রাচীন এই শাসনখানিকে সন্ধান করিয়া "কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি" সার্থকনামা হইলেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।"

ইহা কামরূপ-শাসনাবলীয় ৩য় সংখ্যকরূপে প্রকাশার্থে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ইহা পঠিত হইয়াছিল, শীঘ্রই পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সম্প্রতি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রত্নপালের তাম্রশাসনের আলোচনা করিতেছেন।

এই কামরূপ-শাসনাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ সমগ্র প্রকাশিত হইলে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রকাশিত গৌড়লেখমালার ন্যায় বঙ্গীয় ঐতিহাসিক-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবে, তৎসম্বন্ধে সংশয় নাই।

কামরূপের পুরাবৃত্ত

১৭।—কামরূপের পুরাবৃত্তসম্বন্ধেও সমিতির কিঞ্চিৎ কাজ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি প্রারম্ভেই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, প্রাচীন কামরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থল। ইহার গৌরব-কথা সমগ্র ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাত ছিল। এমন কি এখানকার অকাপ্রভৃতি পার্ব্বত্য-জাতিরাও সময়ে আর্য্যজাতির শাখাভুক্ত ছিল। কালবশাৎ যে সব কারণে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি এ ভূমির প্রাচীন সভ্যতা, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষণা করিয়া বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল অর্থাৎ নরকাসুর হইতে কোচরাজত্ব পর্য্যন্ত এ যাবৎ এ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন বলিয়া আশা করেন।

চিত্রশালা ও গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব

১৮।—গত জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখের আসাম গেজেটে তেজপুরস্থ বাণরাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ রক্ষণ-সম্বন্ধে চিফকমিশনার সাহেব বাহাদুরের একটি রিজলিউশান

প্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে আমাদের সমিতি এতদ্বিষয়ে পত্রদ্বারা এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আসামের কেন্দ্রস্থানীয় গৌহাটিতে কেন্দ্র-চিত্রশালা central museum স্থাপন করিয়া তেজপুর এমন কি অন্যান্য স্থান হইতেও যে সকল প্রস্তরাদি স্থানান্তর করা যাইতে পারে সেই সকল এখানে আনিয়া আসামের ভবিষ্যৎ আশাস্থল কলেজের ছাত্রবর্গের চক্ষুর সম্মুখে রক্ষা করিলে স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ধারণা জন্মিবে। যাহা হউক ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট গৌহাটিতে একটি চিত্রশালা সংস্থাপনের জন্য সংস্কল্প করিতেছেন। আশা আছে, শীঘ্রই এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া এ প্রদেশের প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের পথ সুবিস্তৃত হইবে এবং তাহাতে আমাদের অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত দ্রব্যগুলিও সংস্থাপিত দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইব।

পুস্তক-সংগ্রহ ও তাদ্বিবরণী প্রকাশ

১৯।—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় তিনখানি অসমীয়া পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহা সমিতির নিয়মানুসারে রঙ্গপুর-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছে। সমিতির অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুস্তক-সংগ্রহ কার্য্যে বৃত হইয়া বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। চিত্রশালা museum স্থাপিত হইলে ঐ পুস্তকগুলি তথায় রক্ষিত হইলে সেই গুলির বিবরণ সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইবে।

আর্থিক অবস্থা

২০।—কার্য্যের সফলতা অনেক পরিমাণে আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদিগের সমিতির আর্থিক-অবস্থা-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ধনগৃহ এক প্রকার শূন্য। কেবল গত সম্মিলনীর সভাপতি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় অনুসন্ধান-সমিতি-গঠনকালীন মানবতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধানের ব্যয়-নির্ব্বা-

হের জন্য যে কয়টি মুদ্রা দিয়াছিলেন উহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এখন যাহাতে অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটে তৎকল্পে যত্ন করার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

২১।—আমাদের এই প্রথম বৎসরের কার্য্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। আমরা এ যাবৎ সংকল্পিত কার্য্যের অনেকই সম্পাদিত করিতে পারি নাই। উদাহরণ-স্থলে বলা যাইতে পারে যে, আমরা অসমীয়া-ভাষায় এ পর্য্যন্ত আমাদের সমিতির কোনও অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত করিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের ভরসা আছে যে, ভবিষ্যতে সমিতির অসমীয়া সভ্যমহোদয়গণের সাহায্যে এই কার্য্য-সম্পাদনে আমাদের কোনও রূপ ত্রুটি হইবে না।

ত্রুটি-স্বীকার

দ্বিতীয়তঃ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যে বিষয় মনস্থ করিয়া সমিতির হাতে টাকা দিয়াছেন তাহার এ যাবৎ কোনও কিছুই করিতে পারা যায় নাই। তিনি তথ্য-সংগ্রহের যে ফারম অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দুই এক স্থলে বিলিও হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন ফল হয় নাই।

তৃতীয়তঃ নিয়মিতরূপে সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশনও হইয়া উঠে নাই। এবং নিয়মাবলী গঠনাদির নিমিত্তে কোনও প্রয়াস করা এ যাবৎ হয় নাই।

২২ঃ—উপসংহারকালে এত ত্রুটি ও অভাবের মধ্যেও একটি আনন্দকর সংবাদ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। গত ৩০শে অগ্রহায়ণ * রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাদের অষ্টম বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে প্রাচীন কামরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং ৫ম মাসিক অধিবেশনে উহাদের অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি প্রস্তরফলক ও বিবিধ প্রস্তর-মূর্ত্তি

উপসংহার

প্রদর্শিত হইয়াছিল। রঙ্গপুরস্থ ভদ্র মহোদয়েরাও যে কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহা বস্তুতঃই আশা ও আহ্লাদের বিষয়। যখন বঙ্গদেশস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ আসামের প্রবাসী ও অধিবাসীর সহিত একযোগে একই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন বলা যাইতে পারে যে, কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। আসুন আমরা সকলে জগৎ-জননী মহামায়ার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহার সম্মুখে সংবৎসর পূর্ব্বে যে কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে আত্মদান করিয়া ফলাফল তাঁহাতেই অর্পণ করিয়া বলি—যৎকিঞ্চিৎ কৃতমস্মাভিস্তত্রাস্ব প্রীতিরস্তুতে।

শ্রীকালীচরণ সেন
কার্য্যাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল—

প্রবন্ধ	লেখক
১। শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ
২। মুরাদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের তিনখানি পত্র	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ

এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম,এ মহাশয় বলিলেন যে, এই চিঠি তিনখানির একখানির নকল রাজপুতানার রাজগ্রন্থাগারে পাইয়া কর্ণেল টড ইংরেজী অনুবাদ করেন। আর একখানি রয়েল-এসিয়াটিক-সোসাইটীতে আছে।

৩। রঙ্গপুরেপ্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি — শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ এম্, আর্, এ, এস্

৪। ভারতে পর্ত্তুগীজ — „ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (ছাত্রসদস্য)

এই চারিটি প্রবন্ধপাঠের পর সম্মিলনের অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের কার্য্য সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার পরে স্থগিত রাখা হয়।

রজনী দশ ঘটিকা হইতে স্থানীয় "দিনাজপুর ড্রামেটিক ক্লাব" অভিধেয় নাট্যশালার সদস্যবৃন্দ সমাগত প্রতিনিধিগণের মনোরঞ্জনার্থ "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার

প্রাতঃকাল ৮টা হইতে ১২টা।

সভাপতি মহাশয় যথাসময়ে স্বীয় আসন পরিগ্রহ করিলে পুনরায় প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল। প্রবন্ধের বিষয় ও লেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রবন্ধের নাম	লেখক
সাহিত্য	
(৫) ১। বিদ্যাপতি	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিশ্র
(৬) ২। মালদহের কবি ও গায়কগণ	„ কুমুদনাথ লাহিড়ী [পাঠক-মোহন্ত বলদেবানন্দ গিরি]
ইতিহাস	
(৭) ৩। বাণগড়	শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় [লেখকের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠ করেন]

(৮) ৪। ভারতীয় কলা-শিল্প শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হইয়াছিল]

বিজ্ঞান-বিভাগ।

(৯) ৫। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্র-নির্ম্মাণ অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী এম,এ

এইস্থানে প্রবন্ধপাঠের মুখবন্ধস্বরূপে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিবার আয়োজন বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করে নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক-বিভাগের পুষ্টি-সাধন করিতেছেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক-বিভাগ আশানুরূপ গঠিত হইতেছে না। তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথম—আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সমস্তই ইংরাজী ভাষাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয়—আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা ইংরাজী ও জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দুইটি কারণ বহুদিবস পর্য্যন্ত দেশে বর্ত্তমান থাকিবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত না হইবে, ততদিন এ দেশজাত মৌলিক গবেষণা ইউরোপের বিশাল বৈজ্ঞানিক সমাজের ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে এবং যতদিন দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য লেখক মিলিবে না।

এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও একটু স্বার্থত্যাগ করিলে আমরা এখন

হইতেই নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগের উন্নতি-সাধন করিতে পারি। প্রথমতঃ—বৈদেশিক ভাষা হইতে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী সরল বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসম্বন্ধে জ্ঞান লইয়া যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা প্রথমেই বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে। পরে আবশ্যক হইলে ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় উহাদিগকে ভাষান্তরিত করিলে চলিবে। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইলে কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। উপরন্তু ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষা হইতে ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় ভাষান্তরিত হইলে বঙ্গভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে। তৃতীয়তঃ—ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণা এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রতিবৎসর সেই সকল মৌলিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফল সরল ভাষায় দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদি পাঠ করেন না; তাঁহাদিগকে স্বদেশপ্রসূত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মাতৃ-ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা কিরূপ অগ্রসর হইতেছে। এই ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বা সাহিত্য-সম্মিলন গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক বিভাগ গঠিত হইবে এবং এমন দিন আসিবে যে, আমাদিগের বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহাদিগের মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার জন্য মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

এই স্থানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, পঞ্চানন বাবু নিজে ১০০ শত টাকা দিবেন এবং আরও ১০০ শত টাকা বন্ধুগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত। সুতরাং শস্ত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্য সত্বর আরম্ভ করার জন্য মূল পরিষৎকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

প্রবন্ধের নাম	লেখক
বিজ্ঞান	
(১০) ৬। গো-দুগ্ধ	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
(১১) ৭। প্রাচীন ভারতে ধাত্রীবিদ্যা	„ কালীকান্ত বিশ্বাস
(১২) ৮। ভারতে রোগোৎপত্তির কারণ ও পল্লীবাসের অযোগ্যতা	„ নলিনীকান্ত বসু
বিবিধ	
(১৩) ৯। অর্থ-নীতি	„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

এই প্রবন্ধের সারমাত্র বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বে লেখক বলিলেন যে আপনারা কাজ করিতেছেন করুন, পুরাতন ইষ্টক-প্রস্তর সংগ্রহ করুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উদরান্নের সংস্থান হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। ইতিহাসের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্য অর্থ-নীতিরও আলোচনা আবশ্যক। আশা করি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন।

(১৪) ১০। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা — অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম,এ

এই প্রবন্ধপাঠের পূর্ব্বে লেখক বলিলেন যে, বৈষয়িক-সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই আলোচনার সৃষ্টি মৈমনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে। তাহার পর আমি ৩।৪ বৎসর অবিরত চেষ্টা করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি; বহু গ্রামে ঘুরিয়া বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহারই একটি তালিকা মাত্র পাঠ করিব।

(১৫) ১১। আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান — শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সাহিত্য

(১৬) ১২। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা „ বিধুশেখর শাস্ত্রী

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

সাহিত্য

(১৭) ১৩। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্ন্যাল

(১৮) ১৪। নাট্যসাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল „ রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী

(১৯) ১৫। বাঙ্গলাভাষা „ বীরেশ্বর সেন

(২০) ১৬। বাঙ্গলাভাষা ও জাতীয়-সাহিত্য „ দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল

(২১) ১৭। মৈমনসিংহের নিরক্ষর কবি „ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

(২২) ১৮। বৈদিক সাহিত্য „ রমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী

ইতিহাস

(২৩) ১৯। বালুরঘাটের কয়েকটি প্রাচীন স্থানের পরিচয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

(২৪) ২০। দিনাজপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস „ প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

(২৫) ২১। উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ „ কালীকান্ত বিশ্বাস

(২৬) ২২। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য অবলম্বনে বণিকজাতির ইতিহাস „ যোগেশচন্দ্র দত্ত

বিবিধ

(২৭) ২৩। হিন্দু-মুসলমান-সম্বন্ধে চিন্তার কতিপয় জলবিম্ব „ মৌলবী ইয়াকুনউদ্দিন আহাম্মদ

(২৮) ২৪। পল্লীচিত্র „ মাধবচন্দ্র শিকদার

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি নানা কারণে পঠিত হইতে পারে নাই।

প্রবন্ধ

২৯।	সঙ্গীত	চন্দ্রনাথ রায়
৩০।	জল্পেশ দর্শন	
৩১।	দেশীয় ভাষা	
৩২।	হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা	শিবনাথ বুজর বরুয়া স্মৃতিতীর্থ
৩৩।	কাঠগড়	কৃষ্ণনাথ সেন
৩৪।	কবি ও সমালোচক	শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৫।	বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা	সুরেন্দ্রনাথ সেন
৩৬।	নব্যভারত	নরেশচন্দ্র মজুমদার
৩৭।	কামরূপের পুরাবৃত্ত	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮।	আসামপ্রদেশের প্রাচীন তথ্য	ঐ
৩৯।	অসমীয়া ও বাঙ্গালাভাষা	ঐ
৪০।	শিক্ষা	রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল্

কবিতা

১।	দিনাজপুর-পরিচয়	দেবেন্দ্রবিজয় চক্রবর্ত্তী
২।	অর্চ্চনা	রেবতীরমণ দত্ত
৩।	ভগবচ্চরণ স্তোত্রম্	হেমচন্দ্র সরকার
৪।	বিজ্ঞান গায়ত্রী	ভুবনমোহন দাসগুপ্ত
৫।	নাম-মাহাত্ম্য	জানকীনাথ গোস্বামী
৬।	সম্বর্দ্ধনা	রাধামোহন ঘোষ
৭।	বাণী-বন্দনা	জানকীনাথ গোস্বামী
৮।	সভ্যগণের প্রতি নিবেদন	গোবিন্দকেলি মুন্সী

প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে সম্মিলনে-সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত সাতটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়—

প্রথম প্রস্তাব।

স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপন-সম্বন্ধে বঙ্গগভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ১৯১০ সালের ১১নং সারকিউলার দ্বারা যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মিলন গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই সম্মিলন উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সমিতিগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে ঐ সকল সমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী লিখিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদকের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন এবং সম্পাদক ঐ কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিরাজ্-উস্-সলাতিন্ রচয়িতা গোলাম হোসেনের ইংরেজবাজারের অন্তর্গত চক কোরবানআলী পল্লীতে যে সমাধি আছে তদুপরি একখানি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হউক। মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি,এল্ মহাশয় উহার ব্যয় ও কর্ম্মভার গ্রহণে সম্মত হওয়ায় এই সম্মিলন তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বঙ্গভাষায় নানা মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা কাজি হায়াত মামুদের রঙ্গপুর-স্থিত পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামের দক্ষিণে ঝাড়বিশিলা গ্রামে অবস্থিত সমাধির উপরে একখানি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার জন্য রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক। ইহার

ব্যয় ও কর্ম্মভার ঐ সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় সভাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অদ্ভুতাচার্য্যের বাসস্থান-নির্ণয়ের ভার শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের উপরে ন্যস্ত করা গেল।

রস-কদম্বের গ্রন্থকার কবিবল্লভের বগুড়াস্থিত বাসস্থানে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক। বগুড়ার সাহিত্য-সমিতি ঐ স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও কর্ম্মভার গ্রহণ করায় এই সম্মিলন, সমিতির সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।

সম্মিলনের নিয়মাবলী।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালনের নিমিত্ত নিয়মাবলী প্রণীত হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত এ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের উপরে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ মধ্যে বিতরণপূর্ব্বক মতামত গ্রহণের ভার প্রদত্ত হইল। ঐ নিয়মাবলী সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে গ্রহণার্থ উপস্থাপিত করা হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব।

বগুড়া সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে পূর্ব্ব-সম্মিলনের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের রচিত শিশুপাঠ্য-সাহিত্য "বাঙ্গালার প্রতাপ" গ্রন্থের পরীক্ষার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে অর্পিত হইল—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" বিনয়কুমার সরকার

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনের পূর্ব্বে কাষ্ঠফলকে খোদিত বগুড়ায় কোনও কবির রচিত গ্রন্থের মুদ্রালিপির আদর্শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। তাহার আসল বর্ণে ছাপা কাষ্ঠফলকের প্রতিকৃতি মুদ্রণের জন্য উক্ত পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।

সপ্তম প্রস্তাব।

এই সম্মিলন দিনাজপুরবাসীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, দিনাজপুরে সাহিত্যালোচনার নিমিত্ত একটি সাহিত্য-সমিতির ও বিবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহপূর্ব্বক একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি,এল্ বেদান্তরত্ন মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা প্রদান করিলেন—

সভাপতি মহাশয় আমাকে উপদেশ দিতে বলিলেন। আমার এমন কোনই শক্তি নাই যদ্দ্বারা আমি উপদেশ দিতে পারি। বিশেষতঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সমক্ষে। তবে দিনাজপুরে আসিয়া যে শান্তি-সুখ ও প্রীতি লাভ করিয়াছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কেবল দিনাজপুরে নহে—সমগ্র বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জাতীয়-শক্তির উন্মেষকালে নানা বিষয়ে শক্তি স্ফুরিত হয়। আমাদিগকেও শুধু শিলালিপির আলোচনা না করিয়া ধন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই উৎসাহ দেখিয়া

আসিয়াছি। আজ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র একই ধরণে কার্য্য চলিয়াছে।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়াছিলাম—তখন সেখানে যে সাহিত্যের পূজা দর্শন করিয়াছিলাম—এক্ষণে তাহা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে এই পৃথক সাহিত্য-সম্মিলন। তদ্দর্শনে অনেকের ভয় হইতেছে যে, ইহা ভেদবুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু আমি আশা করি ভেদ-বুদ্ধি যেন আদৌ না আসে। এ বিষয়ে একটা গল্প মনে পড়িল—পুরাকালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া প্রাণ এবং দেহের অপর অপর যন্ত্রগুলির সঙ্গে একবার কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া দেহের সকল অংশই ক্রমে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, শরীর ধ্বংস হইল, প্রাণ আধারশূন্য হইয়া পড়িল। তখন সকল দেহাংশ-গুলি ও প্রাণ বুঝিতে সক্ষম হইল যে, স্ব স্ব স্থানে সকলেই শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যকারী। সকলেই এক দেহযন্ত্র পরিচালনপূর্ব্বক প্রাণকে ধারণ করি-তেছে। সাহিত্য-পরিষদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলিও সেইরূপ। বঙ্গ-সাহিত্য যদিও বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আলোচিত হইয়া আসিতেছিল—তথাপি ইহা অতি ক্ষুদ্র আকারে জন্মগ্রহণ করে। আমরা পুরাণে ও ব্রাহ্মণে এইরূপ একটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করি! মনু একটি ক্ষুদ্র মৎস্য প্রাপ্ত হন, তিনি সেইটিকে ক্ষুদ্র একটি চৌবাচ্চাতে রাখিয়া দিলেন—ক্রমে ক্রমে সেটি বড় হইল আর চৌবাচ্চায় ধরে না, তখন তিনি সেটিকে পুকুরে ছাড়িয়া দিলেন—ক্রমে নদীতে তারপর সাগরেও তাহার দেহ ধরে না! সাহিত্য-পরিষদও ঠিক তেমনি করিয়া আকারে বর্দ্ধিত হইতেছে। যখন ইহার জন্ম হয়, তখন ক্ষুদ্র পরিষদ-গৃহে ইহার স্থান হইয়াছিল, ক্রমে ধীরে ধীরে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—

কে বলিতে পারে ইহা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী না হইবে? মনু যেমন সেই মৎস্যের সাহায্যে প্রকাণ্ড প্রলয়-জলধি অতিক্রম করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি হয় তো এই পরিষদের সাহায্যেই দুর্ব্বার জাতীয়বিপ্লব অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব।

অনন্তর সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন যে—

সভাপতি আমায় বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন। যিনি বাল্যকাল হইতে আমাকে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, তিনি আজ আমাকে এই সভার মধ্যে অপ্রস্তুত করিলেন কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার এই যাত্রা—এই বিরাট সাহিত্য-অভিযান—একরূপ ভাবরাজ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা। বঙ্গ-সাহিত্যের যে গতির কথা দত্ত মহাশয় উল্লেখ করলেন তাহা সত্য—সত্য হ'তে সত্য—ধ্রুব। ইহার লক্ষ্য কোথায় কে জানে! জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে স্ব-শক্তির উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে—সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আ'জ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বাঁচিবার ও আত্মগরিমা গাহিবার একটা বিপুল চেষ্টা হইতেছে—সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাই জীবন-সঞ্চারিণী মূর্ত্তিতে সাহিত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! কে আ'জ এই সাহিত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে? ধর্ম্মই সাহিত্যের জীবন! বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই ধর্ম্ম ধারাপাতে আমাদের সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে, এখনও যে ইহার গতি কোন্ দিকে তাহা বঙ্গবাসীর কাছে বলিতে হইবে না। এই সাহিত্যে মাতৃনিষ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই—প্রাণশক্তি আজ স্ফূর্ত্তিতে নাচিয়া উঠিতেছে। এই দেশ ধর্ম্মের উপাসক; যদি সাহিত্যের পুষ্টি চাই—যদি জড়ের মধ্যে চেতনা দেখিতে ইচ্ছা করে—তবে পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য! তাহা হইলে মাতৃধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ

নিশ্চিত! কিন্তু কেহ যেন ভাবের ঘরে চুরি না করেন। যাহাতে এই আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য! যদি আমরা একনিষ্ঠ সাধক হই—আমাদের শক্তি এই মাতৃপূজায় নিযুক্ত করি—তবে নিশ্চয়ই সফলকাম হইব। কাপট্য-বর্জ্জন করিয়া—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া—চল আজ সভাপতি মহাশয় যে নবীন পথের সন্ধান দিয়াছেন—সেই পথে! সিদ্ধি নিশ্চিত!

অতঃপর "নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় নিম্নলিখিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন—

যিনি আজ আপনাদের সভাপতি—আমি তাঁহারই তল্পী বহন করিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলাম। আমি শুধু মুটের কাজ করিব এই বন্দোবস্ত ছিল—সুতরাং তিনি আমাকে বক্তৃতা করিতে বলেন কোন অধিকারে? আমি চিরকাল কলিকাতার সভ্যের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া থাকি সেই কাজই করিব। সাহিত্যের নানা বর্ণনা শুনিলাম কিন্তু সবই কি সুকুমার সাহিত্য? বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব যেমন ফুটবে তেমনি তারা মানুষ হবে।

"এবার নূতন ভাব পেয়েছি।
ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥"

এবার সভাপতির অভিভাষণে নূতন ভাব পেয়েছি। নিজের চেষ্টায় নিজেরই ছাঁচে মাকে গড়ে তু'লতে হবে। যাকে মা ব'লেছি তাকে এমন সাজে সাজাব যেন সকলেই তাকে বুঝতে পারে। তাহা হইলে জাতীয় ভাষার সার্থকতা। সাহিত্য বল, ভাষা বল, সবই মনের কথা। ভীষ্মের শরশয্যার কথা মনে পড়িল। সেই কোলাহল মুখরিত শরশয্যায় প'ড়ে ভীষ্ম—পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে দুর্য্যোধনের কাছে জল চাহিলেন। দুর্য্যোধন স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে জল এনে দিলেন। ভীষ্ম হেসে বল্লেন এখন কি আমার ঐ জলে

পিপাসা নিবৃত্তি হইবে। তখন অৰ্জ্জুনকে ডাকালেন, তিনি এসে গাণ্ডীব দিয়ে পাতাল ভেদ ক’রে ভোগবতী আকর্ষণ করে তার জল আন্‌লেন। তাতেই ভীষ্মের পিপাসা শান্তি হল! আজ সমাজের শরীর এইরূপ শত শত শরে বিদ্ধ। কে এমন অৰ্জ্জুন আছে সমাজের সব দুর্নীতি সব স্তর ভাবের বাণে ভেদ ক’রে জাতীয় ভাবের ভোগবতী কুল কুল স্বরে প্রবাহিতা করিবে। উহার বিন্দুমাত্র দানে সব অভাব পূর্ণ করাইবে। আমরা গৃহে-গৃহে রাজরাজেশ্বর ছিলাম, আজ অনাথ হ’য়েছি। সত্য সত্যই আজ আমরা ভিখারী হ’য়েছি কিন্তু ভিক্ষা করাও হবে তার কাছে যে বিদুরের মত কৃষ্ণগত প্রাণ। আমরা Wordsworth Swinborne এর Parallel passage সদৃশ কবিতা খুঁজতে ভালবাসি কেন? আমাদের দাশুরায়ের পাঁচালী যে আমাদের প্রাণের ভাব। সেটিকে অনাদর করি কেন? তার সেবা-যত্নের মধ্যে স্নেহের ধারা। আজ যে আদর পাচ্ছি তার মধ্যে যে কত সুধার স্রোত তা কি ক’রে মুখে ব’লবো? এই আদরই লঙ্কাকেও মিষ্টি ক’রে দিচ্ছে। এখানে আর আপনি আমি নাই। এমনি স্নেহের টান যেন সব এক ক’রে দিচ্ছে। হীরেন বাবুর কথাই ঠিক। এই পরিষদই ভারতের ভাবসমুদ্র পার করিয়া দিবে। আমরা যাঁকে অগ্রজ ব’লে ভক্তি করি তাঁর কথাগুলি যেন মনে গাঁথা থাকে। এস ভাই সেইখানে ডুব দেই। অক্ষয় যেমন প্রস্তর তাম্রশাসন তুলছেন আমরাও যদি তা তুলি তাহাতেও কোন দোষের কথা নাই। সাহিত্য-দর্শন যা পাই তাই আমাদের ভাল। এস, এই ভাবসাগরে ডুব দেও। এই ভাব-সাগরে যা থাকে তাই তোল। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের সহিত ভাবের ঘরে যেন চুরি না করি। যাঁর কৃপায় আমরা স্নেহ-ধারা পাচ্ছি এস তাঁকে চিনিতে চেষ্টা করি। তা হ’লে আমাদের নাচাও সার্থক হবে, জীবনও সাথক হবে।

ইহার পরে শ্রীযুক্ত রামতারণ ভট্টাচার্য্য (দিনাজপুরের চতুষ্পাঠীর জনৈক ছাত্র) সংস্কৃত-ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করেন।

অক্ষয় বাবু বলিলেন সভার শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রথা আছে, আমি সে জন্য একজন যোগ্যতম মুখপাত্র স্থির করেছি। তিনি আমাদের সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী সভাপতি এবং রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়। আপনারা তাঁহাকে এই সভাস্থলে দেখিয়া নিশ্চিতই আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন—

আমি জানি এ প্রস্তাব সকলেই গ্রহণ ক'রবেন। সভাপতি মহাশয় শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমাদের সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এই প্রসঙ্গে "ভারতবর্ষ" পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন—

আজ কয়দিন থেকেই জলধরের যেরূপ বর্ষণ হ'য়েছে তাতে এখন যদি আমার আবার আবির্ভাব ঘটে তবে সকলেই বিরক্ত হবেন। আমাকে যদি সকলে ধরে প্রহারও দেন তবুও আমার কিছু ব'লতে থাকবে না। কারণ হাইকোর্টের জজও সামনে এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটও সামনে। আমি যখন ছোট-বেলা ভূগোল পড়তেম, তখন পড়েছিলেম যে বাঙ্গালা দেশে নানান জেলা আছে এখন দেখছি সব এক। পূর্ব্ব-উত্তর কিছুই ভেদ নাই। সভাপতি তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারি না। কর্ত্তব্য প্রতিপালন করার জন্য যদি ধন্যবাদ দিতে হয় তবে বাড়ীতে গিয়া একাদশীর উপবাস বা কালীপূজা

করার জন্য পিসীমা বা পুরোহিত ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে মামুলী প্রথা অনুসারে সমাগতগণের পক্ষ হইতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন—আমাকে শেষের জন্যই রেখে দিয়েছেন। আমরা নানা দেশ-বিদেশ থেকে বহু কষ্ট নিয়ে এসেছি। আজ ছয় বৎসর এই দুটো সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য সাহিত্যিকগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ এবং মাতৃভাষায় কথা বলিবার অবকাশ হচ্ছে। এতদিন সাহিত্য-সম্মিলন ক'রে আসছি কিন্তু এরূপভাবে কর্ম্মপরিচালনা আর কোন স্থানে দেখি নাই। আমরা আপনাদিগকে এইরূপ কষ্ট দিয়াই চলিলাম। আবার একবৎসর পরে কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। আমরা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটও কৃতজ্ঞ। তাঁহারা একভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের মিলনের সাহায্য করিয়াছেন। দিনাজপুরের ড্রামেটিক এসোসিয়েসনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে সভাধিবেশনের জন্য তাঁহাদের গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ রায় বি, এল্ স্বেচ্ছাসেবক-অধিনায়ক মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকগণের পক্ষ হইতে অভ্যাগতগণের নিকটে নানা ত্রুটিনিবন্ধন বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন পাবনায় সঙ্ঘটনার্থ সাদরনিমন্ত্রণ-জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতির শেষ মন্তব্য

আমি যে সব কথা লিখিয়াছি, সে গুলি সকলের মতের সঙ্গে মিলিবে না, কিন্তু আমি যা বলেছি তা সত্যজ্ঞানেই ব'লেছি। আমার বিশ্বাস নয়

যে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত। মানুষ ঘুমোয় কিন্তু হৃদয় ঘুমোয় না। আমি প্রস্তাব করছি যে, আগামী বৎসর আপনারা সকলে পাবনায় উপস্থিত হবেন—সম্মিলন পাবনাতেই হবে।

অতঃপর ঢাকা উয়ারীনিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক "এই কি সেই আর্য্যস্থান, আর্য্যসন্তান" ইত্যাদি কাঙ্গাল হরিনাথ-রচিত গানটি গীত হইল।

তারপর সভাপতির আদেশে বেলা ১২ টার সময় সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক এই সময়ে সভাপতিসহ সমাগত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের প্রভাচিত্র গৃহীত হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভ্যাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনপূর্ব্বক বহু ত্রুটির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন—আপনাদের নিকটে আমার কতকগুলি প্রার্থনা ছিল কিন্তু বলবার সময় নাই। এবার দিনাজ-পুরে এসে নানা সাহিত্যিকের নিকটে নানা উপদেশ পাওয়া গেল্ল। এ সকলের মূল হচ্ছেন আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর। আমি প্রতিনিধিগণের পক্ষ হ'তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি আর স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের জন্য আয়াস স্বীকার ক'রেছেন এজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান

বর্ত্তমানকালে বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দেখা যায় যে, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী কিছু অধিক মাত্রায় সুকুমার সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চ্চা করিয়াছে; এখন কিছুদিন কাব্য, উপন্যাস ও সঙ্গীত-চর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্পের চর্চ্চা করিলেই দেশের ও সমাজের কল্যাণ। সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনেকেই যে সমাজনেতৃগণের এই কথায় অল্পাধিক পরিমাণে সায় দিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিল্প ও সাহিত্য এখন ক্রমশঃই এক প্রকার সৌখীন চিত্ত-বিলাসের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের ও ব্যবহারিক জীবনের সহিত সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে। যে কারণেই হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিপত্তি যে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে এই যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনার যোগ্য। কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশ নয়, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—জাতীয়-জীবনে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান আছে কি না ও যদি

থাকে সে কোথায়? এটি কেবল বাঙ্গালী জীবনের সমস্যা নয়, এটি বর্ত্তমান যুগের সমস্যা। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যেখানে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সেই ইউরোপে এই বিশেষ সমস্যাটি বেশ স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, একদিকে সাধারণ লোকের মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার-প্রতিপত্তি খুবই কম ও সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ জাতীয়-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে একরূপ অসমর্থ; অন্যদিকে শিল্পিগণ নিজেদের বৃত্তি-সম্বন্ধে অতি উচ্চধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজনেতা, সমাজ-শিক্ষক ও বর্ত্তমানকালোপযোগী যুগধর্ম্মের পুরোহিত বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে অবস্থাটা অস্বাভাবিক। এতদিন ধরিয়া সভ্য মানব-সমাজমাত্রই যে ভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সভ্য মানব-সমাজমাত্রেরই শিল্প ও সাহিত্য প্রত্যাহিক জীবনের নিত্য সহচর ছিল।

সামাজিক জীবনের উপর কাব্যচিত্র, সঙ্গীতের প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করিত। সামাজিক-জীবনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শিল্প ও সাহিত্যই প্রধান সহায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস্, মধ্য যুগের ইউরোপ, এবং বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে ভাস্কর্য্যশিল্প, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত আদর্শ পৌরচরিত্র গঠনের প্রধান উপাদানস্বরূপ বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক G. Lowes Dickinson তাঁহার প্রণীত Greek View of Life নামক গ্রন্থে গ্রীকদিগের সঙ্গীত-চর্চ্চা-

প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীকেরা চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। বিভিন্ন প্রকার সুর ও mode অর্থাৎ রাগ-রাগিণী শ্রোতার মনে কিরূপ বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদ্রেক করে ও শ্রোতার চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাঁহারা সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আদর্শ পৌরচরিত্র গঠন করিতে হইলে পৌরগণকে সুসঙ্গত ও বিধিবদ্ধ সঙ্গীত শুনাইতে হইবে; কারণ, উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীতের দ্বারা কেবল উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রেরই সৃষ্টি হয় এবং রাজ্য-মধ্যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়। ডিকিন্সন সাহেব বলেন যে, আধুনিক ইউরোপীয়ের নিকট প্রাচীন গ্রীক্-জীবনের এই দিকটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হয়; কারণ, বর্ত্তমানকালে ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে যে সঙ্গীতের অধিকমাত্রায় প্রচলন, সেই Music Hall ও Orchestra সঙ্গীত অধিকাংশ লোকের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকার বিলাসরূপেই পরিগণিত হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাদির দ্বারাই একদিকে খৃষ্টধর্ম্ম, অন্যদিকে বীরধর্ম্ম বা Chivalry সমাজের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

সাধু মহাপুরুষ অবতারদিগের লীলাচিত্র-শোভিত গীর্জ্জাঘর, ধর্ম্মকথা-সম্বলিত Mystery ও Miracle নাট্যাভিনয়, সাধু-সন্তানদিগের জীবনী, বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাবলী ও খৃষ্টলীলা-সম্বলিত কাব্য-সমূহের পাঠ, আবৃত্তি ও কীর্ত্তন, ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থার নানা পর্ব্ব ও উৎসব—এই সকলের দ্বারা ইউরোপের মধ্যযুগে সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম যে জীবনী-শক্তি লাভ করিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই। অন্যদিকে সেই যুদ্ধ-বিগ্রহ অশান্তির যুগে যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে নানা Romance কাব্যের মধ্য দিয়া আর একটি

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় তাহার নাম হয় Chivalry বা বীরধর্ম্ম। যুদ্ধে ন্যায়ধর্ম্ম-পালন, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের উদ্ধার, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা—এইরূপ কয়েকটি আদর্শ লইয়া এই রোমান্স-সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সকল আদর্শ কেবল কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সে কালের যোদ্ধৃ-সমাজের জীবনেও এই আদর্শগুলি অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে অতি প্রাচীন-কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত শিল্প ও সাহিত্য সামাজিক জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঠ, আবৃত্তি, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শ ই আমাদের সমাজে গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ-স্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। মন্দিরাদির গাত্রে দেব-দেবীর ও অবতারের লীলা-চিত্র ও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত-কাহিনী এবং বৌদ্ধ-বিহারাদিতে বুদ্ধদেবের লীলা-চিত্র—ভারত-সমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শগুলিকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জীবন্ত করিয়া রাখিত। আদর্শ-পুত্র, আদর্শ-পত্নী, আদর্শ-ভ্রাতা, আদর্শ-পরিবার, আদর্শ-রাজা, আদর্শ-বণিক্, আদর্শ-ক্ষত্রিয়, আদর্শ-গৃহী, আদর্শ-ত্যাগী ও ভক্ত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত আদর্শগুলিই সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজদরবারে কবি, শিল্পী ও পুরাণপাঠক ও সঙ্গীতাচার্য্যদিগের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিতেছেন তন্মধ্যে অমাত্য-সভাগঠন-প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, রাজার অমাত্যসভায়

ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ও শূদ্র অমাত্যের পার্শ্বে একজন করিয়া সূত বা পুরাণপাঠককে স্থান দিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সভ্য-সমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রগঠনে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে; এবং সমাজ-নেতৃগণ এই গুলিকে সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিচালন-কার্য্যে প্রধান সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানেই প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই খানেই ইহাদিগকে আর সেরূপ সহায় মনে করা হয় না। যাঁহারা সমাজের মধ্যে সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা বিশেষভাবে সাহিত্যরস-চর্চ্চায় নিযুক্ত নহেন, এক কথায় সমাজের বার আনা লোকের কাছে সাহিত্য ও শিল্পের এই যে প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি! এরূপ বলা যায় না যে, সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগে সপ্তাহে সপ্তাহে কত শত কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য-সম্ভার বহন করিয়া গ্রন্থপ্রকাশকগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভাবান্, দৈবশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার ও শিল্পীর যে অসদ্ভাব আছে তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপের গেটে, ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, টেনিসন, শেলি, ব্রাউনিং, বারণ-জোন্স, রোদাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ যে কোনও যুগের সাহিত্য ও শিল্প-দরবারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রসঙ্গে যাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রসারহীনতার মোটামুটি এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষা

প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কি ভাবে, কি ভাষায় ইংরাজী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং তাঁহাদের এই 'ইংরাজী গন্ধি' সাহিত্য সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট হয় একেবারে দুর্ব্বোধ্য, অথবা বোধগম্য হইলেও তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না। কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে। কারণ, শুধু যে বাঙ্গালাদেশেই সাহিত্য ও শিল্প সামাজিক হিসাবে পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়াছে, তাহা নহে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকেও এই ব্যাধি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুতবাং ব্যাধির মূল নিরূপণ করিতে হইলে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর যে বিশেষ ধর্ম্ম তাহার মধ্যেই ইহার সন্ধান করিতে হইবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজ-সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এটি বিশেষভাবে ব্যবসাদারীর যুগ। এ পর্য্যন্ত যে সকল নানা বিচিত্র মানবসম্বন্ধ ব্যবহারিক জীবনের শুষ্কতা অপহরণ করিয়া নানা অসুবিধা সত্বেও সামাজিক-জীবনে রস-সঞ্চার করিত, বর্ত্তমানকালে সেই সকল সম্বন্ধ ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে, এবং আইন আদালত, চুক্তি ও ব্যবসাদারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। রাজার সহিত প্রজা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, প্রভুর সহিত ভৃত্য, বণিকের সহিত গৃহস্থ, স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়, গ্রামবাসীর সহিত গ্রামবাসী, এমন কি, এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এখন আর সেরূপ পরস্পর আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, ক্রমশঃ কেবল চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। বৈষয়িক সম্বন্ধমাত্রই এখন পূরাপূরি বৈষয়িক, তাহার সহিত ধর্ম্ম বা অন্য কোনও প্রকার স্বাভাবিক ভাব-বন্ধনের সংশ্রব নাই। কাহারও সম্বন্ধে

কাহারও দায়িত্ববোধ নাই, সমাজের ব্যক্তিমাত্রই এখন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যে দায়িত্ব আইন-আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে দায়িত্ব ভিন্ন অন্য প্রকার দায়িত্ব এখন আর সেরূপ স্বীকৃত হয় না। এই বাঙ্গালা-দেশে প্রাচীন সমাজে দেখা যায় যে, সরকারের বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা ব্যতিরেকেও বৃক্ষ-জলাশয়-দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পাঠশালা-চতুষ্পাঠী-পরিচালন, অন্নসত্র, জলসত্র-স্থাপন, দরিদ্র আতুরদিগের ভরণপোষণ, এমন কি অক্ষম বা ব্যাধিগ্রস্ত গো-পশ্বাদির চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নানা অনুষ্ঠান অতি সুচারুরূপে ও স্বাভাবিক-ভাবে সম্পন্ন হইত। এখন আইন-আদালত সমেত সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না হইলে সামাজিক কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। একটা ছোট কথা দিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ভুক্তভোগী যে, এই সভ্যতার যুগে সাধারণ লোকের পক্ষে উপযুক্ত মূল্য দিয়াও আহার্য্যই হউক আর পরিধেয়ই হউক, খাঁটি বা আসল দ্রব্য পাওয়া ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অথচ এই অভি-যোগটি সম্পূর্ণ আধুনিক। মিউনিসিপালিটীর আইনের কোনই কড়াকড়ি ছিল না, অথচ প্রাচীন সমাজে খাঁটী দ্রব্যের অভাব ঘটিত না। কারণ সমাজের মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের সামাজিক ধর্ম্মবোধ জাগ্রত ছিল। বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই ধর্ম্মবোধ বা ভাব-প্রবণতা সমান ভাবেই কাজ করিত। বণিক কখনও নিজকে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট, সকল সম্বন্ধমুক্ত, স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ভাবিতে পারিতেন না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, এ কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু সমাজের মধ্যে যে সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের সেই জীবন্ত-জাগ্রত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সমাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন অপেক্ষা পালনই তখন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। আমরা এই ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যের যুগে এই সমাজানুগত্যকে দাসত্ব বলিতে শিখিয়াছি এবং নানা প্রকার আন্দোলন ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজের নানা বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া, মজ্জাগত সমাজবোধের যে সংস্কার এখনও ক্ষীণভাবে লোকের মনে জাগিয়া আছে তাহা নানা যুক্তি ও প্রলোভনের দ্বারা উৎপাটিত করিয়া সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সভ্য মানব-সমাজ ক্রমশঃ যে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সমাজ বলিলে আমরা এদেশে যাহা বুঝি, সে বস্তুর কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রশক্তিই এখন যথাসম্ভব সমাজ-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতেছে।

শক্তি রাষ্ট্রেরই হউক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহার সহিত ভাবের কোন সংস্রব নাই। যেখানে কেবল শক্তি দ্বারা কাজ চালান হয়, সেখানে ভাব জাগাইয়া রাখার কোন অবশ্যকতা অনুভূত হয় না। সকলেই জানেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ষ্টেট্ অর্থাৎ রাজ-সরকারকে দরিদ্রের ভরণপোষণের ভার লইতে হইয়াছে। তজ্জন্য সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দরিদ্রের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণা ও সমবেদনার ভাব তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক গৃহস্থকে রাজ-শক্তির তাড়নে এই দরিদ্র-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে যে পরিমাণে এই দরিদ্রভরণের দায়িত্ব গৃহস্থের স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়া রাজ-শক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে গৃহস্থের অন্তঃকরণে দুঃস্থ লোকের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণার ভাব ছিল, তাহা চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ সামাজিক সর্ব্ববিধ কার্য্যের

মধ্যে যে পরিমাণে যন্ত্র-শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে পরিমাণে কলের নিয়মে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক-জীবনে ভাব বা ধর্ম্মবোধের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অথচ এই ভাব লইয়াই সাহিত্য ও শিল্পের কারবার। বাস্তব-জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠা, কাজের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠা, ইহাই শিল্প ও সাহিত্যের কার্য্য। সুতরাং যে সমাজে ভাবের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ও প্রসার যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে সাহিত্য ও শিল্প সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ স্বরূপ বিবেচিত হইত এখন তাহা সামাজিক-হিসাবে অনাবশ্যক অথবা সৌখীনতা ও বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই যন্ত্রশক্তির যুগে মানুষের প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনের হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের কোন উপযোগিতা আছে কিনা? যদি কলেই সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে রাজশক্তি-পরিচালিত আইনের কলই হউক, আর বাষ্পশক্তি-পরিচালিত কারখানার কলই হউক—কলেই যদি সব কাজ সুনিয়মে ও সুব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবপ্রবণতা ও ধর্ম্মবোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য ও শিল্পকে এখন সমাজের কার্য্য হইতে অবসর দিলে ক্ষতি কি? তাহাতে সমাজেরও ক্ষতি নাই, বরং শিল্প ও সাহিত্য স্বাধীনতালাভ করিয়া অভিনবভাবে নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে শিল্প-সাহিত্যের কোন ক্ষতি আছে কিনা, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন দেখা যাউক, ইহাতে সমাজের কোনও ক্ষতি আছে কিনা। ইতঃপূর্ব্বে আধুনিক সমাজের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, রাজশক্তি যে পরিমাণে সামাজিক

কার্য্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণে সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভাব-দারিদ্র্য ও ধর্ম্মহীনতা কখনই কোনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। ভাব লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবের অসদ্ভাবে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কোথায় ? একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন (এবং পাশ্চাত্য-সভ্য-সমাজে ইহা শতাধিক বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে) যে, কি সমাজ ব্যবস্থায় কি জড়জগতে যন্ত্রশক্তি যতই কার্য্যকুশল ও সুনিয়ন্ত্রিত হউক, তাহা কখনই সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতার স্থান পূরণ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা ও ভোগবাসনাকে ধর্ম্মের বন্ধন—ভাবের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথেচ্ছভাবে একবার কাজ করিতে দিলে তাহাকে আবার আইনের কল দিয়া বাঁধিয়া ব্যবস্থা রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহা পাশ্চাত্যজগতের সমাজনেতা ও দর্শকবৃন্দ এখন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ধনীর সহিত নির্ধনের দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীয় দ্বন্দ্ব, ক্রেতার সহিত বিক্রেতার দ্বন্দ্ব, দেশের সহিত দেশের দ্বন্দ্ব—পাশ্চাত্য-জগতের এই দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বের অগ্নি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজব্যবস্থাপকদিগের নিকট সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে। এদিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবগ্রন্থি শিথিল হওয়ায় পরিবার ও সমাজের অনেক কার্য্যের ভার এখন ষ্টেটকে লইতে হইয়াছে। বয়ঃস্থ ও অক্ষম আত্মীয়-কুটুম্বের এমন কি পিতামাতার প্রতি যে স্বাভাবিক ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব তাহা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাজসরকার হইতে Old Age Pensions Act পাশ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। শ্রমজীবী মজুরের সহিত কারখানার মালিকের ঠিকাচুক্তির বন্ধন ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাণিজ্য-ব্যাপারের

সামান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী কাজ না পাইয়া জীবিকাবিহীন হইয়া পড়ে। শেষে ষ্টেট হইতে Insurance আইন পাশ করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়, ষ্টেট হইতে Minimum Wages Act পাশ করিয়া ন্যায্য মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। এমন কি যে দাম্পত্য-সম্বন্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি, তাহাও শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্য-জগতের নারী-সমাজ এখন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক ভোটের অধিকার এমন কি, মাতৃত্ব ও সন্তান-পালন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজের ছোট-বড় যাবতীয় কার্য্য ক্রমশঃ ষ্টেটের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায়, ব্যবস্থাপকদিগের দায়িত্ব-ভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে; নূতন নূতন বিপদ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আসিয়া সমাজকে অনবরত শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে এবং আইনের পর আইন পাশ করিয়া সেই সকল সমস্যার ক্ষণিক সমাধান করা হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেকে এই নূতন নূতন আইন পাশ করাকেই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আইন-যন্ত্রের এই অতিরিক্ত চালন, সমাজ-শরীরে এই অহরহঃ ঔষধপ্রয়োগ ও অস্ত্রচালনা সমাজের ব্যাধিরই পরিচয়, উন্নতির নহে। পাশ্চাত্য-মনীষিগণের মধ্যে অনেকেই একথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমাজ-শরীরে পুনরায় ভাবরস সঞ্চার করিতে হইবে।

সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখা গেল যে, শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধচ্ছেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে। এখন দেখা

যাউক, এই সম্পর্কচ্ছেদে সাহিত্যের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে কি না।

প্রশ্নটি গুরুতর এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে ইহার সম্যক্ ও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য ও শিল্পের যে বিশেষ প্রকৃতি, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের সহিত তুলনায় তাহার আলোচনা করিলে এই লাভক্ষতি-হিসাবের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, ভাবরস ও সৌন্দর্য্যবোধ শিল্প-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা এখন সমাজ অর্থাৎ সমষ্টির জীবন হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহিত্য ও শিল্প এখন তাই সমষ্টিকে ছাড়িয়া সমাজকে ছাড়িয়া একএকটি স্বতন্ত্র মানবকে অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, যে ভাবপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্যবোধ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; তাহা যদিও সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহা অনেক স্বতন্ত্র মানুষের অন্তঃকরণে জাগিয়া আছে। তাই আজকাল ব্যষ্টিভাবে এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনশ্চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে যে বিশেষ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের চরিত্র জীবনের নানা ঘটনার উপর ঘাত-প্রতিঘাতে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়, সেই বিচিত্র মানবকাহিনীই আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের উপকরণ। সাহিত্যের ইতিহাস বর্ত্তমান যুগকে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত-ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ lyric বা গীতিকাব্য ও ব্যক্তিগত চরিত্র-বিশ্লেষপূর্ণ উপন্যাসের যুগ বলা যাইতে পারে। কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাশিল্প এখন সমাজের সিংহাসন হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিভৃত অন্তরের কোণে আশ্রয় লইয়া চারিদিকের শুষ্কতা ও নীরসতার মধ্যেও কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছে। কবি, শিল্পী বা কাব্যরসিক কোনরূপে সাংসারিক

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে একটি কাল্পনিক সৌন্দর্য্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়া কাব্য ও কলাশিল্পের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক G. K. Chesterton কীটস্ প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের কবিগণের উল্লেখ করিয়া একস্থলে বলিয়াছেন—"It was an age of inspired office boys" অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে এটা দিব্যোন্মাদগ্রস্ত আফিসের কেরাণীর যুগ। অর্থাৎ কবি ও শিল্পী এখন সমস্ত দিন ধরিয়া আধুনিক আফিসের শুষ্কতার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া আসিয়া সন্ধ্যাকালে যখন দ্বারে অর্গল দিয়া বসেন, তখন তাঁহার কল্পনার সাহায্যে এক দিব্য জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাব্য বা শিল্পচর্চ্চা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় যে বিশেষ ছাঁচের সাহিত্য বা শিল্পের সৃষ্টি হয় তাহাকে "ব্যক্তিগত সাহিত্য বা শিল্প" এবং প্রাচীন ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যকে "সামাজিক শিল্প বা সাহিত্য" এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিগত শিল্প-সাহিত্য ও সামাজিক শিল্প-সাহিত্যে বিভিন্ন দিক্ হইতে এই দুই ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের তুলনা করিলে ইহাদিগের বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে। প্রথমে ভাবের দিক দিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যচিত্রাদি রচিত হইত, তাহা সমাজের সাধারণ জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীনকালের সামাজিক আদর্শের সহিত এই সকল ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেকালে সমাজের ক্ষেত্র হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বড় বড় ভাব ও আদর্শ উদ্ভূত হইত, শিল্প ও সাহিত্য তাহারই সেবায় নিযুক্ত ছিল। লোক-সমষ্টির হৃদয়ে সেই সকল ভাব সহজেই সহানুভূতি লাভ করিত এবং এই জন্যই তাহাদের প্রেরণাশক্তি ও ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সমধিক প্রবল ছিল।

সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত বলিয়া শিল্পিগণের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে শিল্পী স্বীয় রচনা-মধ্যে যে সকল ভাবের অবতারণা করেন, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত না হইয়া পারে না। তাহা সাধারণতঃ ভাবুক হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের কথা, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সমভাবাপন্ন ভাবুক ও কাব্য-রসিক ব্যক্তির চিত্তেই তাহা প্রসারলাভ করিতে পারে। এমন অবস্থায় শিল্প-রচনার মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়ে। শিল্পীর মনে এখন সর্ব্বদাই এই সন্দেহ জাগিয়া থাকে যে, হয় ত তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবগুলি অধিকাংশ লোকের নিকট সহানুভূতি পাইবে না। সেই জন্য তাঁহাদের রচনায় হয় ভাবপ্রকাশের জটিলতা, না হয় একটা বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। সহজ সরল ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এখন তাই অধিকাংশ শিল্পীর অনায়ত্ত। প্রাচীন সাহিত্যে গভীর ও নিবিড় ভাবের অভাবই যে এই সরলতার কারণ তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-মহাজনদিগের পদাবলী, পারস্যদেশের সুফি, কাব্য ও সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্য, ইউরোপের মধ্যযুগের ম্যাডোন্না চিত্রগুলি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষা যে ন্যূন তাহা কেহই বলিবেন না। তথাপি এই সকল প্রাচীন কাব্য-চিত্রাদি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ অধিগম্য ছিল এবং আপামর সাধারণের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। আধুনিক কবি ও শিল্পিদিগের রচনা কিন্তু কখনও অধ্যয়ন-কক্ষ ও আর্ট-গ্যালারির বাহিরে জীবনের ক্ষেত্রে নামিতে পারে না। ইহার একটা কারণ এই যে, প্রাচীনকালে ভাব-সাধনা বলিয়া একটা বস্তু ছিল, এখন তাহার একান্ত অসদ্ভাব। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ Fra Angelicoর রচনা কেবল ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র নহে। তাঁহারা যে কয়টি ভাব অবলম্বন করিয়া শিল্প রচনা করিতেন,

তাহা সংখ্যায় অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ভাব তাঁহারা জীবন-ব্যাপী সাধনায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন একদিকে শিল্পী, তেমনি অপরদিকে ভাবসাধক। সেইজন্য তাঁহাদের ভাব বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী হইত। তাঁহারা নিজেদের সাধনার ধন শিল্পের সাহায্যে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষপরম্পরাক্রমে একই ভাবের সাধনার দ্বারা যে সঞ্চিত শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা কেবল বাস্তব-সংসারে অতীন্দ্রিয় ভাব-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ। শিল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ্ লেথাবী (W. R. Lethaby) তাঁহার প্রণীত Architecture নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, শিল্প কেবল ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাশক্তি হইতে উদ্ভূত না হইয়া যদি সহস্র শিল্পীর ফলস্বরূপ হয়, তাহাই মহান শিল্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারে (The art which is not one man deep, but a thonsand men deep.) আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে যে সকল ভাবের অবতারণা হয়, তাহা সংখ্যায় অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট। ব্যক্তিবিশেষের মনে বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিচিত্র ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা সে যতই সূক্ষ্ম ও অসাধারণ হউক না, সমস্তই এখন শিল্পের বিষয়ীভূত। ভাব এখন সাধারণ বস্তু নয়, সেইজন্য প্রত্যহ অভিনব ভাব ও অভিনব মানসিক অবস্থার চিত্রণেই শিল্পী নিযুক্ত। নূতনত্বের সন্ধান পুরাতন ভাবের সাধনের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, এই সকল সাময়িক ও অস্থায়ীভাব শিল্পী বা শিল্পামোদীর জীবনে সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। শিল্প সাহিত্য এখন মানুষের মনোরাজ্যের প্রচ্ছন্ন কোণে নূতন নূতন প্রদেশ আবিষ্কার-কার্য্যে নিয়োজিত, এখনও কোথাও ঘরবাড়ী বাঁধিবার কোন উদ্যম নাই। ফলে আধুনিক শিল্প বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে কিন্তু ভাবের

গভীরতা ও বস্তুতন্ত্রতা-হিসাবে প্রাচীন শিল্পের তুলনায় দীন ও শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে।

ভাবের সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পের বিষয়-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন শিল্পের বক্তব্য-বিষয় ও আখ্যানাবলীও সংখ্যায় অল্প ও নির্দ্দিষ্ট। পুরুষপরম্পরা ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত একই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী শিল্প রচনা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এক মহাভারতের আখ্যানবস্তু লইয়া, কাশীরামদাস ব্যতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি বহু বাঙ্গালীকবি বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বেহুলার উপাখ্যান লইয়া কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস প্রভৃতি কবি, কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যান অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অবলম্বন করিয়া বহুতর বৈষ্ণবকবি ও মহাজন আপন আপন কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যযুগেও সেইরূপ দেখা যায় যে, আর্থার, লান্সলট, পার্সিভ্যাল, আলেকজন্দার, সার্লিমেন প্রভৃতি বীরগণের কাহিনী লইয়াই ইউরোপের বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বহুতর Romance কাব্য গদ্যে-পদ্যে রচিত হইয়াছিল। সে কালের কবি ও শিল্পিগণ আখ্যানবস্তুর মৌলিকতা লইয়া চিন্তা করিতেন না। পুরাতন ও লোক-প্রচলিত আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কোনও আখ্যানবস্তু কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না—সেগুলি সমাজেরই সম্পত্তি। এইরূপ অবস্থায় একটি সুবিধা এই ছিল যে, সমাজে কাব্য বা শিল্পের আখ্যানবস্তু সুপরিচিত থাকায় অতি সহজেই শিল্পীর বক্তব্য জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ

করিতে পারিত। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃসমাজের একএকটি ভাবতন্ত্রীতে পুনঃ-পুনঃ আঘাত পড়ায় সমাজে কতকগুলি বিশেষভাবের অনুশীলন হইত। যখন ভাবরসাস্বাদ অপেক্ষা কৌতূহলপরিতৃপ্তি ও মানসিক উত্তেজনাই শিল্পচর্চ্চার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল, সেই লঘুচিত্ততার যুগেই শিল্পিগণকে নিত্য নূতন আখ্যানবস্তু-রচনার জন্য নানা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইল।

আখ্যানবস্তু ও ভাব-সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, রচনা-ভঙ্গী ও অলঙ্কার-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে। এখানেও দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ রচনা-ভঙ্গী শিল্পিসমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাঙ্গালী কবির অনুকরণপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সেই অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"কেবল বড় বড় কাব্যে নহে কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণ-বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কাবকে প্রশংসা করিবার পথ নাই, কোন্ কবি সেই ভাবের আদি-প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও খুল্লনার "বারমাস্যা" পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতীর "বারমাস্যা," পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বারমাস্যা, সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর প্রণীত "রাধার বারমাস্যা" সেক জালাল প্রণীত "সখীর বারমাস্যা" এইরূপ রাশি রাশি বারমাস্যার সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পথে-ঘাটে সন্ধান লাভ করিয়াছি। বিদ্যাপতির—

"না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে।
মরিলে রাখিও বাঁধি তমালেরি ডালে॥

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥"

এ কবিতাটির ভাব রাধামোহন ঠাকুর "এ সখি কর তহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃততনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর॥" যদুনন্দন দাস—"উত্তরকালে এক করিহ সহায়; এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিবা বাঁধিয়া॥" ইত্যাদি পদে এবং এতদ্ব্যতীত নরহরি, কৃষ্ণকমল, কবিশেখর প্রভৃতি বহু কবি স্বরচিত পদে নকল করিয়াছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের এই বিশেষত্ব টুকুকে বিশেষভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন ও ইহাকে বাঙ্গালীসুলভ অনুকরণপ্রিয়তা বা পুচ্ছগ্রাহিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটি বাঙ্গালী-সাহিত্যের বা বাঙ্গালী-চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ নহে, ইহা প্রাচীন সামাজিক শিল্পমাত্রেরই লক্ষণ। মধ্যযুগের ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মাণ সাহিত্যেও এই ভাবসাদৃশ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-প্রয়োগেও এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাহিত্যের অবনতির যুগে এই ভাবভঙ্গী ও অলঙ্কার-সাদৃশ্য বিকারপ্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জীবতা ও নীরসতার সৃষ্টি করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সাহিত্যের জীবন্ত অবস্থায় এই সকল পরম্পরাগত ভাব ও উপমা নানাপ্রকার অপ্রত্যক্ষভাব ও দৃশ্যের ব্যঞ্জনা দ্বারা নানাপ্রকার স্মৃতির উদ্রেক করাইয়া দিয়া, জনসাধারণের মনে যে ঘনরসের সৃষ্টি করে, তাহা অপূর্ব্ব। বিশেষ করিয়া চিত্র বা ভাস্কর্য্য-শিল্পে এই বাঁধা রচনা-পদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে, জনসাধারণের নিকট শিল্পিগণের বক্তব্য বিষয় ইহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। শিল্পব্যাখ্যা ও শিল্প-সমালোচক বলিয়া এক শ্রেণী মধ্যস্থের আবশ্যকতা

থাকে না। আজকাল শিল্পের রাজ্যে নানা অভিনব প্রণালী প্রত্যহ অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে একটা ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ শিল্পসমালোচকের ব্যাখ্যা-ব্যতিরেকে শিল্পের বক্তব্য বিষয় সহজে সকলের অধিগম্য হয় না।

এইবার চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়া এই উভয়বিধ সাহিত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসই আধুনিক সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্বতন্ত্র মানব-চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা আদর্শ-চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। জনসাধারণের সম্মুখে সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শগুলি স্থাপন করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যে কত প্রভেদ, আধুনিক উপন্যাসপাঠে তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু প্রাচীন কাব্য, কথা-কাহিনীতে মানুষ কোন্ কোন্ আদর্শ ও উচ্চভাবের সম্মুখে নত মস্তকে একত্র হইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারই বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত উপায়ে সমাজমধ্যে যে ভ্রাতৃত্বভাব বা সৌভ্রাত্রের উদ্ভব হয়, তাহার নানা সামাজিক বৈষম্যসত্ত্বেও রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, প্রভু ভৃত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, সকলকেই এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া দেয়। Chesterson সাহেব তাঁহার Victorian Age in Literature গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে Chancerএর Canterbury Tales ও Thackerayর উপন্যাসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, Chaucerর কাব্যে Knight Squire ময়দাওয়ালা, কৃষক, ছাত্র, পুরোহিত, মঠের মহান্ত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল চরিত্র একত্র হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর; অপর দিকে Thackerayর উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোক। Chancerএর কাব্যে

ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সকলে মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া গল্প বলিতে বলিতে Canterbury র St. Thomas এর সমাধি-উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় চলিয়াছে। তীর্থযাত্রার উপলক্ষে সকলে মিলিয়া যে আদর্শের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তুলনায় সামাজিক সমস্ত বৈষম্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু Thackeray র উপন্যাসে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ একত্র মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারেন, এরূপ কল্পনা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। অথচ Thackeray র যুগে সাম্য মৈত্রীর জয়ধ্বনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়া ছিল। Chesterton সাহেব বলেন—তাহার কারণ এই যে, এই যে আধুনিক সমাজের মাথার উপরে ধর্ম্ম বা তত্তুল্য অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান নাই। Chaucer এর সমাজ ও Thackeray র সমাজ-সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে চিত্রিত সমাজ-সম্বন্ধে যথাক্রমে সেই কথা বলা যাইতে পারে।

এইবার শিল্প ও সাহিত্য-প্রচারের দিকটা দেখা যাউক। আধুনিক সাহিত্য মুদ্রিত গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। সুতরাং ইহা অনেক পরিমাণে অধ্যয়ন-কক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কেবল গ্রন্থ-মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই গানের জন্য রচিত হইত এবং গান, আবৃত্তি, কথা প্রভৃতি দ্বারা পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হইত। সামাজিক-জীবনের নানা পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে এই সকল কাব্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশে মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান, শিবের গান প্রভৃতি ও ইউরূপে Romance কাব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক সমাজে যে পরিমাণে ভাব-রস-চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই পরিমাণে

সামাজিক জীবনে যে সকল আনন্দ মিলনের ক্ষেত্র ছিল তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের democracy বা প্রজাতন্ত্রের যে আদর্শ তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ভাবই প্রবল। সুতরাং এই democracy র আদর্শ অবলম্বন করিয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্র বা সামাজিক শিল্প-সাহিত্য গড়িয়া তাই সাহিত্যে এখন ক্রমশঃই বিশেষভাবে কলারসাভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনসমাজের সহিত তাহার আর কোন সম্পর্ক নাই। সাহিত্য-সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পসম্বন্ধেও তাই। আধুনিক চিত্রপ্রতিমাদি এখন Art Galleryর কাচের আলমারীতেই শোভা পাইয়া বিশেষজ্ঞের আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন শিল্প ঘটী-বাটী সাজ-সরঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরাদির প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত বা খোদিত কাহিনী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সৌন্দর্য্য-বোধ ও ভাবুকতার পরিচয় প্রদান করিত।

শেষে শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে একবার উভয়বিধ শিল্পের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন শিল্পে শিল্পী সামাজিক ভাব ও আদর্শের ভৃত্য বা সেবকমাত্র। বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া রচনাভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই শিল্পীকে প্রচলিত বাঁধা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এ অবস্থায় শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঁধা পদ্ধতি প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাধা স্বরূপ না হইয়া সহায়রূপেই পরিণত হয়। কারণ, কবিকে নিজের ভাষা, নিজের মালমসলা নিজে সৃষ্টি করিয়া লইবার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে রস-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং প্রাচীন শিল্পের একটা গুণ এই দেখা যায় যে, তাহা অতি সহজেই শ্রোতা বা দ্রষ্টার

মনে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে যে সকল শিল্পী প্রতিভা-হিসাবে নিকৃষ্ট তাঁহাদিগকেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের শিল্পরচনা-চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইতে পারিত না। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তৃদিগের মধ্যে সকলেই কিছু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ ছিলেন না—তথাপি এক নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও রচনাভঙ্গী অবলম্বন করার দরুণ সকলেরই রচনা বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আধুনিক শিল্পী যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হন তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-রচনা চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আর এক দিক দিয়াও প্রাচীন শিল্পীর সুবিধা ছিল। প্রাচীন-কালে যে ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে জনসমাজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, তাহা শিল্পরচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শিল্পী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই শিল্পের উপকরণ পাইতেন। এখন সামাজিক জীবনে ভাবের হাওয়া বহে না। সুতরাং শিল্পীকে কষ্ট কল্পনা করিয়া প্রায়ই প্রাচীন সমাজের চিত্রপট, কল্পনার সাহায্যে সম্মুখে ধরিয়া শিল্প রচনা করিতে হয়। কারণ, আধুনিক জীবনের শুষ্কতার মধ্যে শিল্পের মালমসলা বড় বেশী পাওয়া যায় না। এইজন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের আখ্যানাদি ও সেই সেই যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনার একটা চেষ্টা দেখা হয়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্য জগতে ভাবপ্রাণ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ অনুকূল বেষ্টনীর অভাবে হাঁপা-ইয়া উঠিয়াছেন। সে দিন বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি *W.* B. Yeates কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজে কবি ও শিল্পিদিগের বার আনা শক্তি ও উদ্যম বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রামেই ব্যয়িত হয়।

শিল্পীর সমস্ত শক্তি এখন আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে না। প্রমাণ-স্বরূপ Ruskin ও Morrisএর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যাই স্ব স্ব জীবনের মুখ্য সাধনা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা শিল্পসৃষ্টির অনুকূল নহে, অথচ বর্ত্তমান জীবন্ত সমাজের মধ্য হইতে অনুপ্রাণনা না পাইলে কি শিল্প সৃষ্টি হইতে পারে? কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রাচীন যুগের স্বপ্ন-রচনা আর কত দিন করা যায়? তাঁহারা দেখিলেন, আধুনিক সমাজের এ শুষ্কতার মধ্যে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার না করিতে পারিলে শিল্পের উৎস একেবারে শুকাইয়া যাইবে। তাই তাঁহারা আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা-সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহা-দিগের সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী এখন পাশ্চাত্য জগতের নানা স্থান হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ভাবুকমাত্রেই এখন প্রাচীন সমাজের মত একটা কিছু ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

এতক্ষণ আমরা আমাদের মূলবিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আমাদের সমাজে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার পূর্ণ পরিণতির চিত্র দেখিতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজেই দেখিতে হইবে। আমাদের সমাজে আধুনিক সভ্যতার পূর্ণ পরিণত স্বরূপ বেশ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। এখনও আমরা অন্ততঃ সমাজের বার আনা লোক যাত্রা কথকতা কীর্ত্তনে রস পাই, এখনও আমাদের দেশে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন শিথিল হইলেও ছিন্ন হয় নাই। Old Age Pension আইন পাশ করিতে হইবে কি আশু নারী সমাজকে রাজনৈতিক ভোটযুদ্ধে নামাইয়া দিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা এখনও আমাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলি যে এখন অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখন আর সেরূপ স্বাভাবিকভাবে মন্দির জলাশয় বৃক্ষ পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্ততঃ—ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে যে যে সমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আদর্শের প্রবল প্রতাপ সেই সেই সমাজে ও প্রদেশে এই সমাজ ধর্ম্মপালন একরূপ বন্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ ব্যাপারে দেশীয় ভাব রক্ষার জন্য যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে ও শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে শুভ লক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিছুদিন হইল চিত্র-শিল্পের রাজ্যে এই বাঙ্গালা দেশে এইরূপ একটা ভারতীয় ভাব ফুটাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যেও এই চেষ্টার অল্পাধিক পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল শিল্প ও সাহিত্যের রাজ্যে ভারতীয় ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। সমাজের চারিদিকে যদি বিদেশীভাবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়া বহিতে থাকে শিল্পী ও সাহিত্যিককে যদি প্রাত্যহিক সংসারের কার্য্যে পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের আদর্শই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্র বা কাব্যের বিষয় বা রচনা ভঙ্গী ভারতীয় হইলেও, ভাবের আন্তরিকতার অভাবে সেই শিল্প এক প্রকার সৌখীনতা বা স্বপ্ন-বিলাসের মত হইয়া পড়িবেই। সেইজন্য এখন দেশীভাবে দেশী ছাঁদের শিল্পচর্চ্চা করিতে হইলে সমাজের মধ্যেও সেই সকল দেশী ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে আমাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে সে সময়ে পুরাতন সামাজিক জীবনের প্রাণ শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গার্হস্থ্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সকল দেশী আদর্শ তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বজায় আছে। এখনও পুরাতন আনন্দ মিলনের ক্ষেত্রগুলি বর্ত্ত-

মান। যাঁহারা দেশী শিল্প ও দেশী সাহিত্য চান তাঁহাদিগের এই জীবন্ত সমাজকে উপেক্ষা কবিলে চলিবে না। এই ক্ষীণ প্রাণ সমাজশরীরে প্রাণ শক্তি সঞ্চার করিয়া ইহাকে পুনরায় সবল করিতে না পারিলে শিল্পের রাজ্যে সেই ভারত শিল্প ও সাহিত্য সেই Pre. Raphaeliteদের শিল্পের মত অতীত যুগের স্বপ্ন লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিবে।—তাহা সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প সাহিত্য যেমন জীবনী রস সংগ্রহ করে, অপর দিকে তেমনি সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্য্যেও শিল্প সাহিত্য সহায়তা করিতে পারে। শিল্পিগণ যদি জীবন্ত সমাজের অনুপ্রাণনায় ধন্য হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখন এই সামাজিক জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদের শিল্প চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে। আদর্শ সমাজের জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্র লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করুন ও ভাবরসসৌন্দর্য্যহীন মানব সম্বন্ধলেশ শূন্য আধুনিক সমাজের যে বীভৎসতা, তাহাও যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখান; পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালীর যে মোহিনীশক্তি আমাদের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের পূর্ণ পরিণত সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা সংস্কারের অভাব তাহার একটা কারণ। এই কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক মোহ নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর স্বভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেইরূপ, প্রাচীন সমাজেই যে লোভনীয়তা, তাহাও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমাদের সম্মুখে সেরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ কিছু দিন এই এই সমাজ চিত্রকেই নিজ নিজ রচনার বিষয়ীভূত করিয়া লউন। দেশের শিক্ষিত সমাজের সুপ্ত সমাজ বোধ এইরূপে জাগ্রত করিয়া দিন। যেন আমাদের এই সনাতন সমাজকে কখনও

Old Age Pensions Act ও Insurance Actএর দ্বারা বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইতে না হয়। যেন পুনরায় আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, বৃহৎ সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিত্য ও শিল্পের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বাঙ্গালা ভাষা

দেশের যাহা কিছু ভাল তাহার যত্ন করা, তাহার উন্নতির চেষ্টা করা, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, অপর কোন ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা এবং দেশের যাহা কিছু মন্দ তাহা প্রাকৃতিকই হউক বা সামাজিকই হউক তাহা ভাল করিতে চেষ্টা করা, বা স্থান-বিশেষে তাহা সমূলে দূর করিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত দেশানুরাগ। কোন বাঙ্গালী যদি বলেন যে "আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া চিরদিনই ছিল সুতরাং বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত বা স্বাভাবিক। অতএব সেই অভিপ্রায় বা স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।" যদি কোন হিন্দুস্থানী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তাঁহাদের দেশ-প্রচলিত দোলের সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতার এবং কোন সুশিক্ষিত আসামবাসী যদি তাঁহাদের

দেশের বিহুর অশ্লীল আমোদ-প্রমোদের সমর্থন করেন তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে কোনমতেই স্বদেশানুরাগী বলা যাইতে পারে না; বরং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব দেশের পরমশত্রু।

প্রত্যেক দেশের লোক উত্তরাধিকার-সূত্রে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সমাজগত আচার-ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বস্তু লাভ করে, দেশের ভাষা তাহার অন্যতম। সুতরাং নিজ নিজ দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ—ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও বিশুদ্ধতা-সংরক্ষণ, ভাষার যে যে অঙ্গ দুর্ব্বল তাহা সবল করিবার চেষ্টা করা, যে যে অঙ্গ নাই তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা, ভাষাকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, অর্থাৎ শিক্ষিত লোক অসাবধানে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন, যাহা সাধারণে অনুকরণ করিতে পারে তখন তাহার প্রতিকার করা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষা এবং বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হওয়া উচিত নহে। আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গ-ভাষার প্রকৃতি ও গঠন-প্রণালী, বঙ্গভাষার বর্ণমালা, বানান ও উচ্চারণ, বঙ্গভাষার লিখন ও কথোপকথন এবং বঙ্গভাষা-প্রয়োগের শুদ্ধাশুদ্ধতা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা এবং বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে দুই একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিব। বঙ্গদেশের মস্তিকস্বরূপ প্রধান পণ্ডিতগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের অনুমোদন ও ইচ্ছা হইলে আমার এই প্রস্তাব দেশের অন্যান্য পণ্ডিতদিগের দ্বারাও আলোচিত হইয়া একটা মীমাংসা হইতে পারে।

বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন-প্রণালী।

ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি অপেক্ষা বঙ্গভাষা স্বভাবতঃ কিছু দীর্ঘায়ত। অর্থাৎ একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অন্য ভাষার যতগুলি

স্বর বা syllable এর প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক স্বর লাগে। কোন একটা ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে। ইংরেজী Whatever you do, do well, হিন্দী "জোকৃছ কর্‌না, অচ্ছী তরেহ সে কর্‌না" বাঙ্গলা "যাহা কিছু করিবে, ভাল করিয়া করিবে "এই তিনটি বাক্য একই ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরেজীতে এই ভাব প্রকাশ করিতে সাতটি মাত্র স্বর লাগে, হিন্দীতে লাগে এগারটি এবং বাঙ্গালায় পনরটি লাগে। কখন কখন একই ভাব প্রকাশ করিতে ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃতে প্রায় সমানসংখ্যক স্বরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বাঙ্গলায় সর্ব্বদাই অধিক স্বর লাগে। ইংরেজী Blessed are they that Hunger and thirst after righteousness এই বাক্যটিতে পনরটি স্বর আছে। হিন্দী "ধন্য বে জো ধর্ম্মার্থ ক্ষুধিত ঔর তৃষিত হৈং" ইহাতে এগারটি স্বর, উর্দ্দু "মবারক বে জো রাস্ত রাজীকে ভূকে ঔর পিয়াসে হৈং" ইহাতে ষোলটি স্বর, সংস্কৃত "ধন্যাস্তে যে ধর্ম্মার্থং ক্ষুধিতা তৃষিতাশ্চ" ইহাতে চৌদ্দটি স্বর কিন্তু বাঙ্গালা "ধন্য তাহারা যাহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত" ইহাতে উনিশটা স্বর। এইরূপে বাঙ্গলায় মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে অধিক স্বরের প্রয়োজন হয় বলিয়া উহা যেন কিছু গুরুভার; সুতরাং অন্য ভাষার তুলনায় দুর্ব্বহ। দূরদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন দুর্ব্বহ পয়সা বা টাকার পরিবর্ত্তে নোট বা মোহর লইয়া যান, তেমনই একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অল্প স্বর-যুক্ত বাক্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই জন্যই যাহারা ইংরেজী জানে না তাহারাও লাইব্রেরী বলে কিন্তু পুস্তকালয় বলে না; হস্পিটালের অপভ্রংশ হাসপাতাল বলে কিন্তু চিকিৎসালয় বলে না। অধিক স্বর লাগে বলিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্যের বা টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গলা হওয়া কঠিন। দ্রুত মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে যাহারা বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য কোন

ভাষা জানেন তাঁহারা বাঙ্গলা ছাড়িয়া সেই ভাষাই বলেন। ক্রোধ বা মত্তের উত্তেজনাবশতঃ মনোভাব যখন দ্রুত বাহির হইয়া পড়ে তখন যাহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারা ইংরেজীই বলিয়া থাকেন। বাঙ্গলা সাময়িক-পত্রিকার সম্পাদকেরা কোন প্রবন্ধ পাইলে তাহাতে ইংরেজীতে হয় Approved না হয় Not approved লিখিয়া থাকেন। কেননা একেত বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে ইংরেজী অপেক্ষা অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার উপর বাঙ্গলায় "মনোনীত" বা "মনোনীত হইল না" পুনঃপুনঃ লিখিতে হইলে ধৈর্য্যচ্যুতি ও ক্লান্তির সম্ভাবনা। বাঙ্গলাভাষার এইরূপ দুর্ব্বহ হইবার অন্যতম অপরিহার্য্য কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াবিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণের সহিত "করিয়া" "ভাবে" "রূপে" প্রভৃতি একাধিক স্বরযুক্ত প্রত্যয়ের একটা না একটা যোগ করিতে হয়। ইংরেজীতে ক্রিয়াবিশেষণ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণ-পদে একটি এক-স্বর-প্রত্যয় অর্থাৎ Ly যোগ করিলেই হয়। সংস্কৃতে হসন্ত ম বা অনুস্বার যোগ করিলেই হয় অর্থাৎ স্বর মোটেই লাগে না।

শব্দের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলেও একাধিক স্বরের প্রয়োজন।

বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হইবার একটা কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াপদের বড় অপ্রচুরতা। করা, খাওয়া, যাওয়া, দেখা প্রভৃতি বহু ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার নিজস্ব বটে কিন্তু বহুতর ক্রিয়াপদ সেই সেই ক্রিয়াজ্ঞাপক সংজ্ঞার সহিত কৃ ও ভূ ধাতুর অথবা করা ও হওয়া ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ হইয়া নিষ্পন্ন হয় সুতরাং সেগুলি দীর্ঘায়ত হইয়া পড়ে। "He has passed" He has failed" It 'seems' এই সকল বাক্যের বাঙ্গালা হয় "তিনি পাশ হইয়াছেন" "তিনি ফেল হইয়াছেন" এবং "বোধ হয়।" Investigate অনুসন্ধান করা, beat প্রহার করা, Kill বধ করা ইত্যাদি অসংখ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হয় বটে কিন্তু এরূপ

প্রয়োগ সাধুভাষায় অপরিহার্য্য। অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণ স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদের অপ্রচুরতা দেখিয়া অনুসন্ধানিল, প্রহারিল, বধিল, ঘ্রাণিল, সৃজিল প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি ও কাব্যের ভাষার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রচলিত সাধুভাষায় এইরূপ প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোন নূতন ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করিতে হইলে দেখা উচিত যে, তাহাতে সকল বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে কিনা। যদি অনু-সন্ধানিল, বধিল, প্রহারিল, ঘ্রাণিল, সৃজিল পদ হয়, তবে তাহাদের মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় কি হইবে? অনুসন্ধানো, বধো, প্রহারো, ঘ্রাণো, সৃজো হইবে কি? এবং তাহাদের মূল ধাতুই বা হইবে কি? অনু-সন্ধানা, বধা, প্রহারা, ঘ্রাণা, সৃজা হইবে কি? কোন কোন ক্রিয়াপদ কৃ ধাতুর সাহায্য বিনা অথবা অন্য একটা ধাতুর যোজনা বিনা প্রস্তুত হইতেই পারে না। যথা Kick শব্দের বাঙ্গলা "পদাঘাত করা" অথবা "লাথিমারা" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে লাথি এবং অন্য বহু শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই সকল পদ এমনই শ্রুতিকটু যে সেগুলি সাধুভাষায় স্থান পাইতে পারে না।

কিন্তু উক্ত হেতু ভিন্ন একটি গুরুতর হেতু আছে যে জন্য অনুসন্ধানিল, ঘ্রাণিল প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বকালে বহু বস্তু, বহু কল্পনা, বহু জন্তু, বহু ভাষা অতিকায়, জটিল, শ্লথগতি এবং এখনকার লোকের পক্ষে বিভীষণ ছিল। কিন্তু অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে সকল বস্তুই অল্পায়তন, লঘুকলেবর ও সুগম হইয়াছে ও হইতেছে। এখন আর ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জন্তু নাই। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হস্তীরও লোপ হইবে বলিয়া বোধ হয়। এখন আর কুড়ি হাত দশমুণ্ড মনুষ্যের কল্পনাও হয় না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারগুলিকে দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্যই যেন ইহাদের বহির্ভাগ ও

অত্যন্তর বিভক্তি, লিঙ্গভেদ, বচনের বহুত্ব, প্রত্যয়ের অনন্তত্ব প্রভৃতি দ্বারা কণ্টকিত। কিছু কালের বিবর্ত্তনে এই সকল ভাষার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রীকে এখন আর দ্বিবচন নাই। বৈদিক সংস্কৃতে ও লৌকিক সংস্কৃতে কত প্রভেদ তাহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আবার সাহিত্যিক-লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা মহারাষ্ট্র-দেশপ্রচলিত কথোপকথনের সংস্কৃত কত সুগম তাহা অভিজ্ঞব্যক্তিরা বিলক্ষণ জানেন। যখন বিভক্তিরূপ কণ্টক ভাষার শরীর হইতে আর টানিয়া বাহির করা যায় না অথচ কর্ম্মশীল লোকের তাড়াতাড়ি মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু সেই বিভক্তিময় ভাষা আয়ত্ত করিবার অবকাশ থাকে না, তখন অপেক্ষাকৃত অল্প বিভক্তিযুক্ত ভাষার জন্ম হয়। এইরূপে ভাষা হইতে বিভক্তির সম্পূর্ণ লোপ হওয়াই ভাষার চরম অভিব্যক্তি। ইংরেজীতে কয়েকটা মাত্র বিভক্তি আছে কিন্তু শব্দের লিঙ্গভেদ উঠিয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজীতে বস্তুর স্ত্রী-পুং-ভেদ ব্যতীত শব্দের লিঙ্গভেদ স্বীকৃত হয় না। Sun এর যে পুংলিঙ্গ সর্ব্বনাম এবং Earth এর যে স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয় তাহা Sun এবং Earth যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া নহে কিন্তু রূপকচ্ছলে তাহারা পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হয় সেই জন্য। বাঙ্গলা ও উত্তর-ভারতবর্ষ-প্রচলিত সংস্কৃতমূলক অন্যান্য ভাষা এখনও বিভক্তিবহুল আছে বটে কিন্তু এই সকল বিভক্তির সংখ্যা সংস্কৃত বিভক্তি অপেক্ষা অনেক কম। সংস্কৃতে যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে শব্দের লিঙ্গভেদ আছে বাঙ্গলায় তাহাও উঠিয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় লেখকেরা এখন বরং "শস্যশালিনী বঙ্গদেশ" লিখিবেন তথাপি "সংস্কৃত বড় সুন্দরী ভাষা" এমন কথা লিখিবেন না। স্ত্রীলোক শব্দটা পুংলিঙ্গ বলিয়া এখন অতি উৎকট বৈয়াকরণও "গর্ভবান স্ত্রীলোক" লিখিতে সাহস করেন না কিন্তু "গর্ভবতী স্ত্রীলোক" লিখিয়া থাকেন। এখন আর পাত্র শব্দ ক্লীব-

লিঙ্গ নহে। এখন পাত্র হইয়াছে পুরুষ এবং নূতন ব্যাকরণদুষ্ট পাত্রী আসন্নবিবাহা কন্যাকে বুঝায়। যদি বিভক্তির লোপই অভিব্যক্তির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানিল, প্রাণিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া ক্রিয়া-পদের রূপের সংখ্যা বাড়াইয়া সেই নিয়মের পরিপন্থী হওয়া উচিত নহে। যথাসাধ্য করা ও হওয়া ধাতুর যোগে সমস্ত ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করাই সমীচীন।

বাঙ্গলাভাষার আরও কয়েকটা অভাব আছে। ইহাতে সর্ব্বনামের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই। তিনি এবং সে স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয় পুংলিঙ্গে ও হয়। এই অভাব অনেক সময়ে অনুভব করিতে হয়।

ইংরেজীতে Participial adjective এবং সংস্কৃতে শতৃ-শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদের অনুরূপ পদ বাঙ্গলায় সর্ব্বদা প্রস্তুত হইতে পারে না। "Laughing man", "Running train" "Talling body" প্রভৃতির ভাল বাঙ্গলা কি হইতে পারে তাহা আমি অবগত নহি। ইংরেজীতে যৎ শব্দ বা Relative pronoun দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ বাক্য (Adjective sentence) রচিত হয় বাঙ্গলায় তদ্রূপ হয় না। ছোট ছোট বিশেষণবাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনবারৃত্তি করিতে বাঙ্গলা লেখকেরা পদে পদেই বিশেষতঃ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিবার সময়ে এই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ (Cardenels) হইতে পারে না ; 62nd, 53rd, 55th প্রভৃতি শব্দের বাঙ্গালা কি হইতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। কিন্তু ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একজন প্রবন্ধ পাঠকের মুখে, বাষট্টিতম, তিপ্পান্নতম, পঞ্চান্নতম প্রভৃতি বা তদনুরূপ শব্দ শুনিয়া-ছিলাম। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত সংস্কৃত-প্রত্যয় জোড়া

দিয়া প্রস্তুত, এই সকল সঙ্কর শব্দ উত্তমরূপে কার্য্যোপযোগী, সুতরাং আমার বিবেচনায় এইরূপেই নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ প্রস্তুত করা উচিত। আমি গত ১৩১৮ সালের মাঘের উৎসবের সময়ে কলিকাতা আদি-ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে গিয়া দেখিলাম যে, এক সমাজে সেই উৎসবের নাম দ্ব্যধিকাশীতম মাঘোৎসব, অন্য সমাজে দ্ব্যশীতিতম ব্রাহ্মোৎসব। এই দুইটা দাঁতভাঙ্গা সংখ্যাবাচক সংস্কৃত বিশেষণের পরিবর্ত্তে যদি সরল বাঙ্গালায় বিরাশীতম শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত তম-প্রত্যয় যোগ করিয়া পদ নিষ্পন্ন করায় আর একটা লাভ এই যে, উহাতে ভগ্নাংশ পড়িবার সুবিধা হয়। একটি ভগ্নাংশের লব যদি তিন এবং হর বিরাশী হয়, তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে "তিন বিরাশীতম" বলা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব-নিয়মানুসারে তিন দ্ব্যধিকাশীতিতম বলা একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার। আমার বিবেচনায় "প্রথম" হইতে "দশম" পর্য্যন্ত শব্দ কয়েকটির পর হইতে এগারতম, বারতম শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজীর মত "হওয়া" ধাতুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ, অন্য ধাতুর ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্মবাচ্য প্রস্তুত হয়। সংস্কৃতে কি কর্ম্মবাচ্যে, কি ভাববাচ্যে প্রত্যেক পদে ভিন্নরূপ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি:—বলির্ববন্ধে, জলধির্মমন্থে, অমৃতং জহ্রে, দৈত্যকুলং বিজীগ্যে, বসুধা উহে এই গুলির বাঙ্গালা—বলি বদ্ধ হইয়াছিল, জলধি মথিত হইয়াছিল, অমৃত আহৃত হইয়াছিল, দৈত্যকুল পরাজিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রত্যেক ধাতুর সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয় না বলিয়া বাঙ্গলাভাষার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে বাঙ্গালার শক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু

তাহা হইলেও বাঙ্গালায় কর্ম্মবাচ্য নাই বলিলেই হয়! দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। I am told এই বাক্যটির বাঙ্গলা অনুবাদ "আমি শুনিয়াছি" ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। I am owed three Rupees by you ইহারও বাঙ্গালা "তুমি আমার তিন টাকা ধার" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বাঙ্গলায় যে সমস্ত কর্ম্মবাচ্যের ব্যবহার আছে, সে গুলিরও আকার বিরূপ হইয়া গিয়াছে। কোন কোনগুলি কর্ত্তৃবাচ্যের আকার ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু কর্ত্তাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে। ভোজের সময়ে পরিবেশকগণ ভোক্তাদিগকে "লুচি চাই" "সন্দেশ চাই" প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া থাকে। "চাই" পদ যে হিন্দী "চাহিয়ে" পদের অপভ্রংশ সুতরাং কর্ম্মবাচ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা তাহা না হইলে লুচি ও সন্দেশের সহিত উহার অন্বয় হয় না। এখানে কর্ম্মই কর্ত্তৃপদের স্থানে আছে। সেইজন্য লুচি ও সন্দেশের কোন বিকার হয় নাই। কিন্তু "বেদে বলে" এই বাক্যে বেদই সাক্ষাৎকর্ত্তা। তাহা অধিকরণরূপ ধারণ করিয়াছে। "গরুতে ঘাস খায়" "কুকুরে কামড়াইয়াছে" প্রভৃতি বাক্যে ক্রিয়ারূপ কর্ত্তৃবাচ্য কিন্তু কর্ত্তারূপ অধিকরণ। আমার এই মতের সহিত অনেকের হয়ত মত মিলিবে না। কেননা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই সকল কর্ত্তৃপদের বিকৃতির অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় যখন অন্য ধাতুর সহিত কৃ-ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করিতে হয়, তখন তাহাতে যে কোন নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহা হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে না। ইংরেজীতে boycott, lesterate, macadamise, galvanise, mesmerise প্রভৃতি ভূরি ভূরি নামধাতুর

ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে শব্দায়তে নামক ক্রিয়াপদ যে নামধাতু হইতে নিষ্পন্ন তাহা অনেকেই জানেন। একটা রসায়নের ফলশ্রুতিতে লিখিত আছে যে তাহাদ্বারা "গর্দ্দভী অপ্সরায়তে" অর্থাৎ কুৎসিতা নারীও অপ্সরার মত সুন্দরী হয়। সংস্কৃতে যে কেবল একটা শব্দ লইয়াই ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা নহে, বড় বড় সমাস দিয়াও ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। ইহার একটা দৃষ্টান্ত অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া দিতেছি!

> কালিন্দীয়তি কজ্জলীয়তি কলানাথাঙ্ক মালীয়তি
> ব্যালীয়ত্যবিমণ্ডলীয়তি মুহুঃ শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠীয়তি
> শৈবালীয়তি কোকিলীয়তি মহানীলাভ্রজালীয়তি
> ব্রহ্মাণ্ডে রিপুদুর্যশস্তব নৃপালঙ্কার চূড়ামণে।

কিন্তু বাঙ্গালা হিন্দী আসামী প্রভৃতি ভাষার সাধু সাহিত্যে গৃহীত হইবাব উপযুক্ত নামধাতু হইতে ক্রিয়া পদ প্রস্তুত হইতে পারে না। যে দুই চারি নামধাতু আছে তাহা কেবল ব্যঙ্গার্থেই প্রযুক্ত হয়। একজন কবি স্বরচিত কাব্যে কয়েকটা নামধাতু ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া আর একজন এক কবিতা লেখেন। বাল্যকালে তাহা পাঠ করিয়াছি সুতরাং এখন তাহার এক চরণমাত্র মনে আছে। তাহা এইঃ—

"কৌশল্যিয়া দশরথ যবে অযোধ্যিলে" ইহার পাদটীকায় লিখিত ছিল "কৌশল্যিয়া অর্থাৎ কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া, অযোধ্যিল অর্থাৎ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল।"

বাঙ্গালা, হিন্দী, আসামীভাষায় নামধাতু এবং স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ সম্ভবে না, কিন্তু খাসিয়া ভাষায় ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের মত সমস্ত ক্রিয়াপদই স্বতন্ত্র এবং সমস্ত নামই ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। ইহা অস্বাভাবিক

প্রথমে কর্ত্তা, কর্ত্তা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ম্মে তাহার পর্য্যবসান। সুতরাং প্রথমে কর্ত্তা মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্ব্বশেষে কর্ম্ম ইহাই স্বাভাবিক-ক্রম। ইংরেজীভাষা এই স্বাভাবিক পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুসরণ করে বলিয়া তাহা বাঙ্গালা, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে এক খাসিয়া ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা এই স্বাভাবিক ক্রম-অনুসারে চলে কিনা জানি না।

উপরে বাঙ্গালাভাষার মোটামুটি যে কয়েকটা অভাব, ত্রুটি ও অঙ্গ-হীনতার কথা বলিলাম, কালে তাহার প্রতিবিধান হইবে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু বিকলাঙ্গ স্থূলদেহ ব্যক্তিও অঙ্গপরিচালন দ্বারা সুস্থাঙ্গ ও লঘুকলেবর হয়। অন্ততঃ তাহার যে অঙ্গ আছে তাহা সবল হইয়া যে অঙ্গে নাই তাহার অভাব পূরণ করে। সুতরাং প্রচুর অনুশীলন হইলে বাঙ্গালাভাষারও উন্নতি অবশ্যই হইবে। আমি যাহা বাঙ্গালা-ভাষার সহজাত রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম পণ্ডিতেরাও যদি সেই গুলিকে রোগ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে সময়ে আরোগ্যও হইতে পারে। যাঁহারা কখনও ইংরেজী বা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারাই বাঙ্গলা ভাষার অভাব ও দারিদ্র্য উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বর্গগত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য পাদ্রিগণ যে সকল পুস্তক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন সেই অনুবাদের ভাষা অত্যুৎ-কৃষ্ট না হইলেও তাহা যে প্রকৃত অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকের যথাযথ অনুবাদ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই হয়। অনুবাদকেরা প্রায়ই লেখেন যে, বাঙ্গালী পাঠকের উপ-যোগী করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ অনুবাদে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া-ছেন। ইহার প্রকৃত কারণ আমার এই বোধ হয় যে, বাঙ্গলার দারিদ্র্য-বশতঃ তাঁহারা সকল স্থানের অনুবাদ করিতে সমর্থ হন নাই।

বর্ণমালা—বানান ও উচ্চারণ।

বোধ হয় কোন ভাষার বর্ণমালাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নহে। আরবীতে চ ও গ নাই। পারসী চঙ্গ শব্দ আরবীতে সঞ্জ্ হইয়া যায়। সংস্কৃত চতুরঙ্গ স্থলে আরবীতে সৎরঞ্জ্ হয়। তাহাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত চতুরঙ্গ-ক্রীড়া অর্থাৎ দাবা-খেলার নাম সতরঞ্চ-খেলা হইয়াছে। গ্রীকেও চ স্থলে স লিখিত হয়। সংস্কৃত চন্দ্র শব্দ গ্রীকে সন্দ্ররূপে লিখিত হইয়া থাকে। ইংরেজীতে ত, থ, দ, ধ নাই। ফ্রেঞ্চ, ইটালি প্রভৃতি ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ নাই। তবে যে আমরা ইটালি, লাটিন্, বোর্ডো প্রভৃতি শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাই তাহার কারণ এই যে, ইংরেজেরা ইতালি, লাতিন, বোদোঁ প্রভৃতি শব্দকে ইটালি, লাটিন বোর্ডো প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং আমরা এই শব্দগুলি ইংরেজী হইতে লইয়াছি। যখন বহু অনুশীলিত ভাষাগুলির বর্ণমালা এইরূপ অসম্পূর্ণ তখন আমাদের বর্ণমালাও যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বাঙ্গলায় যতগুলি ধ্বনি আছে বাঙ্গলা বর্ণমালায় তদনুরূপ অক্ষর নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এরূপ ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গলায় কতকগুলি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় যত ধ্বনি আছে ঠিক তদনুরূপ অক্ষরও আছে। একটাও কম বা বেশী নাই। উর্দ্দু ভাষায় ব্যঞ্জন-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু তাহাতে স্বরধ্বনির অনুরূপ সকল অক্ষর নাই। এক আলেফের সঙ্গে জের, জবর, পেশ, এবং মদ্ দিয়া ই উ এবং আ প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু অন্যপক্ষে বাঙ্গলা, আসামী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় যত ধ্বনি আছে ততধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত অক্ষর নাই। অথচ এই সমস্ত ভাষায় এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহা না

থাকিলেও চলে। ইংরেজীতে এক A অক্ষরের Fate, fat, fare fall, fast, far, what, many এই আটটি শব্দে আট প্রকার উচ্চারণ হয়। ইংরেজীতে এই আটটি উচ্চারণ যখন একমাত্র A অক্ষর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে তখন আমাদেরই বা বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন কি? চীনদেশের বর্ণমালায় এতদিন ৮০০০ অক্ষর ছিল, এখন এই আট হাজারের স্থলে আটচল্লিশটি মাত্র অক্ষর প্রচলিত হইতে যাইতেছে। গ্রীকেরও অক্ষর-সংখ্যা অল্পীকৃত হইয়াছে। V ধ্বনিজ্ঞাপক F (দিগম্মা) নামক অক্ষর একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন গ্রীকে চব্বিশটিমাত্র অক্ষর। লাটিনে পঁচিশটি অক্ষর। ইংরেজীতে ছাব্বিশটি অক্ষর দ্বারা সমস্ত কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের যে পঞ্চাশটা অক্ষর আছে তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তবে ইংরেজী অভিধানে যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রদর্শন করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে আমাদের অভিধানেও সেইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকা উচিত।

বাঙ্গলা ও আসামীভাষায় সংস্কৃত অকারের উচ্চারণ নাই। But শব্দের u অক্ষরের যে উচ্চারণ, সংস্কৃত অকারেব ঠিক সেই উচ্চারণ। কিন্তু All শব্দের a অক্ষরের যে উচ্চারণ বাঙ্গালা ও আসামীতে অকারের ঠিক সেই উচ্চারণ। এই উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে কোন প্রদেশেই নাই। সুতরাং সংস্কৃত অকারের উচ্চারণ-প্রদর্শক একটা চিহ্ন বাঙ্গালা অকারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। এই চিহ্ন একটি বিন্দু হইলে ই হয় এবং সেই বিন্দুটি অকার এবং অকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে দিলে ভাল হয়। অকার এইরূপ চিহ্নযুক্ত হইলে তাহা দেখিতেও কতকটা দেবনাগরের অকারের মত হইবে। বাঙ্গালা ও আসামীতে 'অবসর' 'অবলম্বন' প্রভৃতি শব্দের অকারের যে

উচ্চারণ তাহাই এই দুই ভাষার অকারের স্বাভাবিক উচ্চারণ। কিন্তু অনেকস্থলে অকারের অন্যরূপ উচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায়। "ব্যক্তি" এবং "ব্যক্ত" এই দুই শব্দে আমরা অকারের স্বাভাবিক উচ্চারণ করি না। অকারের পর ই বা উ বর্ণ থাকিলে অকারের উচ্চারণ প্রায় ওকারের মত হয়। যেমন সই, কই, সখী, রবি, অপি, কপি, হউক, অমুক, শম্বূক, শক্র ইত্যাদি। চট্ শব্দের এবং ওঁ ফট্ স্বাহার ফট্ শব্দের অকারের যে উচ্চারণ তাহা অবলম্বনের অকার অপেক্ষা হ্রস্ব।

বাঙ্গালায় আকারেরও দুই উচ্চারণ আছে। একটি প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ যাহা ইংরেজী Father শব্দে a অক্ষরের। অন্যটি প্রায় সংস্কৃত অকার অথবা ইংরেজী Fast শব্দের a অক্ষরের মত। বাঙ্গলার অধিকাংশ-স্থলে আকারের এই উচ্চারণ, যথা আমি, আমার, আমাকে, তোমার, তাহারা, তাহাদের, তামাশা ইত্যাদি। তামাশা শব্দটা আমরা যেরূপে উচ্চারণ করি, হিন্দুস্থানীরা ও ইংরেজেরা সেরূপ উচ্চারণ করেন না। তাঁহাদের উচ্চারণই বিশুদ্ধ। ইংরেজীতে Fat শব্দের a অক্ষরের যে ধ্বনি তাহা বাঙ্গালায় আছে, কিন্তু তাহার অনুরূপ কোন অক্ষর নাই। আমরা লিখি এক, কিন্তু বলি য়্যাক্। হিন্দীতে একারের নিম্নে একটি বিন্দু দিয়া এই উচ্চারণ লিখিত হইয়া থাকে। আমাদেরও তদ্রূপই আভিধানিক-সঙ্কেত হওয়া উচিত। য় এ আকার দিয়া এই ধ্বনি প্রকাশ করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে Fat শব্দের a একটি অবিমিশ্র স্বর, কিন্তু আকারযুক্ত য ফলা, স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন। সুতরাং একটা অন্যটার প্রতিনিধি হইতে পারে না। এই ধ্বনি প্রকাশ করিতে কেহ কেহ "অ"এ এবং কেহ কেহ "এ"তে য ফলা আকার দিয়া এক অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালায় ই এবং উ বর্ণের উচ্চারণে কোন গোল নাই। কিন্তু

আমরা অনেক সময়ে হ্রস্ব ই কে এবং হ্রস্ব উ কে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। একস্বরবিশিষ্ট শব্দমাত্রেরই হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা দ্বি, ত্রি, কি, ঘি, ঝি, ছি, কিল্, খিল, হিম, শিব, বিষ, বিশ, ত্রিশ, দিন, তিন, শিম, চিল, তিল, মিল, স্থির, ডিম, ভিড় ইত্যাদি, এবং স্থু, কু, শুঁড়, গুড়, শুঁঠ, উট, ফুট, মুট, ভুল, কুল, ভুর, বুক, পুট, বুট, সুর, সুখ, দুখ, খুন, ফুল, মুন, লুন, গুণ, চুল, পুর ইত্যাদি।

আমরা উচ্চারণে ই বর্ণ, উ বর্ণের মাত্রায় প্রভেদ করি না বলিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ ইত্যাদি বলিতে হয়। আবার শ্রীহট্টের লোকে ওকারকেও উকাররূপে উচ্চারণ করেন—গোলোককে গুলক বলেন। সুতরাং তাঁহারা ওকারকে বলেন, সন্ধ্যক্ষর উ। বাঙ্গালায়ও অনেকস্থলে ওকার স্থানে উকারের উচ্চারণ হয়, কিন্তু সেই সকল শব্দের বানানেও একেবারে ওকার ত্যাগ করিয়া উকার গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা রোটি স্থানে রুটি, টোপি স্থানে টুপি, ধোতি স্থানে ধুতি ইত্যাদি। এই শব্দগুলি সংস্কৃত হইলে কখনই তাহাদের বানান পরিবর্ত্তিত হইত না।

আমাদের মধ্যে ই, উ এবং কখন কখন অবর্ণের মাত্রার প্রভেদ নাই বলিয়া বাঙ্গালার ইন্দ্রবজ্রা, উপয়াতি, মালিনী, শিখরিণী, তোটক, তূণক, Trochaic এবং Iambic ছন্দে কবিতা হইতে পারে না। ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃতচ্ছন্দে বাঙ্গালার কবিতা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কবিতা স্বাভাবিক নহে—তাহা পড়িবার সময়ে স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত না করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। সুতরাং এখন কোন কবিই ব্যঙ্গচ্ছলে ভিন্ন সেরূপ কবিতা লেখেন না।

ঋকারকে হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপে উচ্চারণ করেন, সে

উচ্চারণ বঙ্গদেশে নাই। একখানি বাঙ্গালা নভেলে পড়িয়াছিলাম যে, একজন উৎকলবাসী ক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ বলিতেছেন। তাহাতে ভাবিয়াছিলাম যে উড়িষ্যায়ও বুঝি সেরূপ উচ্চারণ আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে সেরূপ উচ্চারণ উড়িষ্যায় নাই। এক ভাষার ব্যাকরণে (কিন্তু কোন ভাষার ব্যাকরণে তাহা এখন মনে নাই) পড়িয়াছিলাম যে, সেই ভাষায় এমন একটি স্বর আছে যাহা উচ্চারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত চেষ্টার প্রয়োজন হয় ;—উ উচ্চারণ করিতে হইলে, ওষ্ঠদ্বয় যে আকার ধারণ করে, ওষ্ঠদ্বয়কে সেই আকারধারণ করাইয়া ই উচারণ করিতে হয়। উল্লিখিত পশ্চিমদেশীয় লোকেরা প্রায় তদ্রূপ করিয়া ঋ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, আমরা ঋকে যে রি রূপে উচ্চারণ করি, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা তাহারও অনুমোদন করিতেন। কেননা ব্যাকরণে দেখিতে পাই যে, ঋষি শব্দ রিষিরূপে, কৃমি শব্দ ক্রিমিরূপে এবং পৈতৃক শব্দ পৈত্রিকরূপেও লিখিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গলাতেও ঋ ফলার ও ইকারযুক্ত র ফলার মধ্যে প্রভেদ আছে। অনেকেই কিন্তু ইহার ভুল উচ্চারণ করেন। আমি কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেও তাদৃশ, যাদৃশ, জতুগৃহ, সরীসৃপ্ প্রভৃতিকে তাদ্রিশ, যাদ্রিশ, জতুগ্রিহ, সরীস্রিপ্ রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহারাও ঋকে ব্যঞ্জনবর্ণরূপে উচ্চারণ করেন। এইরূপ উচ্চারণ যে ভুল তাহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মালিনীচ্ছন্দের প্রথম চারিটা অক্ষর যদি “জতুগৃহ” হয় এবং “জতুগৃহ” যদি “জতুগ্রিহ” রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় স্বর গুরু হইয়া যায়, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হইবে। কেননা মালিনীর প্রথম ছয়টি স্বরই হ্রস্ব হওয়া উচিত।

হ্রস্ব এ বোধক কোন বর্ণ বাঙ্গলায় নাই—হিন্দীতেও নাই। হিন্দীতে

হ্রস্ব একারের ধ্বনিও নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় একার প্রায় হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। যখন আমরা সংস্কৃত পাঠ করি, তখন একারের উচ্চারণ দীর্ঘই করিয়া থাকি। কিন্তু বাঙ্গলা কথা কহিবার সময়েই হউক বা পাঠ করিবার সময়েই হউক, সংস্কৃত শব্দের একারও আমরা হ্রস্বরূপে উচ্চারণ করি, যথা এই, এস (আইস) যেখানে, সেখানে, স্বেচ্ছা, কেশব, সেবক ইত্যাদি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে, ইকারই হ্রস্ব একার। ইংরেজীতেও বোধ হয়, আভিধানিকেরা পূর্ব্বে সেইরূপই মনে করিতেন। ওআকার (Walker) প্রণীত Dictionaryর পুরাতন সংস্করণে দেখিতে পাই যে, College, damage প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ colij, damij বলিয়া লিখিত আছে। ওএব্‌স্টর (Webster) প্রণীত Dictionaryর পুরাতন সংস্করণে দেখা যায় যে, Sunday, Monday প্রভৃতির উচ্চারণ Sunday, Monday রূপে লিখিত আছে। ইংরেজী Ticket বাঙ্গলায় টিকিট হইয়া গিয়াছে। কলেজকে হিন্দুস্থানীরা এখনও কালিজ বলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব এ একবস্তু নহে। কিন্তু হ্রস্ব এ এবং দীর্ঘ একারের প্রভেদ আমার নিকট অতি আকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি উভয়ের পার্থক্যসূচক একটা চিহ্ন থাকা ভাল।

একার-সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, ওকার-সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। আমরা ওকারকে প্রায়ই হ্রস্বরূপে উচ্চারণ করি। হঠাৎ এ কথাটায় অনেককেই চমকিত করিবে। কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমার মতে মত দিবেন। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

"গোপালের সনে ফিরিতে ঘুরিতে।" এই দ্বাদশটি অক্ষর বাঙ্গলা স্বাভাবিকভাবে পড়িলে বোধ হইবে যে, ইহা বাঙ্গলা কবিতায় একটা

চরণ। কিন্তু ইহার ওকার এবং আকারের স্বাভাবিক বাঙ্গলা উচ্চারণ করিয়া যদি একার চারিটি কিছু অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে অক্ষরগুলির সমষ্টি তোটকছন্দের এক চরণে পরিণত হয়। যথা—

গোঁপাঁলের শঁনে ফিঁরিঁতে ঘুঁরিঁতে।

এই এক পংক্তি হইতেই দেখা যায় যে, দীর্ঘস্বরগুলিকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করাই বাঙ্গলার প্রকৃতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে, ওকারের হ্রস্বই উকার। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

অন্যান্য ভাষায় আরও স্বর আছে। International Phonetic Society কর্তৃক যে বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নাকি বত্রিশটি স্বর আছে। কিন্তু আমাদের আট নয়টি স্বরের দ্বারাই কাজ চলে।

এখন কয়েকটা স্বরান্ত বাঙ্গলা শব্দের নব-প্রবর্ত্তিত বানানের কথা বলিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। আমরা বহুকাল হইতে ছোট, খাট, বার, তের, পনর কোন, ত, মত, প্রভৃতি বহু শব্দ অকারান্ত করিয়া লিখিয়া আসিতেছি। কিন্তু কিছুদিন হইতে "ভারতী" ও "প্রবাসী" পত্রিকায় এই শব্দগুলি ওকারান্ত করিয়া লিখিত হইতেছে। শব্দগুলি যখন সংস্কৃতমূলক নহে, তখন সে গুলির উচ্চারণানুযায়ী বানান তেমন দোষের নহে বটে। কিন্তু শব্দগুলিতে ওকার যোগ করিতে যে শ্রম ও সময় ব্যয় হয়, তদনুরূপ কোন লাভ হয় কি? বিশেষতঃ আমরা যখন হই, হউক, করি, করুক, অপি, অনু, কপি, বপু প্রভৃতি শতসহস্র শব্দের অকারকে হ্রস্ব ও রূপে উচ্চারণ করি, অথচ বানানে তাহা ওকারে পরিবর্ত্তিত করি নাই, তখন কেবল শেষের অকারগুলিকেই কেন ওকার করিয়া দিব। এই শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটির অনুরূপ হলন্ত শব্দ আছে, যথা কোন, কোন্; মত, মত্, বার, বার্। পাছে শীঘ্র

অর্থবোধ না হয়, এইজন্য যদি বানানে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ হয়, তাহাহইলে হলন্তগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দিলেই হয়। কোন অক্ষরে ওকার যোজনা করা অপেক্ষা হসন্তের চিহ্ন দিতে সময় ও শ্রম কম লাগে। কোন চিহ্ন না দিলেও অর্থবোধ হইতে কতক্ষণ লাগে? এতৎ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা স্থানান্তরে বলিব।

এখন আমরা বাঙ্গলায় ব্যঞ্জনের প্রচুরতা-অপ্রচুরতার বিষয় আলোচনা করিব।

স্পর্শবর্ণের ঙ, ঞ এবং ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের উচ্চারণে মত-দ্বৈধ নাই। শিশুদিগকে বর্ণমালা শিখাইবার সময়ে ঙকে উঁঅ বা উঁঅ এবং ঞকে ইঁয় বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের প্রকৃত নাম শেখানই উচিত। ঙকারের সহিত গ যুক্ত হইলে রাঢ়-প্রদেশ ভিন্ন বঙ্গের অন্য স্থানে প্রায়ই ঙ্ঙ উচ্চারিত হয়—বঙ্গকে বঙ্ঙ এবং গঙ্গাকে গঙ্ঙা বলে। শ্রীকে বঙ্গ ও গঙ্গা, বগ্গ ও গগ্গা রূপে লিখিত হয়। জকারের সহিত যখন ঞ যুক্ত হয়, তখন সেই যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ কিছু কষ্টসাধ্য হয়। এই যুক্তবর্ণ উচ্চারণ করিতে বাঙ্গালীরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা উভয়েই ভুল করেন। বাঙ্গালীরা জ্ঞানকে গ্যাঁন বলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা বলেন দ্‌ন্যান। মহারাষ্ট্রের "জ্ঞানোদয় পত্রিকা"র নাম ইংরেজীতে Dnano-day রূপে লিখিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় যাজ্ঞা শব্দের চলিত উচ্চারণ যাগ্‌ঙা কিন্তু প্রায় যাঁঞা হওয়া উচিত। মূর্দ্ধণ্য ণ-কারের উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই। হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ট, ঠ, ড, ঢ, র উপরে থাকিলে আমরা ণ-কারের উচ্চারণ অনেকটা করিতে পারি ও করিয়া থাকি। বিদ্যানিধি মহাশয় ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, কণ্টক, কণ্ঠ এবং দন্ত শব্দের অনুনাসিক জিহ্বাকে যে স্থান স্পর্শ করাইয়া উচ্চারণ

করিতে হয়, অন্ত, পান্থ, মন্দ প্রভৃতি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বা তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থান অর্থাৎ দন্তমূল স্পর্শ করে। যাহা হউক, ণ ও ন'র মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অকিঞ্চিৎকর। দয়ানন্দ সরস্বতী ণ স্থানে ন-ই উচ্চারণ করিতেন।

স্পর্শবর্ণের অন্যগুলির কোন্‌টার কিরূপ উচ্চারণ সে বিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও কার্য্যত কোন কোন স্থানের লোক কোন কোন বর্ণকে অশুদ্ধভাবে উচ্চাচরণ করে। বঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে চ ও ছ স বা S রূপে এবং জ ও ঝ Z রূপে উচ্চারিত হয়। আসামের অনেক শিক্ষিতলোকও ঝ উচ্চারণ করিতে পারেন না। উপর-আসামে ট, ঠ, ড, ঢ এবং ত, স, দ, ধ এই বর্ণগুলি যথাক্রমে পরিবর্ত্তনীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। আমরাও যে কখন কখন সেরূপ না করি তাহা নহে—আমরা দাড়িম্বকে ডালিম এবং দ্বিদল অর্থাৎ দালকে ডাল বলি। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক কোন বর্ণের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না, চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া থাকে। আসামের মিরিরা কোন মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং হ উচ্চারণ করিতে পারে না। বাঙ্গালায় স্পর্শবর্ণের সংখ্যা সাতাশ; অতিরিক্ত অক্ষর দুইটি ড় ও ঢ়। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক এই দুইটা বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না—ড় কে বর্গীয় র বলে। কোন অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ না হইয়া যদি অন্য একটা অক্ষরের মত উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে সেই অক্ষরগুলিকে বিশেষিত করিবার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের সংস্কৃত ব্যাকরণে যে উচ্চারণ স্থান উক্ত আছে সেই স্থানের নাম দিয়া তাহাকে পরিচিত করিতে হয়। আমরা সেইজন্য দন্ত্য ন, মূর্দ্ধন্য ণ বলিতে বাধ্য হই। উপর-আসামে মূর্দ্ধণ্য ত এবং দন্ত্য ত বলে। মূর্দ্ধণ্য ত অর্থাৎ ট। অথবা দন্ত্য ট অর্থাৎ ত। আমরা বর্গীয় জ এবং অন্তঃস্থ জ এবং তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য শ এবং দন্ত্য

শ বলি। আসামীদের পাঁচটা স প্রথম স অর্থাৎ চ দ্বিতীয় স অর্থাৎ ছ, তালব্য স অর্থাৎ শ, মূৰ্দ্ধণ্য স অর্থাৎ ষ এবং দন্ত্য স।

স্পর্শবর্ণের পর অন্তঃস্থ ব। ইহা কখনও জ-রূপে কখনও য়-রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহাতে আকার দিয়া কখনও স্বরের আকারের ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত নহে। খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর য়া না হইয়া আ হওয়া উচিত। ইংরেজীতে বর্ণান্তরিত করিতে হইলে উহাদের স্থানে Khaou, jaoa ই লেখে, কিন্তু Khaoya, jaoya লিখিত হয় না। soda water কথাটা বাঙ্গালায় সোডাওয়াটার লিখিত হয়। ইহাও নিতান্ত অশুদ্ধ, কেননা ইংরেজী শব্দটায় য় কারের লেশমাত্র নাই। প্রাকৃত-ভাষার নিয়মানুসারে দুই স্বরের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়। সুতরাং সংস্কৃত গোপাল শব্দ প্রাকৃতে গোআল হয়। তাহার স্থানে বাঙ্গালায় গোআলা হয়। সুতরাং গোআল ও গোআলা কখনই গোয়াল ও গোয়ালা-রূপে লেখা উচিত নহে। এরূপস্থলে সম্পূর্ণ আ না লিখিয়া লুপ্ত-আকারের চিহ্ন অথবা Apostrophe লিখিয়া তাহার গায়ে আকারের দাঁড়ি (।) সংযোগ করিয়া দিলে লেখার সুবিধাও হয়। কেহ কেহ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের য়া স্থানে ও আ উচ্চারণ করেন। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নদী করতোয়াকে উত্তরবঙ্গের অনেক লোক করতোআ রূপে উচ্চারণ করেন। কিন্তু সেই সকল লোকই স্বচ্ছতোয়া শব্দের ঠিক উচ্চারণ করেন। ওকারের পর অকার হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং বাঙ্গালায়ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব ঠিক বর্গীয় ব এর মতই লেখা হইয়া থাকে। এই দুই বর্ণের উচ্চারণগত প্রভেদও বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ও ইংরেজী লিখিবার জন্য অন্তঃস্থ ব কারের পৃথক্ আকার থাকা নিতান্ত উচিত। সে জন্য কোন নূতন সৃষ্টি না করিয়া দেবনাগরের অন্তঃস্থ ৰ বাঙ্গলায় প্রচলিত করিলেই উত্তম হয়।

বাঙ্গালায় তালব্য শ কারের যেরূপ উচ্চারণ আমরা করিয়া থাকি, সেইরূপ উচ্চারণ হিন্দুস্থানীরাও করেন। মহারাষ্ট্রীয়দের উচ্চারণও প্রায় তদ্রূপ। মহারাষ্ট্রীয়েরা মূর্দ্ধন্য ষ কারের যে উচ্চারণ করেন, আমাদের পক্ষে তাহা কিছু কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাহা তালব্য শকারের উচ্চারণের এতই অনুরূপ যে, তাহার পৃথক্‌রূপ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা যে দন্ত্য স কারকে তালব্য শ-রূপে উচ্চারণ করি, ইহা বড়ই দোষের কথা। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এই অক্ষরের প্রাকৃত উচ্চারণ শিখাইয়া দিয়া স্কুলে কথা কহিবার সময়ে সেইরূপ উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা উচিত। সেরূপ না করিলে আমাদের দেশের পতিত উচ্চারণের উদ্ধার হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গের এবং আসামে শ, ষ, এবং স এই তিনটাই অনেক স্থলে হ উচ্চারিত হয়। পশ্চিমদেশীয় এবং হাস্যরসপ্রিয় কবি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বদেশীয় লোকে "শতায়ুর্ভব" বলার পরিবর্ত্তে "হতায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন; সুতরাং পূর্ব্বদেশীয়দের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে না।

আশীর্ব্বাদ ন গৃহ্ণীয়াৎ পূর্ব্বদেশনিবাসিনাম্।
শতায়ুরিতে বক্তব্যে হতায়ুরিতে ভাষিণাম্॥

পূর্ব্ববঙ্গে শ, ষ, স স্থানে হ এবং হ স্থানে অ উচ্চারিত হয়।

শ, ষ ও স স্থানে হ বলা, হ স্থানে অ বলা, এবং চ, ছ, শ, ষ স্থানে স বলা, যেমন অন্যায়, দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ বলা তেমনই অন্যায়। কিন্তু যে সকল শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বানানেরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় সংশোধন আর হইবে না। আসামে অনেক শব্দের শ, ষ, স স্থানে হ লিখিত হয়। আশ্বিনকে আহিন, বৈশাখকে বহাগ; আষাঢ়কে অহার, পৌষকে পুহ; হাঁসকে হাঁহ, মাসকে মাহ বলে।

বাঙ্গলায়ও কোন কোন শব্দের স স্থানে হ লিখিত ও উচ্চারিত হয়। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

উপরে যে সকল বর্ণের বিবরণ দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন তিনটি উচ্চারণ-জ্ঞাপক চিহ্ন বাঙ্গলায় আছে তাহা অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু। ইহাদের মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় হয় না। অনুস্বার বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং আসামে ও মিথিলায় ঙ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর প্রায় অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে কোন লঘুস্বর গুরু হয় না কিন্তু অনুস্বারযুক্ত হইলে লঘুস্বর গুরু হয়। শব্দের শেষের বিসর্গ বাঙ্গলায় মোটেই উচ্চারিত হয় না। এই সমস্ত বিসর্গ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। অনেক বিসর্গের ব্যবহার ইতিমধ্যেই উঠিয়া গিয়াছে। তেজ, মন, ছন্দ, স্রোত, প্রায়, রক্ষ, বক্ষ প্রভৃতি শব্দে এখন আর বিসর্গ দেখা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, বস্তুতঃ কার্য্যতঃ প্রভৃতি শব্দে এখনও বিসর্গ ব্যবহৃত হয়। এগুলি উঠাইয়া দিলে লাভ বই ক্ষতি হয় না। চন্দ্রবিন্দুর প্রচলন বোধ হয় অল্পদিন হইয়াছে। কেননা আমরা প্রাচীন পুস্তকে চাঁদের পরিবর্ত্তে চান্দ, কাঁদিলর পরিবর্ত্তে কান্দিল দেখিতে পাই। পূর্ব্ববঙ্গের লোক চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করিতে পারেন না। অন্যপক্ষে রাঢ়ে ও আসামে চন্দ্রবিন্দুর বড় বাহুল্য।

বাঙ্গলা বর্ণমালায় যে সকল উচ্চারণজ্ঞাপক বর্ণ আছে, তাহাদের কথা নিঃশেষে বলা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ হয় না। আসামের উচ্চারণ-সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশের স্কুলে বাঙ্গলা উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রদিগকে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইয়া দিয়া স্কুলের মধ্যে কথা কহিবার সময়ে সেই সেই উচ্চারণ করিতে পদ্মকে পদ্‌ম বলিতে, ভিক্ষাকে ভিক্‌ষা বলিতে

অন্তঃস্থ বকে য বলিতে বাধ্য করা উচিত। পূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কাশ্মীরকে কাশ্‌শীঁর বলিতেন। যদি সেই উচ্চারণটার সংশোধন উচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে পদ্‌ম উচ্চারণ প্রচলিত হইবে না কেন? আসামীরা সাহেব শব্দটার স স্থানে চ লিখিয়া থাকেন, আমরা বাঙ্গলায় Shakespear লিখিতে সেক্ষপীর লিখিয়া থাকি। এ উভয়ই সমান অন্যায়। যদিও আসামীরা চকে স-রূপে উচ্চারণ করেন এবং আমরা দন্ত্য সকে তালব্য শ রূপে উচ্চারণ করি, তথাপি যখন চ ও শ এর একটা স্বীকৃত উচ্চারণ আছে এবং দন্ত্য স ও তালব্য শ উচ্চারণ করিবার স্বীকৃত স্বতন্ত্র বর্ণ আছে তখন সাহেব ও সেক্‌স্‌পিয়ার লিখিতে কখনই চাহাব ও সেক্ষপীর লেখা উচিত নহে। Parcel শব্দটা বাঙ্গলায় তালব্য শ দিয়া লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত কারণে দন্ত্য স দিয়া লেখা উচিত। ইংরেজী Stamp, Station, fast প্রভৃতি বহু st যুক্ত শব্দ আমরা বাঙ্গলায় সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সেগুলির উচ্চারণও ইংরেজীর মতই করি। কিন্তু লিখিবার সময়ে আমরা মূর্দ্ধণ্য ষ এর নীচে ট দিয়া থাকি। মূর্দ্ধণ্য ষকারের পরিবর্ত্তে সেই সকল স্থানে দন্ত্য স হওয়া উচিত। হিন্দীতে দন্ত্য সই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত।

কতকগুলি ধ্বনি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বর্ণ বাঙ্গলায় নাই। যথা ইংরেজী F. V. Z. ZH.। ঘড়ীটা Fast, violet রঙ্গ, Zebra, Leisure প্রভৃতি শব্দ আমরা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই কয়েকটিই মিশ্রধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। ফ'এ ব ফলা দিয়া দ্রুত উচ্চারণ করিলে E উচ্চারিত হয়। হিন্দুস্থানীরা F স্থানে ফর নীচে একটা বিন্দু দিয়া থাকেন। বাঙ্গলায়ও সেই চিহ্নই প্রচলিত হওয়া উচিত। সেইরূপে ভ এ ব ফলা দিলে অন্তঃস্থ বকারের সহিত হ যুক্ত হইলে V উচ্চারিত হয়। দেবনাগরের

দন্ত্যৌষ্ঠ ব বাঙ্গলায় গৃহীত হইলে তাহার নীচে একটা বিন্দু দিয়া V ধ্বনি প্রকাশ করা যাইতে পারে। নতুবা ভ এর নীচে বিন্দু দিয়াও সেই কার্য্য হয়। অন্তঃস্থ ব এবং V র উচ্চারণ এক নহে। V মহাপ্রাণ কিন্তু ব অল্পপ্রাণ। হিন্দুস্থানীরা কিন্তু অপরিবর্ত্তিত ব দ্বারাই V জ্ঞাপন করেন। Z সম্বন্ধে গ্রীক-বৈয়াকরণেরা বলেন যে, দন্ত্য স র সহিত দ যুক্ত হইলে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। আমার বোধ হয় দন্ত্যস র সহিত যে কোন বর্গের তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হইলে Zএর উচ্চারণ হয়। সুতরাং দন্ত্যসকারের নীচে বিন্দু দিয়া Z প্রকাশ করাই সমীচীন। কিন্তু Zএর সহিত যখন বর্গীয় জকারের উচ্চারণের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং যখন হিন্দীতে জকারের নিম্নে বিন্দু দিয়াই Zএর ধ্বনি প্রকাশ করা হয় তখন আমাদেরও তাহাই করা কর্ত্তব্য। Z H ধ্বনিসম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, মূর্দ্ধণ্য যকারের সহিত যে কোন বর্গের তৃতীয় বর্ণ অথবা ব যোগ করিলে মূর্দ্ধণ্যষ Z H রূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং মূর্দ্ধণ্য যকারের নীচে বিন্দু দিয়াই এই ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত।

এখন সাধারণতঃ বানান-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকের মত এই যে, সমস্ত শব্দের বানান আমাদের উচ্চারণানুযায়ী হওয়া উচিত। ইহাতে আমারও অমত নাই। বানানের পরিবর্ত্তনে যদি অর্থ-বোধের ব্যাঘাত না হয়, যদি প্রতিবেশীগণের উপহাসাস্পদ হইতে না হয়, যদি শ্রম ও সময়ের লাঘব হয় এবং যদি নব প্রবর্ত্তিত বানান ঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করে, তাহা হইলে যে সকল শব্দের উচ্চারণ সমগ্র বঙ্গদেশে এক সেই সকল শব্দের বানান উচ্চারণানুযায়ী করাই উচিত। অনেক বাঙ্গলা শব্দের বানান বহুদিন হইতে এইরূপ উচ্চাচরণানুসারে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দীতে উনসত্তর, একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর প্রভৃতি শব্দ উন্‌হত্তর, একহত্তর, বাহাত্তর, তিহত্তর প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত ও লিখিত

হয়। এই সকল শব্দের শোবার্দ্ধ হত্তর, সত্তর শব্দের রূপান্তর, সত্তরের স স্থলে হ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় কেবল বাহাত্তর শব্দে হ আছে কিন্তু অন্ত গুলিতে হকার মহাপ্রাণতা হারাইয়া আকারে পরিণত হইয়াছে। কি "হ" কি "আ" উভয়েই সকারের উচ্চারণস্থানীয়। যদি কোন শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাহইলে এইরূপ পরিবর্ত্তনই হওয়া উচিত। ইহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত নাই; লিখিবার অসুবিধা নাই। পরিবর্ত্তনও ঠিক উচ্চারণানুযায়ী। কিন্তু বড়কে ওকারান্ত করিয়া লিখিলে আমাদের সেরূপ সুবিধা হয় না। তাহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হয় না বটে কিন্তু শেষবর্ণে ওকার যোজনা করিতে সময় ও শ্রমের প্রয়োজন। তাহার পর যে ওকারটার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহারই কি প্রকৃত উচ্চারণ হয়? কখনই হয় না। ওকার একটি দীর্ঘস্বর। বাঙ্গলায় যে হ্রস্ব-ওকারের ধ্বনি আছে তাহা ওকারের বিকৃত হ্রস্ব-উচ্চারণ। বড় শব্দে ওকারের যে ধ্বনি আছে, তাহা ওকারের সেই বিকৃত হ্রস্ব উচ্চারণ। যদি স্বাভাবিক ত্যাগ করিয়া নব-প্রবর্ত্তিত বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চারণই গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পুরাতন বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চারণ থাকাই ভাল। বড় শব্দের শেষ আকারের যে ওকারবৎ বিকৃত ধ্বনি আছে তাহা অন্ত, কল্য, হই, গরু প্রভৃতি শত-সহস্র শব্দে আছে ইহা আমি পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

আর একটা নব প্রবর্ত্তিত বানানের কথা বলিতেছি। প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় দেখিতে পাই কেহ কেহ "কি" শব্দটা দীর্ঘ-ঈকার দিয়া লেখেন। কিন্তু আমি উপরে দেখাইয়াছি যে ঝি, ঘি, ছি, স্থির, তিন প্রভৃতি সমস্ত একস্বরবিশিষ্ট শব্দের হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ রূপে উচ্চারিত হয়। যদি "কি" কে দীর্ঘ ঈ দিয়া লিখিতে হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত শব্দই দীর্ঘঈকার দিয়া লেখা উচিত।

তাহার পর যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক সেগুলিকে আমাদের বিকৃত উচ্চারণানুযায়ী বানান করিলে বিষম গোলযোগ হইবে। দন্ত্য "স" যুক্ত সকল শব্দের অর্থ সমস্ত, তালব্য শ যুক্ত সকলের অর্থ খণ্ড। দন্ত্য স যুক্ত সুর শব্দের অর্থ দেবতা, তালব্যশ যুক্ত শূর শব্দের অর্থ বীর। এই শব্দগুলির একই বানান হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা দন্ত্য সকে তালব্যশ রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া যদি আমরা আমাদের জাতিকে তালব্য শ দিয়া শ্বজাতি লিখি অথবা Self reliance এর বাঙ্গলা যদি তালব্য শ দিয়া শ্বাবলম্বন লিখি তাহা হইলে আমরা কেবল আমাদের প্রতিবেশী অন্য ভারতবাসীর নহে কিন্তু আমাদের নিজেদের চক্ষেও বড় কৃপার পাত্র হইব।

সুতরাং সংস্কৃত শব্দের বানান কোনমতেই পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। বরং আমাদের উচ্চারণেরই যথাসম্ভব সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ের কোন বাঙ্গালীরই settled fact এর দোহাই দিয়া এই প্রস্তাবটি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

তাহাহইলে বাকী রহিল খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ। সেগুলির বানান যেখানে সম্ভব সেখানে উচ্চারণানুযায়ী করা উচিত। সেইজন্য আমি যাওয়া, খাওয়া, সোডাওয়াটার, ষ্টেশন, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি শব্দের অশুদ্ধ বানানের সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছি।

বাঙ্গলাভাষার শুদ্ধাশুদ্ধতা।

বানান ব্যতীত অন্য কারণেও ভাষা শুদ্ধ বা দোষযুক্ত হয়। এখন তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ইংরেজেরা নিজের ভাষা কত সাবধান হইয়াই বলেন ও লেখেন। তথাপি যদি কোন লেখক অসাবধানে বা অজ্ঞানতাহেতু কোন অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে অবিলম্বেই

তাহার সমালোচনা হয়। বাঙ্গলায় সেরূপ সমালোচনা প্রায়ই হয় না। কত শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ চলিয়া যাইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের ভুল যদি ধরিয়া দেওয়া না যায় তাহা হইলে অল্পশিক্ষিত লোকে সেই ভুলকে শুদ্ধ ভাবিয়া তাহার অনুকরণ করে। সুতরাং ভাষার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। বাক্শুদ্ধি পণ্ডিতদিগকে পূত ও বিভূষিত করে। একজন পাদ্রী সমস্ত সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া রবিবারের উপদেশ (Sermon) প্রস্তুত করেন। তাঁহারা উপদেশকালে এবং ব্যারিষ্টারেরা আদালতে বক্তৃতা করিবার সময়ে যেরূপ উচ্চারণ করেন তাহাই অপর সাধারণের আদর্শ হয়। পূর্ব্বে কোন বানানের পরিবর্ত্তন যত দিন Times পত্রিকা স্বীকার না করিতেন ততদিন সাধারণকর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইত না। এখনও Times এর সেই প্রাধান্য আছে কিনা জানি না। কিন্তু Times পত্রিকাও হঠাৎ কোন একটা বানানের পরিবর্ত্তন করিলে তাহারও প্রতিবাদ হইত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও ভাষাবিষয়ে বড় সাবধান ছিলেন। দেবস্থানে যাইবার সময়ে চিত্তশুদ্ধির সহিত শরীর, বস্ত্র এবং বাক্শুদ্ধিও আবশ্যক মনে করিতেন। এই জন্য স্নান করিয়া, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া সংস্কৃতস্তোত্র পাঠ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা এমনই ভাবুকতা বিবর্জ্জিত হইয়াছি যে, আমরা উপাসনা-গৃহে যাইবার সময়ে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করি না। যাহা পরিয়াছিলাম তাহাই পরিয়া যাই। এবং না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি। তাহা বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ একবারও মনে ভাবি না। এখনকার কোন আচার্য্যই উপাসনা-বেদী হইতে সাধুভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক দেশের সর্ব্বপ্রধান কবি ও চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও প্রার্থনার সময়ে বাস্তবিক অর্থে "সত্যকার" এই স্ত্রৈণ এবং অশুদ্ধ শব্দটা বলিতে শুনিয়াছি। কলিকাতা-

অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা বাস্তবিক এই অর্থে "সত্তিকার" বলিয়া থাকেন। রবীন্দ্রবাবু সেই অদ্ভুত শব্দটাকে একটা সংস্কৃত আকার দিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অন্যান্য লেখকের আরও দুই-চারিটা ভ্রান্ত-প্রয়োগ দেখাইতেছি।

কয়েকস্থানে "কায়াদান" "কায়াধারণ" প্রভৃতি কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু এই কথাগুলি অশুদ্ধ। সংস্কৃতে কায়া নামে কোন শব্দ নাই। কায়মনোবাক্য, কায়েন মনসাবাচা, কায়ক্লেশ প্রভৃতি কথা হইতে আমরা জানি যে কায় শব্দ সংস্কৃতে অকারান্ত। সংস্কৃত অকারান্ত বহু শব্দ বাঙ্গলায় আকারান্ত হইয়া যায়, যথা গল স্থলে গলা, স্বর্ণ স্থলে সোনা, রৌপ্য স্থলে রূপা ইত্যাদি। কায়া শব্দও সেইরূপে কায় হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বাঙ্গলা শব্দ সংস্কৃতের সহিত মিলিয়া সমাস হইতে পারে না। সংস্কৃতে-সংস্কৃতে সমাস হয়, বাঙ্গালায় বাঙ্গালায়ও হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতে বাঙ্গলায় হয় না। যেমন সোনালঙ্কার, রূপাপাত্র, গলাদেশ হয় না কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যপাত্র, গলাধাক্কা হয়। সেইরূপ কায়াধারণ বা কায়াদান হইতে পারে না।

চওড়া বা আয়ত অর্থে প্রশস্ত শব্দের ভ্রান্ত-ব্যবহার হইতে বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অব্যাহতি পান নাই।

এক পত্রিকায় এক প্রবন্ধলেখক কোন বনদেশ সুগন্ধে মুখরিত হওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন। সুগন্ধে সুশ্রাব্য ও সুরঞ্জিত লিখিলে আরও ভাল হইত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগকে দাক্ষিণাত্য বলা বাঙ্গালীদিগের একটা রোগ হইয়াছে। সেই দেশের সংস্কৃত নাম দক্ষিণ এবং দক্ষিণাপথ। দক্ষিণদেশে বা দক্ষিণদিকে যাহা জন্মে তাহাই দাক্ষিণাত্য। দাক্ষিণত্য ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য আচার-ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু দাক্ষিণাত্যদেশ হইতে পারে না।

দেশকে দাক্ষিণাত্যও বলা যাইতে পারে না। হরিভট্ট শাস্ত্রী মানিকর নামক একটি মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে এই ভুলটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত ভূগোলে এই ভুলের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাহা হইতেই ইহার সার্ব্বভৌম বিস্তার হইয়াছে। যদি দক্ষিণদেশকে দাক্ষিণাত্য বলা যায় তাহা হইলে এই দেশকে অত্রত্য এবং সেই দেশকে তত্রত্য বলা যাইতে পারে। আমরা যদি অত্রত্য হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া এবং তত্রত্য হইতে পাশ্চাত্য, পৌলস্ত্য এবং প্রাচ্য ঘুরিয়া আবার অত্রত্যে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইতে পারে বটে কিন্তু শব্দগুলির ভ্রান্ত-প্রয়োগের দোষ ক্ষালিত হয় না।

যথেষ্ট শব্দের অর্থ যত প্রয়োজন। কিন্তু এই শব্দটা বহু পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই।

সমর্থ অর্থে সক্ষম শব্দের ব্যবহার এক অদ্ভুত কার্য্য। ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রচারককে আবার ইহার উপর অক্ষম অর্থে অসক্ষম বলিতে শুনিয়াছি।

স্বর্গগত বা পরলোকগত অর্থে স্বর্গীয় শব্দের ব্যবহারও দুষ্ট-প্রয়োগ।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা।

যাহা হউক এ সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়। বাঙ্গলা ভাষা,সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ভদ্র ও শিক্ষিত লোক সাধুভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় পুস্তক, পত্র, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র সাধারণতঃ লিখিত হয় সেই ভাষায় কথা কহেন না। আর কোন সভ্যদেশেই বোধ হয় এরূপ নহে। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা-ভাষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত কথোপকথনের সময়ে বাক্‌শুদ্ধি-বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ধর্ম্মালয়ে এবং আদা-

লতের ভাষার ত কথাই নাই ইংরেজেরাও ঠিক সেইরূপ করেন। জর্ম্মানিতে লিখিত ও কথিত ভাষার প্রভেদ ছিল ; এখন সকল ভদ্রলোকেই কথাবার্ত্তায় লিখিত ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক ধর্ম্মালয়েও সাধুভাষা শ্রুত হয় না। সাধুভাষা কথোপকথনে প্রচলিত হওয়া উচিত কি চলিত ভাষা লেখায় প্রচলিত হওয়া উচিত এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে যত লোকের সমালোচনা পাঠ করিয়াছি তাঁহারা কেহই ভাষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। সকলেই বস্তুর নাম-বিষয়ে যথাচলিত ভাষায় পুষ্করিণী বলা হইবে, না লিখিত ভাষায় পুকুর লেখা হইবে ইহা লইয়া বিচার করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় বস্তুর নামের উপর ভাষা নির্ভর করে না। একটা অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ হউক বা শ্বেতবর্ণ হউক, স্থূল হউক বা কৃশ হউক, বলিষ্ঠ হউক বা দুর্ব্বল হউক অশ্বই থাকে। সুতরাং অশ্বে এমন কোন অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে যাহার উপর অশ্বত্ব নির্ভর করে। সেই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু অশ্বের কঙ্কাল। সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই ভিন্নরূপ কঙ্কাল আছে। প্রত্যেক ভাষায়ও সেইরূপ কঙ্কাল আছে যাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ইহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। জিঅগ্রাফি, ফিলসফি, প্রভৃতি গ্রীক্ শব্দ আরবী ও পারসী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র প্রভৃতি গ্রীক-শব্দ, ঘোটক, ঘট, গঠন, প্রভৃতি দ্রাবিড়-শব্দ ; আরবী হইতে দ্রেক্কাণ শব্দ, Venice হইতে বণিজ বা বণিক্ শব্দ, Phoenicia হইতে পণ্য শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশলাভ করিয়াছে ! লণ্ঠন, রেল, দলীল, বিছানা, আদালত প্রভৃতি শত শত ইংরেজী ও পারসী শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষত্ব কিছুমাত্র নষ্ট

হয় নাই। লাটিন, গ্রীক, সেকসন, আরবী, সংস্কৃত এবং অন্য বহুভাষা হইতে বহু শব্দ পরিবর্ত্তিত বা অপরিবর্ত্তিতভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা যাহা ছিল তাহাই আছে ও থাকিবে। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী জানেন তাঁহারা বাঙ্গলা বলিবার সময়ে অনেক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই মিশ্রভাষার প্রত্যেক পদই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তনীয় নহে। "তিনি আমাকে মারিয়াছেন" এই বাক্যটি মিশ্র-ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না। "তোমার ভাই কলিকাতায় গিয়াছেন" ইহার মিশ্র বাঙ্গলা হয়, "তোমার brother Calcuttaয় গিয়াছেন।" এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, মিশ্র-ভাষায় প্রধানতঃ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। প্রধানতঃ নাম ও বিশেষণই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; ইহা যে কোন বাঙ্গলা-ভাষার বিশেষত্ব তাহা নহে। প্রত্যেক ভাষারই ক্রিয়াপদ সর্ব্বনামযোজক-বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি লইয়া কঙ্কাল প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাই ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে। ম্যাক্স্‌-মুলর বলেন, "It matters not how many words may be derived in common from another language. It does not prove the identity of any two diabcts. It is the grammer wre must look to, to decide their identity." সুতরাং যদি বস্তুর ভিন্নদেশীয় নামই বাঙ্গলায় প্রচলিত হইতে পারিল, তখন প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন নামও কখন কখন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকে হয়ত "destroy করা" "prove করা" প্রভৃতি দেখিয়া বা শুনিয়া হঠাৎ ভাবিতে পারেন যে, ইংরেজী ক্রিয়াপদও মিশ্র-বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এইরূপ কথাগুলি ইংরেজী ক্রিয়া-জ্ঞাপক শব্দকে বাঙ্গলার ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইংরেজী ক্রিয়াপদ বাঙ্গলায় এবং

বাঙ্গলা ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে অপরিবর্ত্তিতভাবে কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

সর্ব্বনামের নানা আকার বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। যথা তিনি, তেঁও, তানি, তাঁহারা, তাঁরা, তানরা, তিনিরা, তেনরা, তাঁহাকে, তাঁকে, তিনিকে, তাঁক, তেঁওক, তাঁহার, তাঁর, তিনির, তেনার, তেঁওর, তাঁহাদের, তাঁহাদিগের, তাঁদের, তানাদের, তেনরায়, তিনিরার। উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামেও সেই প্রকার নানারূপ আছে। এই সমস্ত রূপের মধ্যে তাহাদের সাহিত্যিকরূপ বহুদিন হইল স্থির হইয়া গিয়াছে। আইডিয়াল না হইলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক কথা কহিবার সময়েও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবল কথোপকথনে আমাদিগের, তোমাদিগের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগের প্রভৃতি এবং রাঢ়ের আমাদিগকে, তোমাদিগকে প্রভৃতি শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না।

ক্রিয়াপদেরও সাহিত্যিক আকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক লেখকের লেখায় বোধ হয় যে, তাঁহারা সে আকার ভাঙ্গিয়া ক্রিয়াপদ-গুলির নূতন আকার দিতে চাহেন। এইরূপ করা উচিত কিনা, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এক একটা ক্রিয়াপদের কত প্রকার রূপ বঙ্গ-দেশে প্রচলিত আছে, তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সাহিত্যিক খাইলাম পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেলাম, খেলেম, খা'লেম, খালাম, খেলোম, খেনুম, খেনু, খালি, খালু। সাহিত্যিক খাইব পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খাব, খাবো, খামু, খাইতাম, খাম। সাহিত্যিক খাইতাম পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতাম, খেতেম, খেতুম, খালু হয়, খালু-হেতেন। সাহিত্যিক খাইতেছি পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতেছি, খাচ্চি, খা'তেছি, খাইআছুঁ। এইরূপে প্রত্যেক ধাতুরই প্রত্যেক কালে এবং প্রত্যেক পুরুষে নানাপ্রকার রূপ হইয়া থাকে। এখন সমস্যা

এই যে, দেশে এই জন-শিক্ষার আরম্ভ সময় হইতে ক্রিয়াপদের প্রাদেশিক কোন একরূপ লিখিত ভাষায় এবং কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবে, না সাধু ভাষার রূপেরই সর্ব্বত্র প্রচলন হইবে? প্রত্যেক প্রদেশের লোক সেই প্রদেশের চলিত ভাষায় কথা কহিবেন বা লিখিবেন এরূপ মত প্রকাশ করিতে বোধ হয় কেহই সাহস করিবেন না। কেননা সেরূপ হইলে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোকের ভাষা বুঝিতেই পারিবেন না। কেবল ইহাই নহে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সামান্য সদ্ভাবও স্থাপিত হইবে না। যদি বলা যায় যে, কেবল কলিকাতার প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সকলের ব্যবহার করা উচিত, কেননা কলিকাতাই বঙ্গদেশের রাজধানী। তাহা হইলে সকলেরই স্মরণ করা উচিত যে, এখন বঙ্গদেশে দুইটি রাজধানী হইয়াছে। একটি কলিকাতা, একটি ঢাকা। তবে কি বঙ্গদেশে দুইটা ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত? কখনই নহে। বিশেষতঃ কলিকাতার ভাষা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রঙ্গপুর, রাজশাহী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের কথা দূরে থাকুক, নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধমান বীরভূমের লোকেও আয়ত্ত করিতে পারে না। আর একটা কথা এই যে, এক প্রদেশের বস্তুরই আদর হইবে, অন্য প্রদেশের বস্তু বাজারে বিকাইবে না, তাহাই বা অন্য স্থানের লোকে পছন্দ করিবে কেন? এরূপ অসন্তোষ ও ঈর্ষ্যা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং কলিকাতার ভাষা সাহিত্যে প্রচলনের প্রস্তাব সাধারণতঃ কেবল যে হৃদ্য হইবে না এরূপ নহে; যাঁহারা আন্তরিক ভাবে এই প্রস্তাব করিবেন তাঁহারা নূতনরূপে বঙ্গ-বিভাগের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া দেশের শত্রুরূপে পরিগণিত হইবেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্যই মনোভাব ব্যক্ত করা। তাহা যত অল্প কথায় হয় তাহাই ভাল। এই হিসাবে খাইতেছি ও খাইলাম অপেক্ষা

খাচ্চি ও খেলুম ভাল। কেননা প্রথম দুইটি শব্দে যথাক্রমে চারিটা ও তিনটা স্বর, শেষ দুই শব্দের প্রত্যেক টাতেই দুইটা স্বর, এবং সেজন্য শেষ দুইটি উচ্চারণ করিতে অল্প সময় ব্যয়িত হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধি যদি অল্প ব্যয়ে হয়, তাহা হইলে সে জন্য অধিক ব্যয় করা নির্ব্বুদ্ধিতা, তাহা অর্থব্যয়ই হউক আর সময়-ব্যয়ই হউক। কিন্তু মনুষ্যের কোন উদ্দেশ্যই অমিশ্র নহে—অমিশ্র হওয়া উচিতও নহে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র সেই প্রয়োজন পশু চর্ম্মদ্বারা, অগ্নিদ্বারা, শীতল জল দ্বারা এবং আরও নানা উপায়ে সাধিত হইতে পারে। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণেরা করিয়াও থাকে তাহাই। কিন্তু সমস্ত মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিতই অন্য বহুভাব মিশ্রিত থাকে—সৌন্দর্য্যের ভাব, সময় ও স্থানের উপযোগিতা, প্রতিবেশীগণের মতের প্রতি মর্য্যাদা। ভাষাতেও এ সকল বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। তবে খাচ্চি ও খেলুম সুন্দর কি খাইতেছি ও খাইলাম সুন্দর ইহা কেহই যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারে না। এদেশে ফ্রেঞ্চ-একাডেমির মত কোন সমিতি নাই, যাহার মতের প্রতি সকলেরই আস্থা হইতে পারে। তবে প্রণিধান করিতে হইবে যে খাচ্চি ও খেলুম এক প্রদেশের স্বভাবজাত শব্দ কিন্তু খাইতেছি ও খাইলাম কোন প্রদেশরই কথা নহে। সকল প্রকার ক্রিয়াপদ উপেক্ষা করিয়া সমগ্র দেশের লোকের সম্মতিক্রমে যখন এইরূপ পদ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে তখন দেশের লোক এই গুলিকেই সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে। সুতরাং সাহিত্যে ত ইহাদের ব্যবহার হইবেই অন্যান্য বিশিষ্ট কার্য্যেও হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণ চিরকাল সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহাদের যে ভাষা-বিষয়েও সৌন্দর্য্যবোধ ছিল তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন

না। তাঁহারা যখন এইরূপ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন তখনই বুঝিতে হইবে যে এই গুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক সৌন্দর্য্য আছে। তাহার পর স্থান ও সময়ের উপযোগিতা। যে ভাষা হাটে-বাজারে ও ক্রীড়াস্থানে এবং আমোদপ্রমোদের সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গকালে, উপাসনা-গৃহে এবং সাহিত্যে যদি তাহার অপেক্ষা ভালভাষা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতে পারি তবে তাহাই করা উচিত। যে পরিচ্ছদে নিমন্ত্রণ খাইতে যাই, নাচ দেখিতে যাই, সে পরিচ্ছদে রাজ-সন্দর্শন করিতে যাইবার চেষ্টা করিলেও বাধা পাইতে হয়। ইহার পর প্রতিবেশীর মতের প্রতি মর্য্যাদার কথা। আমি যদি কেবল আমার নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি-দৃষ্টি রাখিয়া এমন একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই যে, তাহাতে আমার প্রতিবেশীগণের বাতালোকের ও গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে যেমন আমার তদ্রূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উচিত নহে সেইরূপ যে ভাষা আয়ত্ত করা কলিকাতা ব্যতীত অন্য স্থানের লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ও অসাধ্য, সাহিত্যে সেই ভাষার প্রচলনের চেষ্টা করাও অন্যায়।

প্লেটো বলেন যে স্বর্গে একটা আইডিয়াল ত্রিকোণ ক্ষেত্র আছে, যাহা সমকোণও নহে, স্থূলকোণও নহে, সূক্ষ্মকোণও নহে; সমবাহুও নহে, সমদ্বিবাহুও নহে, অসমবাহুও নহে। খাইলাম ও খাইতেছি রূপের ক্রিয়া-পদ লইয়া আমাদের ভাষাটা সেইরূপ আইডিয়াল হইয়াছে। আইডিয়াল শব্দটা গ্রীক-ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জানি না। আদর্শ বলিলে হইতে পারে না। কেননা অনুকরণ করিবার জন্য যাহা সম্মুখে রাখা যায় তাহাই আদর্শ বা মডেল। এই আদর্শ আইডিয়াল নাও হইতে পারে। আইডিয়াল শব্দের অর্থ "যেরূপ হওয়া উচিত বলিয়া কল্পিত হইতে পারে সেইরূপ।"

বাঙ্গালী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহেন না। তাঁহার ভাষা সুতরাং প্রাদেশিক হইতে পারে না। কি আসামে, কি পঞ্চনদে, কি

ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, বাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীতে কিছু আইডিয়াল না থাকিলে তাঁহার সেরূপ প্রতিপত্তি কখনই হইত না। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালীর চরিত্রের অনুরূপ। যে ভাষা রাঁচি হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে তাহাকে অনেকটা আইডিয়াল হইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং আসামে উচ্চারণানুযায়ী বানান হয় কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ হয় না। ইহার কারণ এই যে, হিন্দী ও আসামী ভাষার বিস্তার লাভের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস নাই কিন্তু বাঙ্গালার সেই প্রয়াস বিলক্ষণ আছে। এইজন্যই বাঙ্গালা ভাষা উচ্চারণানুরূপ বানান লিখিয়া এবং সাহিত্যে কোন প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া সঙ্কীর্ণ হইতে পারে নাই।

ভাষায় কৃত্রিমতা।

কিন্তু যে ভাষার প্রচলন কোন প্রদেশেই নাই তাহা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলিয়া আপত্তি ও আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কার কোন কারণ নাই। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই অস্বাভাবিক নাই। বাবুই যে নীড় নির্ম্মাণ করে, মধুমক্ষিকা যে চক্র নির্ম্মাণ করে, বীবর এবং শূকর যে গৃহ নির্ম্মাণ করে সেগুলিকে কেহ অস্বাভাবিক বলে না। কিন্তু মনুষ্য যে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করে তাহা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত হয়। বাবুই মধুমক্ষিকা, বীবর ও শূকর যে বুদ্ধিদ্বারা স্ব স্ব আবাস প্রস্তুত করে সে বুদ্ধিও যেমন স্বভাবলব্ধ মানুষ যে বুদ্ধিদ্বারা ইষ্টকালয় প্রস্তুত করে তাহাও তেমনই স্বভাবলব্ধ। সুতরাং মানুষ যাহা কিছু করে তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি মানুষ বুদ্ধিদ্বারা যাহা করে তাহাকেই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বলে। আমিও

সেই অর্থেই কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা শব্দ ব্যবহার করিব। মনুষ্যের সভ্যতার নামান্তরই কৃত্রিমতা। আমরা বস্ত্র পরিধান করি, গৃহ নির্ম্মাণ করি, বিদ্যাশিক্ষা করি, ঔষধ প্রস্তুত করি, রেলে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করি এ সমস্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। এত কৃত্রিমতার মধ্যে আমাদের ভাষায় কিছু কৃত্রিমতা থাকিলে আশঙ্কার বিষয় নাই। কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বস্তু শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় একথাটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কৃত্রিমতা দ্বারাই স্বভাব জয় করা যায়। স্বাভাবিক বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করার নামই কৃত্রিমতা। স্বভাবের সৌন্দর্য্য রচনা করিবার ক্ষমতা নাই, স্বভাবের নীতিজ্ঞান নাই, স্বভাবের দয়ামায়া নাই, স্বভাবের শক্তি স্থিতিশীল এবং সীমাবদ্ধ।

বকল বলেন—The powers of nature, notwithstanding their apparent magnitude, are limited and stationary ; at all events, we have not the slightest proof that they have ever increased or that they will ever be able to increase. But the powers of man,-so far experience and analogy can guide us, are unlimited ; nor are we possessed of any evidence which authorises us to assign even an imaginary boundary at which the human intellect will of necessity be brought to a stand.

যে বাড়ীটা যত কৃত্রিমভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই তত অধিক দিন স্থায়ী হইবে। অধিক কৃত্রিমতাই তাজমহলের আদর ও স্থায়িত্বের কারণ। ভাষাবিষয়েও সেইরূপ, সংস্কৃতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান হইয়াছিল বলিয়াই উহার এখন মৃত্যু হয় নাই এবং এত সম্মান। সুতরাং বঙ্গের সমস্ত বিদ্বজ্জনের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া আমাদের এই মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্বের বৃদ্ধিকল্পে যত্নবান হউন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার কঙ্কালের অন্যান্য ভাগ এক প্রকার দৃঢ় হইয়াছে। কেবল ভাষার মেরুদণ্ডস্বরূপ ক্রিয়াপদের রূপ লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, বিদ্বজ্জনেরা সেইটা ঠিক করিয়া দিউন। সকলে তাহা স্বীকার করিলেই শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকত্ব অল্পে অল্পে দূর হইবে। ডার-উইনের survival of the fittest নিয়মানুসারে কেবল যে সকল প্রাদেশিক শব্দ, সুন্দর, লঘু কলেবর ও কার্য্যকর তাহারাই থাকিয়া যাইবে ও সার্ব্বভৌম হইবে—তাহা তাহারা সংস্কৃতমূলকই হউক বা খাঁটি বাঙ্গলাই হউক। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা নামক সুরস এবং সুচিন্তিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কতকগুলি খাটি বাঙ্গলা শব্দের সংগ্রহ আছে। সেই শব্দ গুলির সৌন্দর্য্য মোটেই নাই বরং সে গুলিকে কুৎসিত শব্দ বলা যায়। সাহিত্যে এবং ভদ্রলোকের মুখে সেইরূপ শব্দের স্থান পাওয়া অনুচিত। এইরূপ সকল শব্দের একটা কোশ (কোষ) প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ফল কি? কুৎসিত কোন বস্তুকে স্থায়ীকরা উচিত নহে। ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্বপ্রিয়-দিগের তাহাতে ক্ষণিক বৃথা আমোদ ভিন্ন আঁদর, জ্যাঁদড়, ব্যাদড়া, প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানিলে সাধারণের কোন লাভ হইবে না। পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে কোন কারুকার্য্য বা কাব্য অসুন্দর হইলে তাহা সাধারণ্যে বাহির করিতে দেওয়া হইত না—একেবারে নষ্ট করা হইত। তাহার ফলে আমরা গ্রীস হইতে যাহা কিছু পাই তাহাই সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ্ একবার একখান্না কদাকার তরবারি দেখিয়া আদেশ করিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে সেইরূপ তরবারি যত আছে সমস্ত নষ্ট করিতে হইবে। কলির বিশ্বামিত্র কালিফর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত লুথর বারবঙ্ক শত শত প্রকারের নূতন বৃক্ষ, ফল, পুষ্প সৃষ্টি করিতে করিতে যদি কুৎসিত একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট

করেন। এই সকল দৃষ্টান্ত, কি সাহিত্যে কি অন্য বিষয়ে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। যদি আমরা নানা ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া টাকা, মোহর, শাল, বনাত পাই তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত ছিন্ন-কন্থা, মলিন বস্ত্র ও ফুটা কড়ির প্রতি কেন আদর করিব।

অন্যান্য কথা।

বাঙ্গলা-ভাষাসম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধটির উপসংহার করিব। Linguistic Survey of British India নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে—Bengalis themselves struggle vainly with a number of complex sounds which the disuse of centuries has rendered their vocal organ unable or too lazy to pronounce. The result is a number of half pronounced consonants, broken vowels not provided for by their alphabet amid which the unfortunate foreigner wanders without guide and for which his own larynx is so unsuited as is Bengali for the sounds of Sanskrit. বাঙ্গালীরা কিন্তু কোন ভাষা উচ্চারণ করিতে অক্ষম নহেন। কেবল আলস্যবশতই সংস্কৃত অশুদ্ধ-রূপে উচ্চারণ করেন। এখন যত স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয় সর্ব্বত্রই সংস্কৃতের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করিতে বাধ্য করা উচিত। তাহা হইলে কালে আমাদের বাঙ্গালার উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে।

উল্লিখিত মহামূল্য ও অসাধারণ পুস্তকের আর একস্থানে লিখিত আছে Bengali is sent out to the world masquereded in the clothes of her grandmother, Sanskrit. কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বহুল সংস্কৃতপ্রয়োগে বাঙ্গলার গৌরব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তবে সুন্দর বাঙ্গলা শব্দ পাইলে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে তাহাই

ব্যবহার করা উচিত। কুল ও পেয়ারা প্রাদেশিক শব্দ হইলেও যখন সুশ্রাব্য ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে তখন বদরী ও ববাহ ফল না লিখিয়া কুল ও পেয়ারা লেখাই উচিত।

মুষ্টিমেয় একদল লোকের ইচ্ছা যে দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিত হয়। সংসারে অমিশ্র ভাল কি মন্দ কিছুই নাই। দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিলে এইমাত্র লাভ যে আমাদের ভাষা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক কিছু অনায়াসে শিখিতে পারেন। কিন্তু তাহাও সন্দেহ-স্থল। আসামী ও বাঙ্গলা একই বর্ণমালার সাহায্যে লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু বাঙ্গলাদেশে থাকিয়া অর্থাৎ আসামে না গিয়া কয়জন বাঙ্গালী আসামী শিখিয়াছেন? শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই এখন দেবনাগর অক্ষর জানেন। অথচ সেই দেবনাগরের লিখিত হিন্দী ভাষা কয়জন বাঙ্গালী শিখিয়াছেন? অন্যপক্ষে বাঙ্গলা অক্ষর সাধারণতঃ ত্রিকোণ। সংস্কৃত অক্ষর চতুষ্কোণ। ত্রিকোণ অঙ্কিত করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ও শ্রম লাগে। দেবনাগর অপেক্ষা বাঙ্গলার আয়তন অল্প। দেবনাগর অপেক্ষা বাঙ্গলা দেখিতেও সুশ্রী। আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে এই সুন্দর সম্পত্তি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। কত শত বৎসরের ইতিহাস ইহার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া আছে। তান্ত্রিকগণ এই বর্ণমালাকে কত উচ্চে আসন দিয়াছেন। কেন আমরা এই অমূল্য পৈত্রিক-সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিব? একজন ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান ইংলাণ্ড হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের Indian World নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন The writer of the articls in the Modern Review proposes gravely to abandon the beautiful and clear Bengali script in favour of the greatly inferior Devanagri whose thick lines and minute differences between letters especially compound letters are extremely trying to the eye.

যে প্রবন্ধ হইতে উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহাতে বাঙ্গলা-ভাষা-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করেন তাঁহাদের সকলেরই সেই প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত। প্রবন্ধলেখক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডরসন্। ইহাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, আমোদপ্রিয়তা, নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য বাঙ্গলা ভাষায় অসাধারণ অধিকার এবং বাঙ্গালীদিগের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত বাঙ্গালীরা মুগ্ধ ছিলেন। কটনসাহেব ভিন্ন বাঙ্গালীদের প্রতি এরূপ সহানুভূতি আর কোন ইংরেজ প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা আমি অবগত নহি। আমি প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সদাশয়তায় কথা বলিতে পারিলাম বলিয়া ধন্য হইলাম মনে করি; তিনি এবং কটন সাহেব কতদিন এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনও এদেশের উপকার করিতে উভয়েই প্রস্তুত। সংপ্রতি তিনি নাম দিয়া ফেব্রুয়ারি ও মার্চের Modern Reviewতে বাঙ্গলা ভাষাসম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের Modern Reviewতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে বাঙ্গলাভাষাই কালে ভারতবর্ষের Lingua Franca হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা যেরূপ নানা প্রকারে সীমাবদ্ধ, তাহাতে এই সুখস্বপ্ন যে কখনও সফল হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

উপসংহারে আপনারা ধীবভাবে আমার কথাগুলি শুনিলেন সেজন্য আপনাদিগকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমি নগণ্য ব্যক্তি। তবে সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্রে কথা কহিবার অধিকার সকলেরই আছে বলিয়া আপনাদের সমক্ষে এত কথা বলিলাম। শ্রীবীরেশ্বর সেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলাদেশে "কালবৈশাখী" বলিয়া একটা আছে। কথটা সহরবাসী সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচিত না হইতেও পারে, কিন্তু পল্লীবাসিগণ কথাটা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। বাংলাদেশের অনেক পল্লীতেই বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতে কালধর্ম্মে ভীষণ ঝড় হইয়া থাকে। এই ঝড়ে বহু দরিদ্রের পর্ণকুটীর ধরাশয়ী হয় এবং অনেক বলবান্ মহীরুহের উন্নত কাণ্ড ধরণীর ধূলিতে-লুটাইয়া পড়ে। কালধর্ম্মে ঝড় হয় বলিয়াই বোধহয় পল্লীবাসিগণ ইহাকে কাল-বৈশাখী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নামটি যে সার্থক হইয়াছে তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। কেননা কালবৈশাখী মহা-কালের অগ্রদূত হইয়াই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার শান্তিময়ী পল্লীতে প্রবেশ করে। কালবৈশাখীর দৌরাত্ম্য প্রতিবৎসরই যে একরূপ হইবে এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর ইহার বিষদন্ত যেরূপ অনুভূত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে সেরূপ হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। ইহার দৌরাত্ম্যে বাংলা এবার গণিতবিদ গৌরীশঙ্করকে হারাইয়াছে, উদীয়মান চিকিৎসক গণেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছে, ভিষগাচার্য্য দেবেন্দ্র সেনকে হারাইয়াছে, সাহিত্যিক সুবলচন্দ্রকে হারাইয়াছে, রাজনীতিক জানকীনাথকে হারাইয়াছে আর হারাইয়াছে বাঙ্গালীর আদরের মণি, বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের সম্রাট কবিশ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলালকে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গ শোকে ম্রিয়মান, বঙ্গভাষা পুত্রশোকাতুরা কাঙ্গালিনী, বঙ্গের বীণা স্তব্ধ, বঙ্গের "সুরধাম" নিরানন্দ। অর্দ্ধপথেই আজ সঙ্গীত থামিয়া গিয়াছে; যে বীণায়-রাজপুত বীরত্বের ভৈরবরাগ নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বীণার তার আজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর তাহাতে নিত্য

নব ঝঙ্কার উঠিবে না; আর তাহাতে স্বদেশের গৌরবগাথা উদ্‌গীত হইবে না।

"ভেঙ্গে গেছে আজ স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে আজ বীণার তার;
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে কে গান জননী গাহিবে আর?"

সব ফুরাইয়াছে; যাহা গিয়াছে আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। আর কেহ অমন করিয়া বঙ্গবাসীকে হাসিয়া হাসাইতে কাঁদিয়া কাঁদাইতে পারিবে না। আরত কেহ "যতেক ভণ্ড চণ্ডী নন্দ, ইত্যাদির দণ্ড দিবে না; আর কাহারো স্বচ্ছ মুকুরে Reformed Hindoos এর অবিকল চিত্র প্রতিফলিত হইবে না। আর কে সাহসে ভর করিয়া আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে যে, অকর্ম্মণ্য অলসেরা আপনাদের সারহীনতা লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য "বোঝাতে চান্ হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম, ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক ও কুড়েমিটা ধর্ম্ম?" আরত কাহারো বীণার তারে অমন প্রাণ-মাতান স্বরে "আমার দেশ ও আমার জন্মভূমির" গান বাজিবে না। শাব্দ-কবির অভাব বঙ্গে নাই, সত্য, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় যথার্থ কবি সমগ্র বাংলায় এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কই? আজ সমগ্র বাংলায় যে শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে তাহা কেবলমাত্র লোক দেখাইবার জন্য নহে। অভাব অনুভূত না হইলে কেহ কখন কাঁদে না; আজ চারি কোটী বাঙ্গালী অন্তরের অন্তঃস্থলে যে একটি যথার্থ অভাব অনুভব করিতেছে তাহারই বাহ্যপ্রকাশ এই শোকোচ্ছ্বাসে।

আজ আমরা এখানে যাঁহার শোক-সভায় উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কে ছিলেন এবং কি করিয়াছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গলা দেশের এমন এক সময় ছিল যখন কোন এক ইংরাজিনবীশ বাঙ্গালী ঘটিরাম প্রকাশ্য সভায় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি বঙ্কিম বাবুর লেখার এক ছত্রও পড়ি নাই।" কিন্তু বঙ্গদেশে এমন কেহই নাই

যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান দুই একটা জানেন না। যতই ইংরাজিতে লায়েক হই না কেন, মজলিশে বসিয়া ইংরাজি হাসির গান গাহিয়া নিজেরা আনন্দলাভ করি অথবা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দেই, এত সাধ্য আমাদের নাই। হাসিরগান ছাড়াও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি অতি সুন্দর ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা দুইপাতা ইংরাজি পড়িয়া সেক্ষপীয়র, বেকনের মামলার ডিক্রি ডিসমিস করেন, সেই সকল ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকগণ সেই ইংরাজি পুস্তক খানি হইতেও কবির সহিত পরিচিত হইতে পারেন। আর একটা কথা, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যশঃ-গৌরব, যে যুগে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এই তিনটি কারণে, ইংরাজিনবীশ ও খাঁটি বাংলানবীশ উভয় সম্প্রদায়েই, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের আদর হইয়াছে। অতএব হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীনের কাব্যামৃত পানে যাঁহারা বঞ্চিত তাঁহারাও যে দ্বিজেন্দ্রলালের দুই একটি গান অথবা দুই একখানি নাটক পাঠ করেন নাই এমন কথা বলিতে পারি না। "মহৎব্যক্তি সুপরিচিত হইলেও তাঁহার বিষয় আলোচনা করা অনুচিত নহে" এই নীতি-বাক্যের দোহাই দিয়া কবিবরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

কবির কাব্যগুলিকে জানিয়া লাভ আছে সত্য কিন্তু কবিকে জানায় তদধিক লাভ আছে। কবির কাব্যগুলি বুঝিতে পারিলে আমরা ধন্য হই কিন্তু কবিকে না বুঝিয়া কবির কাব্য বুঝাইবার চেষ্টা প্রায়শঃই ফলোপধায়িনী হয় না। অতএব কাব্য বুঝিবার পূর্ব্বেই কবিকে বুঝিতে হইবে। আবার একথাও সত্য যে, কাব্যের ভিতরেই কবি আত্ম-প্রকাশ করেন। যেমন ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ, সেইরূপ কবির সহিত কাব্যেরও অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ। অতএব ফলকথা এই দাঁড়াইল যে,

কবি ও কাব্য উভয়কেই একত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কবিকে তাঁহার কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব না। কবি ও তাঁহার কাব্যকে একত্র দেখিবার চেষ্টা করিব। কাব্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে কবির জীবনের দুই একটি ঘটনার বেশী আমাদের চোখে পড়িবে না।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায় মহাশয় একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণনগরে রাজবংশের ইতিহাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই সুবিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ খানির নাম "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং"। এতদ্ভিন্ন তিনি "গীত-মঞ্জরী" ও "আত্মজীবনচরিত" বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এতদূর প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে, বঙ্গের ছোটলাট টমসন সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য একবার তাঁহার নিজ বাটিতে গিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নানা গুণের আধার ছিলেন—কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র মিষ্টভাষী, সদালাপী, সত্যনিষ্ঠ এবং পরোপকারী—কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যেমন চারুদর্শন তেমনি মধুর কণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তৎকালীন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তিনি সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে আত্মজীবন-চরিত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারের অনেক কথা লিখিত আছে। এ সকলে তাঁহার চিন্তাশীলতা ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত।*

---

* দীনবন্ধুর "সুরধুনী কাব্যে" জলাঙ্গী গঙ্গাকে বলিতেছেন :—

"কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায় অমাত্য-প্রধান
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্।
সুললিতস্বরে গীত কিবা গান তিনি ;
ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজান-বাহিনী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতৃগণও সুশিক্ষিত ও সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রলালের "নবদেবী বা মায়া" নামক উপন্যাসখানি অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানেন্দ্রলালের নামও অনেকদিন লিখিত থাকিবে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকালেই তিনি অতি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাহার প্রথম পুস্তক "আর্য্যগাথা" চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে রচিত। এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থের আবরণীর উপর গ্রন্থকারের নাম ছিল না। কিন্তু অনেক বিখ্যাত সমালোচক গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের বালকের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুদিন আর্য্যগাথার গ্রন্থকার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং যখন তাঁহার Lyrics of Ind প্রকাশিত হয়, তখন তিনি "Author of Aryan Melodies" অর্থাৎ "আর্য্য গাথার গ্রন্থকার" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। আর্য্যগাথা প্রকাশিত হইবার কাল হইতে "আষাঢ়ে", "হাসির গান" প্রভৃতি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি গীতি-কবিতালেখক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। গীতি-কবিতা রচনায় তাঁহার যে কতদূর দক্ষতা ছিল তাহা তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি পাড়লেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার রচিত "ভেঙ্গেগেছে মোর স্বপ্নের ঘোর" প্রভৃতি গানটি বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। আমার বিশ্বাস তিনি যদি আর কিছুই রচনা না করিয়া এইরূপ কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গে অমর হইত। উল্লিখিত গানটিতে যে একটা বিষাদময় গভীর নিরাশার করুণ বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার তুলনা বাংলা-সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ! যখন সমগ্র দেশের বুকের উপর দিয়া একটা সর্ব্ববিধ্বংসী জলপ্লাবন চলিয়া গিয়াছে, তখনও সেবার কবির সাধের মেবার মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়াছিল! তাই দেখিয়া কবি ভাবিয়াছিলেন বুঝি মেবারের পতন নাই—বুঝি বা মেবারের পুত্রগণ নিজেদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতের ২০ কোটী নরনারীকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে—মানুষ করিয়া তুলিবে! কিন্তু তাহাদেরও যে পতন হইল, তাহারাও যে মানুষ হইল না—কবির সাধের মেবারও যে অতল সলিলে ডুবিয়া গেল! এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য ত আমরা ৭০০ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি, তাহার জন্যত মাঝে মাঝে মায়া-কান্নাও কাঁদিতেছি। কিন্তু মেবারের দুঃখে—আমাদের দুঃখে—আমাদের পতন দর্শনে আমরা প্রাণ হইতে ত কাঁদিতেছি না! মেবারের পতন কবির প্রাণকে আঘাত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আঘাত করিয়াছে আমাদের প্রাণহীনতা আমাদের জড়বৎ আচরণ! সেই নিষ্ঠুর আঘাতে কবির প্রাণের বীণা কাঁদিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে বঙ্গ সাহিত্য একটি গানের সেরা গান পাইয়াছে। কবির কবিতা-সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার আছে তাহা পরে বলিব। আপাততঃ কবির বাল্যজীবন-সম্বন্ধে দুই একটি গল্প বলিলে আপনারা বোধ হয় বিরক্ত হইবেন না।

শ্বেতদ্বীপের কবি Pope সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। Pope বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। অনেক সময় তিনি পাঠে অবহেলা করিয়াও কবিতা-দেবীর পূজা করিতেন। তজ্জন্য একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে অতিশয় প্রহার করিয়াছিলেন। যখন প্রহারের মাত্রাটা দারুণ চড়িয়া উঠিয়াছে তখন বালক পিতার করুণা উদ্রেক করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিলেন :—"Papa papa pity take. No more verses Shall I make." আমাদের দেশেও গুপ্ত কবি তিন বৎসর বয়সের সময় দুইছত্র কবিতায় কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প

শুনিয়াছি। একদিন তাঁহার দাদা "দেখি তুমি কেমন কবিতা রচনা করিতে পার" বলিয়া কোন একটি বিষয়সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। বালক দ্বিজেন্দ্রলালও কিয়ৎকাল চিন্তা করিবার পর কয়েক লাইন স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের আর একটি গল্প শুনিয়াছি। এক অপরাহ্নে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় বালক দ্বিজেন্দ্রলাল বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। কিন্তু অলসের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই এক দেওয়ালের উপর দাঁড়াইয়া বাটীর ভৃত্য-গণের নিকট অদম্য উৎসাহে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এমন সময় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি পুলকিতচিত্তে কিছুক্ষণ বালকের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "কালে এই বালক একজন অতি বিখ্যাত লোক হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে—আজ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যশঃ-সৌরভে দশদিক আমোদিত। আপনারা, চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সেকান্দার সাহার ভবিষ্যৎবাণী পাঠ করিয়াছেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই:—সেকান্দার সাহার ভবিষ্যৎবাণী কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-বাণী স্মরণে লিখিত হয় নাই?

বাল্যকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল অতিসুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন। কথিত আছে তিনি যখন প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময় তাঁহার টেষ্টপরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরে লিখিত ইংরাজী পড়িয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বো সাহেব মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "এত সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিলে কোন ইংরাজকেও লজ্জিত হইতে হইবে না।" তাঁহার ইংরাজী লিখিবার ক্ষমতা যে ইংরাজের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না তাহা তাঁহার Lyrics of Ind নামক গ্রন্থপাঠেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ২৩ বৎসরের অধিক নহে। তখন তিনি কৃষিশিক্ষা ব্যপদেশে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। এই গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ Edwin Arnold এর নামে উৎসৃষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ Trübner Company কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থের মুখবন্ধ অতি সুন্দর—সেই স্থান হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :—

"My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be. Both are beautiful but whilst the one is visionary and sensuous, the other is Vigorous and chaste ; whilst one dreams the other soars ; whereas the one makes a poetry of Religion the other makes a religion of Poetry. ... It is the aim of the author to establish a meddiage and an intellectual commerce between the poetries." কবি এক অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তদীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি কতদূর সফল মনোরথ হইয়াছেন তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। আমাদের বিশ্বাস এতবড় একটি কাজ একব্যক্তির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা অতঃপর দেখিতে পাইব যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের আবশ্যকতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াও কবির জীবনের একটি কাজ ছিল। আমরা এখন অনেকের মুখেই গ্রীস্ ও ভারতের আদর্শের সমন্বয় করিবার কথা শুনি, কিন্তু কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সেলুকস্ কন্যা হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহোপলক্ষে এই বিষয়ে একটি ইঙ্গিত করিবার পূর্ব্বে ঐ সমন্বয়ের কথা বড় একটা শোনা যাইত না। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানিতে "The land of the Sun," "Hymn to the Spirit of Love" প্রভৃতি ২৫টি কবিতা আছে। "Krishna to Radha" কবিকর্ত্তৃক ও "Universal Prayer" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। "A farewell" নামক অতি সুন্দর কবিতাটি একটি বাংলা গানের অনুসরণে রচিত। গ্রন্থখানির কোথাও কোন বিষাদের রেখা নাই—নবীন কবি নবভাবোন্মেষে সকলের প্রাণে এক নব আনন্দ জাগাইবার জন্যই স্বীয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমরা "The land of the sun" এইতে কয়েকছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই আপনারা পুস্তকখানির একটু পরিচয় পাইবেন। কবির প্রিয় ভারতবর্ষই তাঁহার Land of the sun—সেই দেশে।

'In the arms of the slumbering valleys,
The young moon beams enamoured repose ;
And the loveliest stars faint, entangled
In the mazes of *Champo*k and rose—
'Whom the year woos with tears, smiles & whispers
Whom the seasons with rare treasures greet :
Where Dawn blushes with fragrance and music
And the Sunset is glorious and sweet."

উদ্ধৃত লাইনগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে না। রসজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে, "where dawn blushes with fragrance and music এই ছত্রটি যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির অনুপযুক্ত নহে। ভারতবর্ষীয় কবিরা ইংরাজীতে যে সকল কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানির স্থান প্রথম না হইলেও প্রথম শ্রেণীতে। দ্বিজেন্দ্রবাবুর কি করিয়া ভ্রম নিরাকরণ হইল, এখন তাহাই বলিতেছি। ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করা বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় অসম্ভব।

সত্য বটে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমেই "আর্য্যগাথা" রচনা করেন, কিন্তু "Lyrics of Ind" হইতে তিনি যেরূপ উৎসাহ ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কোন নবীন কবির মাথা বিগড়াইয়া যাওয়াই সম্ভব।

উৎসাহের মধ্যে Edwins Arnoldকে বইখানি উৎসর্গ করিবার অনুমতি পাওয়াই সর্ব্বপ্রধান। প্রশংসারত কথাই ছিল না। ভারতবন্ধু Statesman প্রশংসার সুর চড়াইয়া লিখিয়াছিলেন "যদি গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না থাকিত তবে গ্রন্থখানিকে আমরা কোন বিখ্যাত ইংরাজ কবির রচনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম।" কিন্তু এমন সময় এক মহাত্মার উপদেশে কবি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন। সেই মহাত্মা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। "Lyrics of Ind" প্রকাশিত হইলে একদিন কবি স্বয়ং রাজনারায়ণবাবুকে কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনান। নবীন কবিকে নানারূপে উৎসাহিত করিয়া অবশেষে রাজনারায়ণবাবু বলিলেন "লিখেছ ত বেশ কিন্তু এইগুলি যদি বাংলায় লিখ্‌তে তবে আরও ভাল হ'ত। বাঙ্গালীর ছেলের ইংরাজীতে কবিতা লেখা পণ্ডশ্রমমাত্র।" সুবিজ্ঞ রাজনারায়ণ বাবুর উপদেশে কবি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং সেইদিন হইতে বঙ্গবাণীর পূজায় আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিলেন। তাঁহার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার পরিচয় বঙ্গসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই পাইয়াছেন। তিনি একদা ভক্তিভরে জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ওদুটি অমল কমল-চরণে স্থান।" আজ জননী বঙ্গভাষা তাঁহার প্রিয়পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

সাধক আজ আরাধ্য দেবতার পায়ে স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছে। জননী বাগ্দেবী আর দূর হইতে পুত্রের পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাই তাঁহার প্রিয়পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া লইয়াছেন।

এখন আমরা কবির সাহিত্য-সাধনার কাহিনী অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। কবির জীবন-চরিত বলিতে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কাহিনীকেই বুঝায়। সাহিত্য-সাধনার পরিচয় লইতে গিয়াই আমরা কবি যে,

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" মানস-জগতে বিচরণ করেন তাহার খবর পাইব। কবির জীবনের এই দিকটা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহার সহিত সাহিত্য-পাঠকের কোনই সম্বন্ধ নাই। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই কবি "একঘরে" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি দেশের লোককে ও সমাজকে প্রকাশ্যভাবেই গালাগালি দিয়াছিলেন। দেশের লোকের ও সমাজের অপরাধ, বিলাতফের্ত্তা কবি বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে প্রবেশ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। এই পুস্তকখানি বহুদিন পরে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াছি "একঘরে" গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক-প্রতিভার—পরিহাস-রসিকতার প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। এই পুস্তক লইয়া তাৎকালীন সমাজে কীদৃশ আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। অতএব আমরা বলিতে পারিলাম না কেন তিনি স্পষ্ট প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোধ হয় ইহার একটি কারণ এই কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, জ্যাঠামি, বাদরামি প্রভৃতির প্রতিবাদে বিপরীত ফল ফলে। এইরূপ স্থলে ব্যঙ্গের ক্ষমতা অসীম। শুনিতে পাওয়া যায় Punch এর এক একটি কার্টুনের ফলে মন্ত্রী-সভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে কথাটি বড় সত্য এবং কথাটি এই :—

Ridicule shall frequently prevail
And cut the knot where graver reasones fail.

এই কথাটি বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় কবি স্পষ্ট প্রতিবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভণ্ডামি প্রভৃতিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্যই ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারই ফলে তাঁহার "Reformed Hindoos", "চণ্ডীচরণ", "নন্দলাল", প্রভৃতি কবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে। তাহাদের

মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই সত্য, কিন্তু তাহারা অনেকের হৃদয়েই ব্যথা দিয়াছে। যে সময় কবি এই সকল কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন তখনও তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই যে কেবল ব্যঙ্গ করিয়াই সমাজ-সংস্কার করা যায় না। যাহাদের সংস্কার করিতে হইবে তাহাদের জন্য কাঁদিতেও হইবে। এই সকল কবিতা রচনা করিবার সময় যে কবি পূর্ব্বোক্ত কথা-গুলি ঠিক বুঝিয়াছিলেন একথা জোর করিয়া বলা যায় না। স্বীকার করি, হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ বঙ্গে কেহই নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের Reformed Hindooসকে রজনীকান্তের "কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন-ব্রাহ্মণবিষয়ক কবিতাদ্বয়ের সহিত তুলনা করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা লেখা অনেকটা গায়ের ঝাল মিটাইবার জন্য, কিন্তু ঠাট্টা করিতে গিয়াও "দেশের দশা হেরি কান্ত করে অশ্রু-বরিষণ।" দ্বিজেন্দ্রলালও যে দেশের দশা হেরি অশ্রু বরিষণ করেন নাই তাহা নহে কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি ঠিক তখন করেন নাই। প্রথমে প্রাচীন সমাজের ভণ্ডামিটাই তাঁহার চোখে পড়ে এবং তাহাদের প্রতিই ব্যঙ্গের বল নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন পরে তিনি নবীন দলের মধ্যেও ভণ্ডামির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইলেন। অতএব কেবল প্রাচীনগণকে লইয়া থাকাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকারের ভণ্ডামির উপর কষাঘাত করিবার জন্য কল্কীকে আসরে নামাইয়া তাঁহার দরবারে ভক্তগণকে লইয়া হাজির করিলেন। কবির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গনাটক "কল্কি-অবতার।" এই গ্রন্থখানি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গ-কাব্য। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার নাটক লিখিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কবির রচিত বিষ্ঠানিধিটি এক অপূর্ব্ব জীব। এরূপ জীব জগতে একান্ত দুর্লভ নহে—ইহারা মাছও ধরে পাণিও ছোঁয় না—শ্যামও রাখে কুলও রাখে। এইরূপ লোকের চরিত্র যথাযথভাবে চিত্রিত করা

অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি কবি শিক্ষালাভের জন্য সাগর-পারে গিয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহাকে তজ্জন্য সমাজে গ্রহণ করিতে না চাহিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন—তিনি সেই গোঁড়াদের মুখের উপর একটু রূঢ়ভাবেই বলিয়াছিলেন "সাগরপারে যাত্রা নিষেধ লক্ষীছাড়ার যুক্তি ও"। কবি তাঁহাদের দুই গালে যে বেশ করিয়া চূণকালী মাখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন তাঁহার কয়টি গানে ও "কল্কি অবতারে" পাই। কিন্তু অল্পবয়সে বিদেশ-যাত্রার যে কুফল ফলে তাহাও কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। বিলাতফের্ত্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্তকে মর্ম্মপীড়া দিয়াছিল। বিলাত ফের্ত্তাদের সমাজে যে দুই চারিটি রেবেকার আমদানী হইয়াছে তাহাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিলাতফের্ত্তা চম্পাটিদের দেখাদেখি নব্য হিন্দু উমেশ, রমেশ, পরেশ, সুরেশদের ও "আর ভাল লাগেনাকো প্রত্যহই একঘেয়ে, মেউ মেউ করা যত বাঙ্গালীর সব মেয়ে" কেননা তাহারা "না জানে নাচতে, না জানে গাইতে বিদ্যাবত্তায় একটি একটি হস্তিমূর্খ যেন, না পড়েছে Shakespeare না পড়েছে Gamot Adam Smithএর Political Economy জানে না, Malthusএর Theory of Population মানে না ··· Huxley, Tyndale, Spencer, Mill এর ধারও ধারে নাক, Dynamics এর একটা আঁকও কষতে পারে নাক।" তাই দেখাদেখি নব্যহিন্দুরা সুকেশিনী, সুবাসিনী, সুভাসিনী, সুহাসিনী প্রভৃতিকে এক একটি রেবেকা করিয়া তুলিলেন। তারপর যাহা হইল, তাহা উমেশের কথার কতকটা বোঝা যাবে :—"এই আমি এলাম সমস্ত দিন গাধার পরিশ্রম করে, বাকিখাজনার রায় লিখে, আর স্ত্রীর খাবারের জোগাড় করা চুলোয় যাক্, তিনি গেলেন

engagement রাখতে।” অতএব দেখিতে পাইতেছেন যদিও প্রথমে প্রাচীনদলের ভণ্ডামিটাই কবির চোখে পড়িয়াছিল। তবু নবীনদলের বাঁদরামিটাও তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। এই বিলাত-ফের্ত্তাও নবীন দলের বাঁদরামিকে কষাঘাত করিবার জন্যই কবির প্রায়শ্চিত্ত রচিত হয়। নাট্যকলা-হিসাবে প্রায়শ্চিত্তের স্থান কল্কি অবতারের নিম্নে। প্রায়শ্চিত্তের গল্পটার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে খুব বড় একটা ঐক্য আছে এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু কবির জীবন-চরিতে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে। আমরা প্রায়শ্চিত্তেই প্রথমে দেখিতে পাই মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে কবি কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কবির এই গ্রন্থেই আমরা আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটি সঙ্গীতের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। সেই সঙ্গীতগুলি সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ; শুধু তাহাই নহে তাহারা বঙ্গের হাটে মাঠে-গোঠেও গীত হইয়া থাকে অতএব তাহাদের নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেই সঙ্গীত গুলি ঃ—“নূতন কিছুকর”, আমরা বিলাত-ফের্ত্তা কভাই”, “হো’ল কি” প্রভৃতি।

প্রায়শ্চিত্ত রচিত হইবার পূর্ব্বেই কবির “বিরহ” ও “ত্র্যহস্পর্শ” রচিত হয়। ইহাদের যে কোন গুরুগম্ভীর উদ্দেশ্য ছিল তাহা বোধ হয় না। জন-সাধারণকে একটু বিশুদ্ধ আনন্দদান করাই এই গ্রন্থদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। কবি লিখিয়াছেন, “শুধু লুটিব একটু মজা শুধু করিব একটু পেয়ার, শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু”। কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে “বিরহের” অভিনয় একটি পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রহসন অভিনীত হইত তাহারা প্রায়শঃই শীলতাবিরোধী হইত। কিন্তু এই “বিরহ” গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল লোককে দেখাইয়া দিলেন যে, হাস্যরস শীলতার বিরোধী নহে। কবি দীনবন্ধুর হাস্যরসও অশ্লীল নহে—যাঁহারা “যমালয়ে জীবন্ত মনুষ্য” পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এ বিষয় সাক্ষ্য দিবেন।

ব্যঙ্গ করিবার শক্তি দীনবন্ধুর অসীম ছিল। দীনবন্ধুও বিনাকারণেই বিশুদ্ধ হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ বোধ হয় দীনবন্ধু ব্যতীত বঙ্গে অপর কেহই জন্মে নাই এবং আমাদের বিশ্বাস ব্যঙ্গনাটক রচনায় কবি দীনবন্ধুর স্থান সর্ব্বপ্রথম এবং তৎপরেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করিতেই হইবে তাহা এই, দীনবন্ধুর রুচি অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের রুচি অধিক পরিমার্জ্জিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" নাটিকাখানি কবিবর রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই সময় কবিদ্বয়ের তথাকথিত বিরোধের সূত্রপাতও হয় নাই। বিরহের সমসাময়িক পুস্তক "আর্য্যগাথা" দ্বিতীয় ভাগ। এই পুস্তকের প্রশংসা নানা স্থানে হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে আর্য্যগাথার কথা বলিয়াছি তাহা আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ! আর্য্যগাথা প্রথমভাগ চোখে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আর্য্যগাথা দ্বিতীয়ভাগ বইখানি চোখে দেখিয়াছিমাত্র। বই খানি সমস্ত পড়ি নাই অতএব বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে গ্রন্থখানির কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৩০১ সালের "সাধনায়" প্রকাশিত সমালোচনা আধুনিক সাহিত্যে পড়িয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর মতে গ্রন্থখানিতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও বিশুদ্ধ কাব্য উভয়ই আছে। রবীন্দ্রবাবুর পুস্তকে উদ্ধৃত আর্য্যগাথার একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"ছিল বসি সে কুসুম কাননে।
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে) ;

ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি
অতুল গরিমা রাশি।
সেথা ছিল না বিষাদভরা (অশ্রুভরা গো);

সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি
হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিলরে, পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।
তার সরল সুঠাম দেহ ; (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;

যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত
সোহাগ সরম স্নেহ।
যেন পাইলরে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে);

যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সমিলিত, সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়
কোকিল কূজিত গান।
শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো);

যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী
অমনি অধীর প্রাণে ;
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে কে জানে।"

রবীন্দ্রবাবুর পুস্তকে আরও ৩৪টি গান উদ্ধৃত আছে কিন্তু

আপনাদের বিরক্তিভাজন হইবার ভয়ে একটির বেশী নমুনা দিবার সাহস হইল না।

এই সময় দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত অন্যান্য সাহিত্যিকগণের চেনা-শুনা হয়। তখন "ইণ্ডিয়া ক্লাবের" পুরা বাহার। ইণ্ডিয়া ক্লাবের কয়েকটি সভ্য মিলিয়া একটি "ডাকাইত ক্লাব" সংগঠন করিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নকাল। তিনি তখন সাধনার সম্পাদন করিতেছিলেন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পর যতগুলি সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এই যুগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। এই সাধনায় "কেরাণী" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি বাহির হয়। কেরাণী-জীবনের চিত্র অনেকেই আঁকিয়াছেন কিন্তু কাহারও চিত্র এত উজ্জ্বল হয় নাই। কবি রজনীকান্তের উক্ত বিষয়ক একটি কবিতা "অভয়াতে" প্রকাশিত হইয়াছে। সে কবিতাটিও অতি সুন্দর কিন্তু তাহা এই কবিতার সমকক্ষ নহে। কেরাণী বাবু "সারা দিনটা খেটে খেটে আপিস থেকে ছুটে" বাড়ী আসিয়া দেখেন :—

"ধুতি গেছে উড়ে, দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট চটি বিছানায় আর একপাট আস্তাকুড়ে
বিশু গেছে বাজারেতে, ঘুমোয় রামা কুঁড়ে
বামুন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে!
"ফরাসের সতরঞ্চে একটি কোমর মাটি
পুত্ররত্ন গিয়ে হুঁকো গাছটি নিয়ে
ঘুন্‌সি পড়ে তাকিয়াতে কচ্চেন বসে নৃত্য;
ঘুমোচ্চেন তাঁর পার্শ্বে শ্রীরামকান্ত ভৃত্য।"

অতঃপর বাবুর করতল চপেটাঘাতরূপে কাহারো বা গণ্ডে কাহারো বা পৃষ্ঠে দুই একবার স্পর্শ করিল। স্বয়ং গৃহিণীও বাদ গেলেন না কারণ

"সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা।"* আষাঢ়ের শেষ কবিতার নাম "কর্ণবিমর্দ্দন-কাহিনী।" কিন্তু কবির কি অসীম ক্ষমতা তিনি যখন "কর্ণবিমর্দ্দন করেন" তখনও আমরা না হাসিয়া পারি না। আষাঢ়ের কবিতাসম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্র লিখিয়াছেন:—"এরূপ প্রকৃতির রহস্য কবিতা বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং আষাঢ়ের কবি অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে ইহার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী, বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।" তাঁহার "বাঙালী-মহিমা", "ইংরাজ-স্তোত্র", "ডিপুটি-কাহিনী" ও "কর্ণবিমর্দ্দন" সর্ব্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্ব্বত্র ঝকঝক করিতেছে। "'বাঙালা-মহিমা,' 'কর্ণবিমর্দ্দন-কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা লঘু হাস্য মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।" এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপর কথা বলা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত বেয়াদবি।

কবির "হাসির গান" নামে অতি বিখ্যাত বইখানি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অনুচিত হইবে না। হাসির গানের কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ের লেখা এবং সাধনা, ভারতী, সাহিত্য প্রদীপ প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অত্যধিক প্রসিদ্ধ দুই চারিটি

---

* বর্ত্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের খাটিচিত্র প্রায়শঃই পাওয়া যায় না। তাই একজন লেখক বলিয়াছেন:—"হয়ত ভবিষ্যতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিবেন, যে, যখন বাংলা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তখন বাংলা দেশটা মোটেই ছিল না।" আমাদের সুখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের "কেরাণী" কাবতাটি এইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মুখ বন্ধ করিবে।

কবিতার নাম ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। হাসির গানের অনেকগুলি গানই কবির বিভিন্ন ব্যঙ্গ নাট্যগুলির ভিতর ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাসির গানে নানাজাতীয় হাসির কবিতাই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি ভণ্ডদের কর্ণমর্দ্দন করিবার জন্য রচিত, কিন্তু দুই চারিটি উদ্দেশ্যহীন বিশুদ্ধ হাসির ফোয়ারা। "বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলা," "বুড়োবুড়ী," "তানসান্-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ" "চাষার প্রেম", "সব সত্যি" প্রভৃতির ভিতর যদি কেহ কোন উদ্দেশ্য বাহির করিতে পারেন তবে তাঁহার অতি বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিয়া যাইতে হয়। অসম্ভব জিনিষের একত্র সমাবেশ করিলে স্বতঃই আমাদের হাসি পায়—এই হাসির বিশ্লেষণ করিতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তানসেন-বিক্রমাদিত্য-সংবাদের হাসি ঠিক এই জাতীয়। কবির আর দুইটি হাসির কবিতা সমধিক প্রসিদ্ধ সে দুইটি "আমি হোতে পার্ত্তাম" এবং "এমন অবস্থাতে পল্লে সবারই মত বদলায়" এই কবিতাদ্বয় সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক। কবির রচিত আর একজাতীয় হাসির গান আছে তাহা শুনিয়া আমরা হাসি বটে কিন্তু সে হাসা ঠিক

"লাথি খেয়ে ওরে চাষা বরং রে তোর উচিত হাসা
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে তবু আমার মনে জাগে।"

এরই জাতিভাই। কবির "ইরান দেশের কাজি" যখন আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও পাশীর মিথ্যাভাষিত্ব প্রভৃতি প্রমাণ করিয়া আমাদের হাসাইতে আসেন তখন প্রপীড়িতের দুঃখে আমাদের ন্যায় পদদলিতগণের চক্ষে জল আসে, কারণ তাহারা আমাদের দুর্দ্দশাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা কবিকে ব্যঙ্গপ্রিয় বলিয়াই জানি। অনেকের ধারণা তিনি ছোট-বড় সবাইকেই ব্যঙ্গ করেন। অর্থাৎ তিনি দশের কাছে বাহবা পাইবার জন্য মুরুব্বিয়ানা করিয়া সদনুষ্ঠাতৃ, একনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকেও ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না। যদি কাহারো এই ধারণা থাকে তবে তিনি কবিকে

বুঝিবার চেষ্টা মোটেই করেন নাই। আমরা বলিয়াছি "একঘরে" ও "Reformed Hindoos" প্রভৃতিতে অনেকটা গায়ের ঝাল ঝাড়িবার চেষ্টা আছে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত সুধু গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্যই কলম ধরেন নাই। তিনি যেমন স্বদেশের ভণ্ডামিকে ঝাঁটাইয়া বহিস্কৃত করিতে চাহিয়াছেন সেইরূপ দেশের মধ্যে যাহা ভাল, ও মনুষ্যত্বের নিদর্শন আছে তাহার রক্ষা যাহাতে হয় তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাদিগকে আলেখ্যের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। চতুর্দ্দশ চিত্রটির নাম নেতা। কবি মেকী নেতাগণের ভক্তিহীন স্বদেশপ্রেম ও অনুপ্রাসে ক্রন্দনের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। নেতাদের অনেকেই যে এই সুযোগে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়াছেন তাহাও কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়ায় নাই। কবি লিখিতেছেন :—

"কেউবা খাসা নিজের থলে ভরে নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা ;
কেউবা খাসা দুপয়সা বেশ করে নিল
বিদেশীকে দিয়ে দেশী ছাপ্পা।"

"নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের কটি ছাত্র ;
পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।"

"খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে নাক,
মরে যদি পরের ছেলেই মর্ব্বে ;
নিজের সিন্ধুক বন্ধ করে বসে থাক,
(বটে, তখন তুমি তা কি কর্ব্বে ?")

কবি ক্রোধে ও ঘৃণায় এই সকল স্বয়ংসিদ্ধ নেতাগণের চক্ষু ফুটাইবার জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ইহাদের চক্ষু ফুটিলেই দেশের ও দশের মঙ্গল। ইহারা "নামের জন্য জুয়াচুরি" আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহা অপেক্ষা ঘৃণার বিষয় কিছুই নাই তাহাই করিতেছে :—

"মায়ের নামটাও কর্চ্ছে অপবিত্র !!!"

ইহাদের চিত্র হইতে ঘৃণায় নয়ন ফিরাইবামাত্র আমাদের চোখের সামনে জনৈক প্রকৃত মাতৃভক্তের চিত্র ফুটিয়া উঠে। সেই চিত্রের নমুনা আশা করি, আপনারা নিজেই দেখিয়া লইবেন। সেই চিত্রটি দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন অপর ব্যঙ্গকবি হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের পার্থক্য কোথায়। এই বিষয় কবি নিজেই বলিয়াছেন :—

"ব্যঙ্গকবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু—সকলে?
কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ নকলে।
যেথা আবর্জ্জনা, ধরি সম্মার্জ্জনা;
তাই বলে আমিত অন্ধনা;
যেখানে দেবতা, ভক্তি পুষ্প দিয়ে
স্তুতি ছন্দে করি বন্দনা।"

"বিরহ", "আষাঢ়ে" প্রভৃতি রচিত হইবার সময় হইতে এতাবৎকাল কবির যে সকল হাস্যেতররসাত্মক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরই কয়েকটি "মন্দ্র" ও "আলেখ্যে" প্রকাশিত। ঐ উভয় পুস্তকই বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। "মন্দ্র" কাব্যের কবিতাগুলি কেবলমাত্র হাস্যরসাত্মক নহে। প্রত্যেক কবিতাতেই হাস্য করুণ

প্রভৃতি নানা রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে। নমুনা স্বরূপ আমরা যে কোন কবিতার নাম করিতে পারি। "মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে। এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। মন্দ্র কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা যেন নব নব গতিভঙ্গে নৃত্য করিতেছে। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। "আলেখ্য" পুস্তকখানি "মন্দ্রের" অনেক বৎসর পরে প্রকাশিত এবং এখানি মন্দ্রের জাতি ভাই নহে। যাহাকে চিত্র বা নক্সা বলে আলেখ্যের কবিতাগুলি সেই জাতীয়। বঙ্গভাষায় এই জাতীয় কবিতা অধিক নাই। আলেখ্যের অধিকাংশ চিত্রই করুণ রসাত্মক। "মাতৃহারা", "হতভাগ্য" প্রভৃতি চিত্র-গুলি দেখিলে কাহার না চক্ষে জল আসে। আমাদের বিশ্বাস "মন্দ্রে" যতটা ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে "আলেখ্যে" তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। হাসির গানের লেখক যে সুন্দর করুণ রসাত্মক কবিতাও লিখিতে পারেন তাহা না পড়িলে কাহারও বিশ্বাস হইবে না। আলেখ্যের ভাষা, ভাব সমুদয় খাঁটি বাংলা। এই বইখানি সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে তাহা কবির নিজের ভাষায় বলাই ভাল :—
"আলেখ্যের পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে তার মানে দশজনে দশ রকম বের করে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে। কোন কবিতায় দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বল্‌বো যে সেটা আমার ভাষার দোষ; বৃহৎ ভাব দাবী কর্ব্ব না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণা কর্ত্তে পারি সেই ভাব

সম্বন্ধেই লিখি; আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝ্‌তে পারি।" যাঁহারা কবির আনন্দবিদায় বা "up to date কৃষ্ণলীলা" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই উদ্ধৃত কথা কয়েকটীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর নাটককার দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। দ্বিজেন্দ্রলাল "পাষাণী", "তারাবাই", "রাণাপ্রতাপ", "দুর্গাদাস", "সীতা", "নুরজাহান", "মেবারপতন", "সাহজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", "পরপারে" ও "সিংহল-বিজয়" এই এগারখানি নাটক "সোরাব রুস্তম" নামক একখানি অপেরা (নাট্যরসিক), "আনন্দবিদায়", "পুনর্জ্জন্ম", "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" ও পূর্ব্বোক্ত কয়েকখানি ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছেন। "সিংহল-বিজয়" কবির শেষ দান এবং মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এই গ্রন্থখানি সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন। "সিংহল-বিজয়" এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই।—আশা করা যায় বইখানি "সাজাহান" লেখকের অনুপযুক্ত হইবে না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে "আনন্দবিদায়", "পুনর্জ্জন্ম" ও "হরিনাথ" কবির উপযুক্ত নহে। "তারাবাই" এর নাটকীয় উপাখ্যান-টিতে একটু রোমান্স আছে কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি খুব বেশী ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। অন্যান্য নাটকগুলির কোন্‌খানা স্থায়ী হইবে এবং কোন্‌খানা হইবে না তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না; আমাদের বিশ্বাস তাহাদের সকলগুলিতেই স্থায়িত্বের লক্ষণ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। কোন এক বিখ্যাত কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক "সাজাহান" পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, এতদিনে বাংলা ভাষায় Study করিবার উপযুক্ত একখানি নাটক হইল। নিপুণ চরিত্রাঙ্কনেই নাটককারের শক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাত্র-পাত্রীর কথায় নাটকের বর্ণনীয় উপাখ্যান ফুটিয়া উঠে সত্য,

কিন্তু পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া একটি গল্প বলাইলেই নাটক হয় না। নাটকের আর একটি নাম দৃশ্যকাব্য। ছন্দোবদ্ধ ও শ্রুতিসুখকর বাক্যের সমষ্টিই কাব্য নহে। নিতান্ত ইট-পাথুরে গদ্যের ভিতরও কাব্যসুন্দরী সময় সময় স্বীয় অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখেন। জহুরী যেমন পাথুরিয়া কয়লার ভিতর হীরকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তেমনি হৃদয়বান্ ব্যক্তি সাংসারিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও কাব্যের উপযোগী সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কাব্যে কেবল মেঘমালার পর-পারের দেশের পরীকন্যাগণের কাহিনী বর্ণিত হয় না; আমাদের আট-পহুরে জীবনের আহার-নিদ্রার কাহিনীও কাব্যে বর্ণিত হয়।

কবি তিনিই যিনি বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের সুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; কবি তিনিই যিনি সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন এবং কবি তিনিই যিনি "শিবেতরক্ষতয়ে" অর্থাৎ অমঙ্গল বিনাশের জন্য স্বকীয় প্রাণের রংএ অঙ্কিত অনন্তদেবেশ জগন্নি-বাসের চিত্র জগৎবাসীকে দেখাইয়াছেন। এই সকল বরেণ্য কবির তুলিকা-স্পর্শে আমাদের চারিপার্শ্বের জগতের যে সকল উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা "অবাক্ হইয়ে থাকি।" নবীনা জননীর ক্রোড়ে শিশু না দেখিয়াছে কে? কিন্তু এই চিরপরিচিত দৃশ্যটিকে র‍্যাফেল যে চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই চক্ষে আমরা কখনো দেখিয়াছি কি?

"আয় চাঁদ আয় রে চিক্ দিয়ে যারে" এই ছড়াটি বলিয়া "নূতন মাতা" শিশুকে চাঁদ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু এই শিশুকে চাঁদ দেখানোর চিত্রটির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহা একমাত্র কবি দ্বিজেন্দ্রলালই দেখিয়া-ছেন এবং তাঁহার দেশবাসীকে দেখাইয়াছেন। তাই তিনি কবি। কবি নিজেই লিখিয়াছেন :—

"নিদাঘ-সন্ধ্যার মহান্ দৃশ্য যাহার পক্ষে বর্ণসার,
কবিই নয় সে তাহার আত্মা শুদ্ধ পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সেই যে সে সৌন্দর্য্যে দেখে একটা মহাপ্রাণ;
কবি সেই যে দেখে বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান্।"

কাব্য সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা—মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য। বর্ত্তমান যুগের ধাত ঠিক মহাকাব্যের উপযোগী নহে। আজ-কাল নাট্যকাব্য ও গীতিকাব্যেরই প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। আপনারা কস্তুরিমৃগের কথা সকলেই জানেন। কস্তুরি-মৃগ নিজের দেহের সৌরভে আকুল হইয়া সমগ্র বন-গ্রাম ভ্রমণ করে এবং সর্ব্বত্রই সেই অপূর্ব্ব সৌরভ অনুভব করিয়া থাকে। গীতি কবিতার কবি ঠিক কস্তুরিমৃগের ন্যায়। তিনি নিজেকেই লইয়া সতত ব্যস্ত। সমগ্র জগতকে তিনি দেখিয়া থাকেন, নিজের অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট সমগ্র জগতের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া গিয়াছে। তাই গীতি-কবিতার তানের মধ্যে কবির সুখ দুঃখের, আশা-নিরাশার সুরটিই বিশেষ করিয়া বাজে। গীতি-কবিতার পাঠক কবির সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সহিতই বিশেষরূপে পরিচিত। গীতি-কবিতা পাঠ করিবার সময় পাঠকের প্রাণের বীণার তার কবির প্রাণের বীণার তারের সহিত এক-সুরে বাঁধা হইয়া যায়। আপনারা শব্দবিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন যে, যদি একগৃহে একই সুরে বাঁধা দুইটি বীণা-যন্ত্র থাকে, তবে একটিতে যে গান বাজান যায় অপরটিতেও ঠিক সেই গান বাজিতে থাকে। সংগীত শ্রবণ করিবার সময় কিম্বা গীতি-কবিতা পাঠ করিবার সময়ও ঠিক তাহাই হয়। আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা ভুলিয়া গিয়া কবির সহিত এক মন এক প্রাণ হইয়া "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি" এক মানস-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকি। শ্বেত-দ্বীপের কবি Dryden এর রচিত Alexander's Feast এ এই

সত্যটি বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে। Alexander's Feast যে খুবভাল গীতিকবিতা তাহা বলিতেছি না। একটি উদাহরণ দিতেছি :—কবি Wordoworth এর *Lucy Gray* ও *Lucy* নামক সর্ব্বজন-বিদিত দুইটি কবিতা গ্রহণ করুন। "Lucy Gray" খুব উৎকৃষ্ট কবিতা কিন্তু তাহা সংগীত নহে; অথচ ঐ দ্বাদশ লাইনের ক্ষুদ্র কবিতা *Lucy* সংগীত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার-পতনের "ভেঙ্গে গেছে মোর" গানটির উল্লেখ করিয়াছি এবং সে গানটির অর্থ আমরা যাহা বুঝি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে তাহা একটি সংগীত। কবির আর্য্যগাথা হইতে যে গানটি ইতিপূর্ব্বে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাও একটি সংগীত। ঐ কবিতাটিতে কবি তাঁহার একটি সুখ-স্মৃতির কথা আমাদিগকে শুনাইতেছেন কিন্তু যখন কবিতাপাঠ সমাপ্ত হয় তখন আমাদের মনে হয়, যেন আমরা জড়জগতের বাহিরে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা যেন অতীত সুখ স্মৃতির রাজ্যে বিচরণ করিতে-ছিলাম। অতএব বলিয়াছি যে কবিতাটি একটি সংগীত। "চণ্ডীদাস" "বিদ্যাপতি" "রামপ্রসাদ" প্রভৃতি গীতিকবিগণের রাজা। তাঁহাদের সংগীতের তুলনা জগতের সাহিত্যে বিরল! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হাসির গানের কবি যে করুণরসাত্মক কবিতা লিখিতে পারেন তাহা না পড়িলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আর্য্যগাথা ও Lyrics of Ind এর কবির "নুরজাহান" ও "সাজাহান" রচনা করা তদধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। নাট্য-কাব্যের ধাত ও গীতিকাব্যের ধাত এক নহে। নাটককার একজন দর্শক। জগতের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে কিরূপে মানব-চরিত্রের অভিব্যক্তি হয় তাহই দেখান নাটকের অথবা দৃশ্য-কাব্যের উদ্দেশ্য। নাটককারকে একজন সুনিপুণ মনোবিজ্ঞানবিদ্ হইতে হইবে। মানব-চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে নাটক রচনা করা

যায় না। কিরূপ পারিপার্শ্বিকের সংঘর্ষে কিরূপ চরিত্রের অভিব্যক্তি হইবে নাটককারের তাহা জানিতে হইবে। অনুভূতি ও চিন্তার প্রকৃতি কি নাটককার তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে মানবের মনে কিরূপ অনুভূতির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে তাহা তিনি জানেন। উভয়েই মনস্তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু তাই বলিয়া William James একটি Hamlet গড়িতে পারিতেন না অথবা Shakespeare "Principles of Psychology" রচনা করিতে পারিতেন না। সেক্ষপীয়র একটি গোটা Hamlet তৈয়ার করিয়াছেন কিন্তু সেই Hamlet এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদিগকে খুলিয়া দেখাইতে হইলে তিনি William James এর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নাটককারের কার্য্য সংশ্লেষক (অর্থাৎ Synthetic) ও মনোস্তত্ত্ববিদের কার্য্য বিশ্লেষক অর্থাৎ (Analytic)—উভয়েই জগতের ক্রোড়ে পালিত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানবের সহিত মেলামেশা করিয়া আপনাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন কিন্তু মনো-বৈজ্ঞানিক সেই অভিজ্ঞতার ফলে জটিল মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া মনোজগতের ঘটনাবলীকে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইতেছেন এবং নাটককার স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ মাল-মসলাসহযোগে একটি জটিল মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়া জনসাধারণকে উপহার দিতেছেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, একজনের কল্পনা বিশ্লেষকারী (Analytic) এবং অপরের কল্পনা সৃষ্টিকরী (Constructive)। আমরা মনোবিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছি যে, দুষ্ক্রিয়ার সহযোগী সয়তান এবং সৎ-কর্ম্মের চিরসহচর পরমেশ্বর অথবা দুষ্ক্রিয়ার চিরসঙ্গী অনুতাপ এবং সৎ-কর্ম্মের পুরষ্কার "আত্মতুষ্টি" ও "বিবেকের সহায়তা" (অর্থাৎ Green এর কথিত Self-Satisfaction এর Martineau কথিত Approval of

Conscience)। আমরা মনোবিজ্ঞানে আরও দেখিতে পাই কিরূপে মানব সয়তানের রাজ্য পদদলিত করিয়া ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করে। জার্ম্মান-দার্শনিক ফিকৃটা বলিয়াছেন ঃ—"পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা একটি অলৌকিক ঘটনাবিশেষ (miracle) কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার আরম্ভ আমাদের অন্তঃকরণেই হওয়া উচিত।" আমরা যতদিন আমাদের অন্তরে অন্তরে না বুঝি এটা পাপ ততদিন শত উপদেশেও সেটাকে পরিত্যাগ করি না। কিন্তু পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় পুণ্যের সহিত পাপের তুলনায়। আমাদের নিজেদের পাপের গুরুত্ব যখন আমরা অনুভব করিতে পারি তখনই অনুতাপ জন্মে। বায়ু যেমন অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে লোকনিন্দা ও সমগ্র জগতের ঘৃণা তেমনি পাপীর অনুতাপের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে থাকে। তখন বিধাতার করুণা প্রেমাস্পদের আহবানরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া অনুতাপের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। তখন আমরা পাষাণী অহল্যার মত বলি—"নাথ! তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি, কোথা তুমি? কতদূর? সঙ্গে করে লও।" যেমন হীনধাতুমিশ্রিত স্বর্ণকে পোড়াইলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া স্বকীয় স্বাভাবিকী আভায় আমাদের নয়নরঞ্জন করে তেমনি অনুতাপের দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে পুনরায় পাপীর হৃদয়ও কৌস্তভ মণির ন্যায় ভগবানের বক্ষে বিরাজ করে। উপরে যে সকল মনোবিজ্ঞানের "airy nothings"এর কথা বলা হইল, কবি তাহাদিগকে একটি "local habitation and name" দিয়াছেন তাঁহার "পাষাণী" নাটকে। যে পাষাণী স্বেচ্ছায় পাপিনী সেই পাষাণীই আবার প্রত্যেক হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া। রামায়ণের কবি "পাষাণীর" উপাখ্যানে যে মনোবিজ্ঞানের কথাগুলি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা না বুঝিতে পারিয়া অনেক কবিই পাষাণীর উপাখ্যানের যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সমালোচকশ্রেষ্ঠ বিজয়চন্দ্র

মজুমদার মহাশয় "পাষাণীকে" জর্ম্মাণ কবি গেটার "ফাউষ্টের" সহিত তুলনা করিয়াছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় পাষাণী-সমালোচনায় বলিয়াছিলেন:—"অপূর্ব্ব, সুন্দর, মহান্; ফিডিয়সের ভাস্কর-কর্ম্ম, রাফেলের চিত্র। মহর্ষি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপীয়রের নিন্দার বিষয় নহে।" এই সমালোচনাদ্বয় যে অত্যুক্তিদোষদুষ্ট সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু কবির পাষাণীও যে এক অপূর্ব্ব বস্তু তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। মহাকবি মিল্টনের Paradise lost ও Paradise Regainedএর তুলনা জগতের সাহিত্যে বিরল। উদ্দেশ্য-হিসাবে বিচার করিতে গেলে আপনারা পাষাণীকে একখানি Paradise lost ও Paradise Regained বলিতে পারেন। কবিত্ব-হিসাবে Miltonএর সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা করিতেছি না, কেননা তাহা করিলে লোকে আমাকে পাগলাগারদে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবে। পাষাণী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে অর্থাৎ "আষাঢ়ে" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে। "পাষাণী" হইতেই কবির জীবনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। কবির জীবনের প্রথম অধ্যায় "গীতি-কাব্যের যুগ," দ্বিতীয় অধ্যায় "হাসির গানের যুগ" ও তৃতীয় অধ্যায় "নাট্যকাব্যের যুগ"। কবির জীবনের তৃতীয় অধ্যায়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু কথাগুলি আপনারা সকলেই জানেন অতএব অতি বিস্তার করিয়া বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। পাষাণীর পর কবি যতগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "সীতা" ও "পরপারে" ব্যতীত সকলগুলিই ঐতিহাসিক। "পরপারে" গ্রন্থখানি দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রথম সামাজিক নাটক। গল্পটি করুণরসাত্মক—আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা ভাল, "পরপারে পাঠ করিয়াই পাঠক যেন বঙ্গীয় সমাজ-সম্বন্ধীয় কোন ধারণা করিয়া না বসেন।"

ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে "চন্দ্রগুপ্ত" হিন্দুযুগের এবং অপর কয়েকখানি মুসলমান রাজত্বকালের কোন না কোন ঘটনা অবলম্বনে রচিত। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে কবি হিন্দু নাটককারগণেরই অনুসরণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ চাণক্যের প্রভুত্ব দেখাইয়াছেন। চাণক্যের চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে কিন্তু গ্রন্থের নায়ক চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হয় নাই। চাণক্যের পার্শ্বে চন্দ্রগুপ্তকে নিতান্তই নিষ্প্রভ দেখায়। "আন্টিগোনাস" চরিত্রটি অতি যত্নের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। আর একটি চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি "হেলেন" কিন্তু হেলেনকে "মেহেরউন্নিসার" চিত্র দেখিবার পর অতীব নিষ্প্রভ মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের প্রথম দৃশ্যে ভারতবর্ষের বর্ণনা অতি সুন্দর। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবির মতে প্রধান গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয় করিতে হইবে। সে কি উজ্জ্বল দৃশ্য! প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয় জগতে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা আনয়ন করিবে। সে সভ্যতা ও সে উন্নতির নিকট বর্ত্তমান য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রাণহীন সভ্যতা পরাজয় স্বীকার করিবে। অতঃপর যে চরিত্র এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে সেই চাণক্য-চরিত্রের পরিচয় দিতে চাহি। চাণক্যের চরিত্রচিত্রণে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই চাণক্য শ্মশানবাসী। যে সকল বন্ধন মানুষকে সংসারে ধরিয়া রাখে চাণক্যের একটি একটি করিয়া সে সকলগুলিই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। চাণক্যের হৃদয় নাই। অত্যাচারে, অবিচারে প্রপীড়িত হইয়া চাণক্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে প্রবল প্রতিবিধিৎসা-বহ্নি নিরন্তর ধিকি-ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। এই অবস্থায় মানুষ, মানুষকে মানে না, সমাজকে মানে না এবং পরমেশ্বরকেও মানে না। ইহারা পরমে-

শ্বরের বিদ্রোহী পুত্র—Milton এর সয়তানের সহিত সমন্বয়ে ইহারাই বলিয়া থাকে "Evil be thou my good" চাণক্য সয়তানকে তাঁহার প্রেয়সী করিয়াছেন এবং সয়তানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলে যেরূপ হইয়া থাকে চাণক্য ঠিক সেইরূপ। চাণক্য কূট, চাণক্য প্রতিভাবান্, চাণক্য সয়তানের রাজা, চাণক্য হৃদয়হীন, চাণক্য নাস্তিক, চাণক্য প্রতিহিংসাপরায়ণ, ও চাণক্য ব্রাহ্মণের লুপ্ত প্রভুত্বের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন চাণক্যের চরিত্র কত জটিল। আমরা জানি মানুষ রাক্ষস হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না! কোন না কোন সময়ে সেই মনুষ্যত্ব আত্মপ্রভাব বিস্তার করিবেই করিবে। এই কথাটি কবি অতি সুন্দর করিয়া তাঁহার চাণক্যে দেখাই-য়াছেন। যখন চাণক্য পর্ব্বতশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপতনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখনও তাঁহার অন্তর্লীন মনুষ্যত্ব একেবারে মরিয়া যায় নাই—তখনও থাকিয়া থাকিয়া হৃতাকন্যা আত্রেয়ীর কথা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়-মরুকে সরস করিত। কিন্তু দূরে ঐ কাহার কণ্ঠ শুনা যায়—কে ভিখারিণী রাজপথে করুণকণ্ঠে গান গাহিয়া যাই-তেছে? ঐকি সেই—ঐকি হৃদয়হীন চাণক্যের সর্ব্বস্বধন—ঐকি হৃতা-কন্যা আত্রেয়ী? হাঁ ঐত সেই—ঐত হৃতা আত্রেয়ী! চাণক্য বুঝিতে পারিলেন না তিনি জীবিত কি মৃত! তিনি জানেন না তিনি স্বর্গে কি নরকে! তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না ভিক্ষুককে দণ্ড দিবেন কি পুরস্কার দিবেন! এখন আর চাণক্য হৃদয়হীন নহেন—তাঁহার ভাঙ্গা-হৃদয় আবার জোড়া লাগিয়াছে—তিনি মগধরাজ্যাপেক্ষা বড় রাজ্য পাইয়াছেন সে আত্রেয়ীর স্নেহের রাজ্য। তিনি এখন সেই রাজ্যের রাজা—পিশাচ

চাণক্য এখন আবার মানুষ চাণক্য—চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব আর তিনি চাহেন না। এখন তিনি যে রাজা, আর মন্ত্রিত্বের ভিখারী হইবেন কোন্ দুঃখে? কবির অপর কয়েকখানি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। চরিত্র-চিত্রণে, কবিত্বে, ভাষার মধুরতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে তাহারা বংলা নাটকের আদর্শ। "সাজাহান," "নুরজাহান," "রাণাপ্রতাপ," "দুর্গাদাস," ও "মেবার-পতন" কবিকে বঙ্গভূমে অমর করিয়া রাখিবে। সাজাহানের ঔরংজীব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সাধ্য আমার নাই, নুরজাহানের নুরজাহান-চরিত্র বুঝাইতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হয় এবং রাণাপ্রতাপের শক্তসিংহকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। দুর্গাদাসের "দুর্গাদাস" ও "দিলীর খাঁ" আদর্শ মানুষ এবং দীন "কাসিম" স্বর্গের দেবতা। এই তিনটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়া কবির লেখনি ধন্য হইয়াছে এবং নিরীক্ষণ করিয়া সাহিত্য-পাঠকের নয়ন সার্থক হইয়াছে। রাণাপ্রতাপের মেহেরউন্নিসার চরিত্র এক অপূর্ব্ব জিনিস। মেহেরউন্নিসার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে "মেবার-পতনের" মানসীতে। মানসীর চিত্র নিরীক্ষণ করিলে বস্তুতঃই কাব্যবিশারদের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে:—"ধন্য সেই কবিবর; ধন্য সেই চিত্রকর চিত্রিত মানসী দেবী যার তুলিকায়।" কবির এই কয়েক-খানি গ্রন্থ বুঝিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমতঃ "ব্যষ্টিভাবে" বুঝিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে "সমষ্টিভাবে" বুঝিতে হইবে। ঔরংজীবকে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাজাহানের ঔরংজীবকে বুঝিতে হইবে তৎপরে দুর্গাদাসের ঔরংজীবকে বুঝিতে হইবে এবং তৎপরে কিরূপে সাহাজানের ঔরংজীব দুর্গাদাসের ঔরংজীবে পরিণত হইলেন তাহাই বুঝিতে হইবে। আমাদের সময়াভাবে উক্ত গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিতে পারিলাম না। কবি "মেবার-পতনের" ভূমিকায় স্বীয়

নাটকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কবি ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের (বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয়ের) উপর থাকিল। উপসংহারে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসীকে যাহা শিখাইতে চাহিয়াছেন সেই বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। কবি কিরূপে বঙ্গ-সমাজ হইতে ভণ্ডামি প্রভৃতি দূর করিয়া মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধের অনেক স্থানেই বলিয়াছি। কবি কিরূপে বঙ্গবাসিগণের প্রাণে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছেন তাহা তাঁহার কয়েকটি সংগীত পাঠ করিলেই বোঝা যায়। হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া যে মায়ের পূজা করিতে হইবে তাহা তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই বলিয়াছেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সান্যাল।

নাট্য সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ যখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকার-সমাচ্ছন্ন, হিন্দুস্থান তখন সভ্যতাগগনে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল। বৈদিককালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দেবগণের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ হইতেই কলাবিদ্যার বিমল স্নিগ্ধ কিরণ দিগদিগন্ত আলোকিত

করিয়াছিল। কলাবিদ্যার প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত-শাস্ত্র। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ভিত্তিমূলক সঙ্গীতশাস্ত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সঙ্গীতকে হিন্দুগণ মুক্তির সর্ব্বপ্রধান সোপান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ব্রহ্মা চতুর্মুখে বেদগান করিতেন; মহাদেব পঞ্চমুখে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানে-মশানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভগবান ভক্তকুল-শ্রেষ্ঠ নারদকে বলিয়াছেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সেইজন্যই বোধ হয় নারদঋষি বীণাযন্ত্র সহকারে হরিগুণ গান করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন; আর্য্যঋষিগণ অমৃতোপম উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে বেদগান করিয়া পুণ্যতোয়া তটিনীতট ও চিরশান্তি-নিকেতন তপোবন মুখরিত করিয়াছেন। অতীত বৈদিকযুগের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় নদীয়ার অবতার চৈতন্যদেব সঙ্গীত-সাহায্যেই এই নীতির

"জীবে দয়া নামে রুচি ভক্তি নারায়ণে,
সকল ধর্ম্মের পরে রাখিও স্মরণে।"

প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শুনাযায় সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ একমাত্র সঙ্গীতমন্ত্রেই মহামায়ার মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া সিদ্ধ-পুরুষের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতেন। সঙ্গীতের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়াই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

"জপ কোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটী গুণং লয়ঃ।
লয়কোটী গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।"

সেইজন্যই বোধ হয় আর্য্যঋষিগণ দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক-কার্য্যকলাপ-বিষয়ক মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণে সুর ব্যবহার করিতেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে

সঙ্গীত সর্ব্বত্র পূজিত। শোকতাপবিদগ্ধ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতে সঙ্গীত অদ্বিতীয়। সঙ্গীতের আকর্ষনী শক্তি বনের পশু প্রভৃতি ইতর জীবগণকেও আকৃষ্ট করে। ধন্য সঙ্গীত! ধন্য তোমার অলৌকিক দিব্যশক্তি! নৃত্য-গীত-বাদ্যের সাধারণ সংজ্ঞাই সঙ্গীত।

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।"

সঙ্গীতের এই তিন অংশের সহিতই নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কিত। নাট্য-সাহিত্য সঙ্গীতশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নাট্যকলার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, মহর্ষি ভরতই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম নাট্য-কলার প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালের নাট্য-সাহিত্য-গ্রন্থের ও নাট্যকারগণের নামসংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির পূর্ব্বকালে "দশকুমার-চরিত" ও "কাব্যাদর্শ" রচয়িতা কবি নাট্যকার দণ্ডীর নাম দৃষ্ট হয়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির অভ্যুদয়-সময়কেই প্রাচীন ভারতে নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষের কাল বলা যাইতে পারে, ভারতের তদানীন্তন নাট্য-সাহিত্য অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া উন্নতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত ভাষার আদর থাকিবে, কাব্যের সম্মান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অমর কবি কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির অমূল্য গ্রন্থনিচয় সাহিত্য-জগতের অতি উচ্চ আসন অলঙ্কৃত করিবে। কালের সর্ব্ববিধ্বংসী নিয়মানুসারে হিন্দু-রাজত্বের অবসান হইলে এবং দেবভাষা সংস্কৃত বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে হিন্দু-সাহিত্য আর আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময়কেই প্রাচীন ভারতে নাট্যসাহিত্যের অপকর্ষের কাল বলা যাইতে পারে। যেমন এক রাজত্বের অবসান এবং অপর রাজত্ব-সংস্থাপন মধ্যবর্ত্তী-কাল

অতীব ভয়াবহ, সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সাহিত্য জগতেও সেই প্রকার এক ভাষার তিরোভাব এবং অন্য ভাষার আবির্ভাব মধ্যস্থ সন্ধিকাল ভয়ঙ্কর দুঃসময়। এক সংস্কৃত ভাষার স্থলে দেশ ও জাতিভেদে নানাভাষায় সৃষ্টি আরম্ভ হইল। বঙ্গভাষার সহিতই আমাদিগের সম্বন্ধ। অতএব বাঙ্গলা-ভাষার জন্ম ও ক্রম-বিকাশ হইতেই আমরা নাট্য-সাহিত্যের-সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বাঙ্গলাভাষা বিকাশের প্রাক্কালে দোহা, পদাবলী প্রভৃতি, পরে পাঁচালী ও ভাসান পরোক্ষভাবে নাট্য-কলার কার্য্য-সাধন করিয়া আসিতেছিল। অনুমান ২৫০ আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে "মনসার-ভাসান" রচিত হইয়া গীত হয়। ক্রমে নাট্য-কলার উপর বঙ্গের ধনী ও বিদ্বৎ-সমাজের শুভ দৃষ্টি পতিত হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা অস্থায়ী নাট্যশালা প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিতেন। মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের নিকট বাঙ্গলার প্রাথমিক নাট্য-সাহিত্য বহু বিষয়ে ঋণী। তিনি স্বয়ং বিদ্যাসুন্দর হইতে নাটক রচনা করিয়া পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গ-নাট্যালয়ে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন। আমরা অভিনয় পর্য্যায়ক্রমে তদনীন্তন প্রধান প্রধান নাট্য-সাহিত্যের নামোল্লেখ করিব।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শ্যামবাজারে বিদ্যাসুন্দর প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের স্ত্রী-চরিত্র স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কোন অজ্ঞাতলেখককর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভি-নীত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শার্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর

মাসে বেলগাছিয়ায় অভিনীত হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কৃতবিদ্য লোক এই নাটক অভিনয় করেন।

উমেশচন্দ্র মিত্ররচিত বাঙ্গলাভাষার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বিধবা-বিবাহ কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটীতে প্রথম অভিনীত হয়। কথিত আছে, কৃষ্ণবিহারী সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটার-সোসাইটী কর্ত্তৃক কৃষ্ণকুমারী প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের গানগুলি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের রচিত বলিয়া প্রকাশ। রামনারায়ণ তর্করত্নপ্রণীত সামাজিক "নবনাটক" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এবং মূল সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লিখিত "মালতী মাধব" ঐ সনেরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতার বাগবাজারে দীনবন্ধু বাবুর "লীলাবতী" প্রথম বার অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু বাবুর "নীলদর্পণ" লইয়া জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ীতে ন্যাশনেল থিয়েটার খোলা হয়। নটকুলচূড়ামণি পরলোকগত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় একই অভিনয়ক্ষেত্রে গোলকচন্দ্র, সাবিত্রী, মিঃ উড্ ও জনৈক চাষার চরিত্র অতিশয় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই মুস্তফী মহাশয় নাট্য-জগতে সবিশেষ পরিচিত হইয়া উত্তরকালে "নটকুল চূড়ামণি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধু বাবুর সর্ব্বপ্রধান ও শক্তিশালী নাটক "নীলদর্পণ" নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণে অতিশয় সাহায্য করিয়াছিল। নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া একজন ইংরেজী পাদ্রী অর্থ ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে মাইকেল মধুসূদন দত্তও নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করেন কিন্তু তিরস্কৃত হইয়া তাহা

প্রকাশ করিতে সাহসী হন নই। ইউরোপের অনেক ভাষায় নীলদর্পণ অনুবাদিত হয়। ইহা বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত সৌভাগ্য ও শ্লাঘার কথা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দীনবন্ধু বাবুর ২য় নাটক "নবীন-তপস্বিনী" এবং ঐ সনেরই ডিসেম্বর মাসে কবির শেষ-রচিত "কমলে কামিনী" ন্যাসনেল থিয়েটারকর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। বহুবাজার-নাট্য-সম্প্রদায়কর্তৃক মনোমোহন বসুর "হরিশ্চন্দ্র", "সতীনাটক", "প্রণয় পরীক্ষা নাটক" ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অভিনীত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ-রচনা "মায়াকানন" ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল অভিনীত হয়। শুনা যায় মাইকেল "রিজিয়া" নাটকও রচনা করেন; কিন্তু অপ্রীতিকর হইবার ভয়ে আর উহা অভিনীত বা প্রচারিত হয় নাই। মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধুবাবু অনেক প্রহসনও রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত "চক্ষু-দান" প্রহসন তৎপ্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দরের সহিত অভিনীত হয়। বঙ্গে স্থায়ী নাট্যশালা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্যেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অশ্রুমতী", "সরোজিনী" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক বেঙ্গল-থিএটারে অভিনীত হয়। এই সময় নাট্য-সাহিত্যজগতে দুইজন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয়; নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র ও কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়। ইঁহারা উভয়েই অদম্য উৎসাহভরে ও নিত্য নূতন উপচারে বাণীর সেবা করিয়া নাট্য-সাহিত্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বত্র সুপরিচিত বলিয়া ইঁহাদের গ্রন্থের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রাজকৃষ্ণ রায়ের ভক্তিরসাত্মক "প্রহ্লাদ-চরিত্র" ও গিরীশচন্দ্রের "চৈতন্য-লীলা" ধর্ম্মরাজ্যে এক নূতন যুগ অবতারণ করে। ইঁহাদের সময় অমৃতলাল বসুও নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের অকালমৃত্যুর পর মনীষী

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ "ফুলশয্যা" হাতে লইয়া নাট্য-সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত হন। ফুলশয্যা অভিনয়ের পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদ উদীয়মান নাট্যকবি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

"আলিবাবা" ক্ষীরোদপ্রসাদের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করে। নাট্য-সাহিত্য-জগতে "প্রতাপাদিত্য" ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ ও অদম্য স্বদেশপ্রেম ঘোষণা করে। নাট্যশালার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় অনেক হঠাৎ কবি আবির্ভূত হইয়া নাট্য-সাহিত্যক্ষেত্র আবর্জ্জনা-পূর্ণ করিয়া ফেলে। এই দুর্দ্দশার দিনে বীণাপাণি তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক স্বদেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে নাট্য-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আদেশ করেন। বাণীর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া রসিককবি দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুতকুলপ্রদীপ, বীরকেশরী প্রতাপসিংহকে নাট্যজগতে আবির্ভূত করেন। বাঙ্গলার "প্রতাপ" যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদের, রাজ-পুতানার "প্রতাপ"ও তেমন দ্বিজেন্দ্রলালের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ঘোষণা করে। একই সময়ে দুই "প্রতাপের" আবির্ভাবে নাট্যসাহিত্যে যেন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইল। দুই প্রতাপের প্রতাপে সুজলা-সুফলা-বঙ্গভূমি টলমল করিয়া উঠিল; নাট্য-সাহিত্যের সেই একটানা একঘেয়ে স্রোত হঠাৎ ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধকবি গিরীশচন্দ্রও পুরাণ এবং সমাজ লইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও ইঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। পরস্পর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে নাট্য-সাহিত্য বহুরত্নালঙ্কার লাভ করিল। গিরীশচন্দ্রের সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাসিম, ক্ষীরোদপ্রসাদের রঞ্জাবতী, চাঁদবিবি, রঘুবীর, পদ্মিনী, ও পলাশীর প্রায়-শ্চিত্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, সাজাহান, নুরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত ও মেবারপতন প্রতিযোগীতার অমৃতময় ফল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিতই আমাদের সম্পর্ক। অতএব

আমরা তাঁহার নাট্যসাহিত্যসম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নাটক লিখিবার পূর্ব্বে বিষয়-নির্ব্বাচন করা নাট্যকারদিগের প্রথম ও প্রধান কাজ। এইকাজে দ্বিজেন্দ্র-লাল গভীর গবেষণা ও বহুদর্শীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাটকই সমাজ ও সময়ের উপযোগী হইয়া রচিত হইয়াছিল। চরিত্রগঠনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; পাষাণী, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, সাজাহান ও নূরজাহান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাজপুতকুলগৌরব প্রতাপের চরিত্র কি মহান! কি মধুরতাময়! স্বদেশের স্বাধীনতা, স্বজাতির মান-মর্য্যাদা ও বংশ-গৌরব রক্ষার জন্য এরূপ অপূর্ব্ব কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অমানুষিক আত্মত্যাগ ও কঠোরকর্ত্তব্য পরায়ণতা মান-চরিত্রে সম্ভব হয় কি? কবি অতিসুন্দরভাবে এই সমস্তগুণ পরিস্ফুট করিয়া প্রতাপের দেবচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যোশীকে তিনি আদর্শ রাজপুতরমণী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বদেশের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, জাতীয় জীবন পতনোন্মুখ। আর স্বামী কিনা স্তবগীতি-পূর্ণ কবিতা লিখিয়া মোগল-সম্রাটের চাটুকারিতায় নিমগ্ন; রাজপুত-ললনা সহ্য করিতে পারিবে কেন? পতিকে জাগাইবার জন্য, স্বদেশপ্রেমে মাতাই-বার জন্য বীরাঙ্গনার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, সতী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; পতিকে বলিতে লাগিলেন "লেখাই যদি কবিতা, তবে এমন কবিতা লেখো যার ভাবে বিদ্যুৎ, ভাষায় গর্জ্জন; এমন কবিতা লেখো যার গম্ভীর সঙ্গীত বিরাট-বন্যার মত আর্য্যাবর্ত্ত ছেয়ে পড়ে; এমন কবিতা লেখো, যা পড়ে ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে; এমন কবিতা লেখো যাতে অন্যায়ের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে, অত্যাচারের মাথা থেকে মুকুট ভেঙ্গে পড়ে, অধর্ম্মের নীচে থেকে সিংহাসন নেমে যায়। গাও দেখি সেই গান, নাথ! একবার প্রাণ ভরে

শুনি।" কি আবেগময় ভাব! কি মর্ম্মভেদী ভাষা! পৃথ্বীরাজ গাহিয়াছিলেন সেই গান—সতীর দেহত্যাগের পর। ইহার পর দুর্গাদাস। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন "দুর্গাদাস-চরিত্র দেবদুর্লভ, স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার জিনিস।" রাখিয়াছেনও তিনি স্বর্ণপটে আঁকিয়া। কি ঘটনা-বৈচিত্রে, কি চরিত্র মাধুর্য্যে, কি রস-প্রাচুর্য্যে দুর্গাদাস কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাঠোরবীর দুর্গাদাস পরম স্বদেশভক্ত, কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগী,—সংযমী ও অতি উদারস্বভাবসম্পন্ন। বিজাতি বা বিজিত বলিয়া তাঁর ঘৃণা নাই, মনের সঙ্কীর্ণতা নাই। সেই জন্যই তিনি দিল্লীর খাঁর প্রশ্নোত্তরে বলিতে পারিয়াছিলেন; "আমার চেয়েও উন্নত চরিত্র দেখতে চাও যদি নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর। আরও দেখ্‌তে পেতে দিল্লীর যদি আজ কাশিম এখানে থাকতো।" ভাবের কি মহত্ব! হৃদয়ের কি উদারতা!

আশ্রিত-রক্ষণে দুর্গাদাসের অবারিত দ্বার। ঔরঙ্গজেব-পুত্র আকবর দুহিতা রাজিয়া সহ দুর্গাদাসের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে সমবেত সামন্তগণ আশ্রয়দানে অমত প্রকাশ করেন। দুর্গাদাস বলিয়া উঠিলেন "সামন্তগণ! ইচ্ছা হয় আমাকে পরিত্যাগ কর, আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিব না।" "সুরা পরিত্যাগ কর, নারীজাতির সম্মান কর" এই কথায় কবি দুর্গাদাসের নীতিপরায়ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাদাস সংযমী, গুল্‌নেয়ারের প্রেম প্রত্যাখ্যান তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অকৃতজ্ঞ অজিৎ সিংহের মূর্খতায় দেশত্যাগ করিয়া দুর্গাদাস ত্যাগীর পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য আমরাও কবির সঙ্গে সমস্বরে বলি "রাজপুতজাতির মধ্যে সেরা রাজপুত দুর্গাদাস।" মুসলমান-চরিত্রের মধ্যে দিল্লীর খাঁ বীর, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, প্রভুভক্ত, উদার ও গুণগ্রাহী। কাশিম সরল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও প্রভুভক্ত। যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নীর চরিত্রে দানব-দলনী শক্তির

বিকাশ-করিয়া কবি মহামায়া নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন। মহামায়া সতী-ধর্ম্মের জলন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাড়োবারবাসীগণকে স্বদেশপ্রেমে উত্তেজিত করিতেছেন। "মাইজীর জয়" গানে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিবার জন্য সুপ্তপ্রজাগণকে জাগরিত করিতেছেন। ওজস্বিনী ভাষায় মায়ের সেই মর্ম্মস্পর্শী ডাকে সন্তানগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, দলে দলে মায়ের অনুবর্ত্তী হইল। আর কত উল্লেখ করিব? কবি প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক চরিত্রই যথাযথভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। গ্রন্থ সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আর সেই ক্ষমতাও আমাদের নাই।

গ্রন্থেই কবির চরিত্র প্রতিফলিত হয়। এই গ্রন্থদ্বয় হইতেই আমরা কবির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, জানিতে পারিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু, অস্থিতে-অস্থিতে, গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে হিন্দু, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশবৎসল, মাতৃভক্তি তাঁর মেদমজ্জাগত ছিল। হিন্দুর গৌরব-প্রকাশে তাঁর পরম আনন্দ আর দুর্দ্দশায় তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার মনে সঙ্কীর্ণতা ছিল না। চরিত্র-অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাজাহানের চরিত্রগুলি জীবন্ত, কবির অঙ্ক-নিপুণতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বাণীর পূজায় বসিয়া তিনি কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

প্রহসন রচনায়ও তিনি অতিশয় কৃতীত্ব ও সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রহসন ব্যক্তিগত ব্যঙ্গোক্তিদোষে দুষ্ট নহে; কোন প্রকার নীচতা বা অশ্লীলতা তাহাতে স্থান পায় নাই। হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে তিনি নিতান্ত কৃতীত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হাসির গান, দেশের গান প্রভৃতি গীতি-কবিতা "যাবচ্চন্দ্র দিবাকর" কবির যশোগীতি কীর্ত্তন করিবে।

নাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত দুর্দ্দিন বলিয়াই মনীষী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

অসময়ে মহাপ্রস্থান করিলেন। যাও কবি সেই স্থানে, যে স্থানে মধুসূদন, দীনবন্ধু তোমাকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন; যাও কবি সেই স্থানে, যেখানে রাজকৃষ্ণ, মনোমোহন ও গিরীশচন্দ্র আছেন। ঐ দেখ সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তোমার জন্য স্বর্ণ-আসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যাও কবি, জননীর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ কর। স্বর্গে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক, অমৃতে অমৃত যোগ হউক।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী।

মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি

বিখ্যাত মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি বঙ্গ ও বিহারের প্রত্যেক ঘরে সুপরিচিত। বিদ্যাপতির নাম বা কবিতার বিষয় না জানে এমন বাঙ্গালী বা বেহারী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ হইলেও বঙ্গদেশবাসীরা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করিতে ছাড়েন না। তাঁহার কবিতাবলী বঙ্গদেশে এত সুদীর্ঘ কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন।

তৎকালে সম্ভবতঃ বঙ্গদেশীয় ভাষার সহিত মৈথিলভাষার অধিক পার্থক্য ছিল না। সেই সময়ে বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র-পারদর্শী বিবুধমণ্ডলী পরিশোভিতা মিথিলাদেশে গমনাগমন করিতেন। বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া উক্ত

বিদ্যার্থিগণ অন্যান্য শাস্ত্র-জ্ঞানের সহিত বিদ্যাপতির কবিতাবলীও মিথিলা হইতে আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিরসপ্রধান ধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-রসাত্মক বিদ্যাপতির পদাবলীও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচারিত হয়। কালবশে বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতাগুলির ভাষাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া অনেকটা বঙ্গভাষার আকার ধারণ করে। বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতাবলী কিরূপ ক্রমশঃ বঙ্গভাষাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রদর্শন জন্য নিম্নে কতিপয় পদাবলী উদ্ধৃত হইল। :—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি?
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে॥
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখির গলে।
দেখায়্যা বদন-চান্দে
তারে ফেলিয়া বিষম ফাঁন্দে
তুহু ত্বরিতে আওলি লখিতে নারিলি
ওই ওই করি কাঁন্দে॥
তাহে হৃদয় দরশি যোরি
মন করিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি
কানু জিয়াবি কি করি॥

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম॥
নিজ গণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ তুলহ করে দিহে জল দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥
মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেক মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখ মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কানে।
মরা দেহ দেহপরে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হম পিয়া দরশনে॥

পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

এইরূপ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা বঙ্গদেশে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। এই ভাষা হইতে বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলীর বিশেষতঃ মিথিলায় ও বেহারে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষার অনেকটা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বাহুল্য-ভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। এই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে সমস্তগুলি বেহার-অঞ্চলে সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারণে অনুমান হয় যে, অনেক বঙ্গদেশীয় কবিও স্বীয় কবিতায় বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই প্রকার বঙ্গভাষায়রচিত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ও বিদ্যা-পতির রচিত বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত কবিতাবলীর ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সাদৃশ্য দর্শনে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন "বঙ্গভাষা ও সহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব"গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি বীরভূমের নিকট কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও শিবসিংহ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলার মধ্যে কোনও স্থানের পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন এবং বিদ্যাপতি এই জমিদারের আশ্রয় থাকিয়া কবিতাদি রচনা করেন। অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বঙ্গভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। আর একজন লিখিয়াছেন যে, যশোহর জিলান্তর্গত ভুশু´টগ্রামনিবাসী ভবানন্দ রায়ের বিদ্যাপতি নামক এক পুত্র ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায় ছিল, কবিতাতে ইনি নিজকে বিদ্যাপতি নামে

পরিচিত করিতেন। ইহা তাঁহার উপাধি ছিল।১ কেহ কেহ এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিদ্যাপতি নামধেয় কোনও ব্যক্তি ছিল না। রায়-গুণাকর, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যাপতি একটি উপাধি এবং একাধিক ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।২

প্রথমতঃ ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেন যে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন ও বিস্‌ফিগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ও এই বিস্‌ফিগ্রাম শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে দান করেন।৩ ৺রমেশচন্দ্রদত্ত প্রভৃতিও রাজকৃষ্ণ বাবুর মত সমর্থন করেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীয়ারসন সাহেব বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী মিথিলা হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে যে তাম্রশাসন দ্বারা বিস্‌ফিগ্রাম দান করেন গ্রীয়ারসন সাহেব তাহা সমস্ত প্রকাশিত করেন।৪ তিনি পঞ্জী হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির সাময়িক মিথিলা-রাজবংশের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত করেন।৫ এইরূপে বিদ্যাপতিসংক্রান্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইলেও কেহ কেহ বিদ্যাপতির বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় বিরত হন নাই।৬

১। সোমপ্রকাশ ১০ই পৌষ সন ১২৭৯ সাল।

২। "I would suggest the possibility of there having been more than one Bidyapati and that the word is not a proper name but a title like Gunakar or Kabiranjan" John Beams.

৩। বঙ্গদর্শন ৪র্থ ভাগ ১৮৭৫ সাল।

৪। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1875 p. 143

৫। Indian Antiquary 1885. vol. xix. p. 196.

৬। কৈলাশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বঙ্গসাহিত্য" ৩১-৩৩ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাপতি বিস্‌ফিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিস্‌ফিগ্রাম এখনও দ্বারভাঙ্গা জেলায় বর্ত্তমান। কিন্তু চারি পুরুষ হইতে তাঁহার বংশধরগণ উক্ত বিসফিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত সৌরাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিসফিগ্রাম দ্বারভাঙ্গার মধুবনী সবডিবিসনের অন্তর্গত বেণীপট্টি থানার অধীন জরৈল পরগণাতে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের একটি উচ্চস্থানকে লোকে বিদ্যাপতির ভিটে বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই গ্রামে অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির কুলদেব বিশ্বেশ্বরীর মন্দির ও তাঁহার পাঠশালার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বিদ্যা-পতির ভিটের উপর একটি সুরঙ্গ আছে, তাহার অনেকটা বুজিয়া আসি-য়াছে। এই সুরঙ্গের মধ্যে বসিয়া তিনি নাকি ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন।

বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর প্রথমে বিসফিগ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সম্ভবতঃ রাজা নান্যদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন। বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র কর্ম্মাদিত্য মিথিলার রাজমন্ত্রী ছিলেন। পঞ্জীতে ইহাঁর নাম এইরূপ লিখিত আছে:—গড় বিসফিনিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে যে কীর্ত্তিশিলা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কর্ম্মাদিত্যের নাম উৎকীর্ণ আছে।[৭] ইহাঁর পুত্র দেবাদিত্য (মতান্তরে শিবাদিত্য) সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইহার পুত্র প্রসিদ্ধ মৈথিল-স্মার্ত্ত পণ্ডিত বীরেশ্বর ঠাকুর। ইনি বীরেশ্বর-পদ্ধতি, ছান্দোগ-দশকর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইহাঁর গ্রন্থানুসারে দশকর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহার

৭। এই শিলালিপি ২১৩ লসং অর্থাৎ ১৩২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয় যথা:—অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষেহদিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে"।

ভ্রাতা ধীরেশ্বর ঠাকুরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।৮ বীরেশ্বরের পুত্র প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ধীরেশ্বরের পুত্র জয়দেবঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহ ছিলেন। ইনি একজন পরমযোগী ছিলেন। ইঁহার পুত্র গণপতিঠাকুর বিদ্যাপতির পিতা ছিলেন। ইনি কামেশ্বর ঠাকুরবংশীয় রাজা গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে ইনি পুত্রলাভার্থ কপিলেশ্বর মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া বিদ্যাপতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মিথিলায় অদ্যাপি কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান আছে। ইনি "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার মাতার নাম হাঁসিনিদেবী।

বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ জানিতে পারা গিয়াছে। সেই সমস্ত ঘটনার তারিখের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুকাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলেই বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুর সময়-নির্ণয় সন্তোষজনক হয় নাই। যেহেতু এইরূপ কাল-নির্ণয়ে কোনও স্থলে অতি অপরিণত বয়সে অসাধারণ কবিত্ব কোনও স্থলে অতি বৃদ্ধবয়সে অতি শ্রমসাধ্য কার্য্যাদি তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এবং ইহা সমর্থনজন্য অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

৮। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর রাজা কামেশ্বর ঠাকুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের পুত্র চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন ইহা আমরা চণ্ডেশ্বরের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। অতএব চণ্ডেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বীরেশ্বর হরিসিংহ দেবের পরবর্ত্তী রাজা কামেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা অসম্ভব না হইলেও সামঞ্জস্যহীন বোধ হইতেছে। "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" রচয়িতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর নান্যদেববংশীয় রাজা শক্রসিংহ ও হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইহা সঙ্গত হইতে পারে বটে।

বিদ্যাপতির কাল-নির্ণয়ের সহায়ক নিম্নলিখিত ঘটনা কয়টি জানিতে পারা যায় :—

১। বিদ্যাপতি রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় পিতার সহিত যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি বালক ছিলেন। গণেশ্বর ২৫২ লসংএ অর্থাৎ ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

২। এসিয়াটিক-সোস্যাইটির লাইব্রেরিতে একটি হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকটি বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী গজরথপুরে ২১১ লসং এ অর্থাৎ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত।৯

৩। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ২৯৩ লসংএ ১৩২৯ শকে ১৪৫৫ সংবতে বিসফিগ্রাম দান করেন, ইহা উক্ত রাজপ্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।

৪। আমরা কামেশ্বর ঠাকুরবংশীয় রাজাদের বিষয় আলোচনা-কালে দেখিয়াছি যে, বিদ্যাপতি এই বংশীয় নিম্নলিখিত রাজা ও রাণীর রাজত্ব-কালে উপস্থিত ছিলেন :—

রাজা কীর্ত্তিসিংহ
" দেবসিংহ
" শিবসিংহ
রাণী লখিমাদেবী
রাজা পদ্মসিংহ
রাণী বিশ্বাসদেবী
রাজা নরসিংহ
" ধীরসিংহ
" ভৈরবসিংহ

৯। বিদ্যাপতি প্রণীত "কীর্ত্তিলতা"।

৫। রাজা ধীরসিংহ ৩২১ লসংএ বর্ত্তমান ছিলেন ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ভৈরবসিংহের সময় বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন।

৬। রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লসংএ রাজা হন।১০ এবং ইহার ৩।৪ বৎসর পরেই অর্থাৎ ২৯৭ লসংএর মধ্যে দিল্লীর সম্রাটকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিহত বা নিরুদ্দেশ হন। বিদ্যাপতির কবিতা পাঠে বোধ হয় যে, তিনি শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন যথা :—

"সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরষ পর সামর রূপ ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহ হম আয়ুবিহীন ॥"

রাজা গণেশ্বরের মৃত্যুকালে যদি বিদ্যাপতির বয়স ৮ বৎসর হইয়াছিল ধরা যায়, তাহা হইলে বিদ্যাপতি ২৪৪ লসংএ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বলা যাইতে পারে। রাজা শিবসিংহ ২৯৭ লসংএ নিরুদ্দিষ্ট হন। অতএব ২৯৭+৩২=৩২৯ বা ৩৩০ লসংএ বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ধীরসিংহ ৩২১ লসংএ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা তদীয় ভ্রাতা ভৈরবসিংহের ৯ বৎসর পরে ৩৩০ লসংএ রাজত্ব করা খুব স্বাভাবিক। ২৪৪ লসংএ বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিলে ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি স্বীয় কবিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে বিসফিগ্রাম দান পাইয়া-

১০। "অনল রন্ধ্র করলক্খন নরবই সক সমুদ্দ অগিনিসসী।
চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও বারবেহপ্পই জাউলসী ॥
দেবসিংহ জঁ পুহমী ছট্টই অদ্ধাসন সুররাঅসরু।" বিদ্যাপতি

অর্থাৎ হে নগরবাসীগণ তোমাদের পূর্ব্ব রাজা দেবসিংহ এই ২৩৯ লক্ষ্মণাব্দে চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবার স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন।

ছিলেন। এই ঘটনা ও ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের নিকট স্বীয় কবিত্ব-গুণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া আনা এই ঘটনা খুব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এবং এই সমস্ত ঘটনা বিদ্যাপতির অপরিণত বয়সে সংঘটিত হইবার স্বাভাবিকতা দেখাইবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যে বিদ্যাপতি ২৪৪ লসং বা ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে ৩৩০ লসংএ বা ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় যে বিদ্যাপতির আনুমানিক জন্ম-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমার নির্দ্দেশিত কালের বেশী পার্থক্য হইতেছে না।১১

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রের খুল্লতাত হরিমিশ্রের নিকট বিদ্যাপতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পক্ষধরমিশ্র ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। পক্ষধরমিশ্র ও বিদ্যাপতিসংক্রান্ত একটি গল্প প্রচলিত আছে তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। বিদ্যাপতির এক অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন শেষ হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। এক দিবস এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি অতিথিশালায় গেলে সমস্ত অতিথি দণ্ডায়মান হইল। কেবল একজন কৃশকায় অতিথি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোনে বসিয়া রহিল। বিদ্যাপতি বলিলেন :— "প্রাঘুণোঘুণবৎ কোণে সূক্ষ্মতান্নোপলক্ষিতঃ।" অর্থাৎ গৃহ-কোণে অবস্থিত সূক্ষ্ম কীটবৎ অতিথি সূক্ষ্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ শ্লোকের অপরার্দ্ধ দ্বারা উত্তর দিলেন :—"নহি স্থূলধিয়াং পুংস সূক্ষ্মে দৃষ্টি প্রজায়তে।" অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্মদৃষ্টি গোচর

১১। "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী" ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হয় না। তৎপরে বিদ্যাপতি পক্ষধরমিশ্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত মিথিলারাজসভায় যাতায়াত করিতেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে রাজা কীর্ত্তিসিংহের সভাসদ-রূপে দেখিত পাই। তিনি কীর্ত্তিসিংহের পৈত্রিক রাজ্যলাভ জন্য দিল্লী-গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া "কীর্ত্তিলতা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রাজা দেবসিংহের সভাতেও বর্ত্তমান ছিলেন। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ তাঁহার সমবয়সী ছিলেন। উভয়ে উভয়ের গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাপতি শিবসিংহের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, শিবসিংহ দিল্লীতে করপ্রেরণ বন্ধ করেন ও তৎজন্য দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আইসেন। বিদ্যাপতি প্রিয়-সুহৃদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহার উদ্ধার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন ও স্বীয় কবিত্বগুণে দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া শিব-সিংহকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন। বিদ্যাপতির কবিতাবলীতে শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর নামোল্লেখ যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবার আর কোনও রাজা বা রাণীরই নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর সময়েই তাঁহার কবিত্ব-শক্তি সবিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার কবিত্বের যশোভাতি এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, শিবসিংহ তাঁহাকে "নবজয়দেব" উপাধি দান করিয়াছিলেন।[১২] শিবসিংহ সিংহাসনারোহণ করিয়াই কবিত্ব ও সৌহার্দ্দের পুরস্কারস্বরূপ বিদ্যাপতিকে বিস্‌ফিগ্রাম দান করেন। এই

১২। "নবজয়দেব মহারাজ পণ্ডিতঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ"—শিবসিংহপ্রদত্ততাম্র-শাসন।

গ্রাম এত সুবিস্তৃত ছিল যে, এতদ্‌সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ মিথিলায় প্রচলিত আছে :—

"অমিয়া সৈ হর বিস্‌ফি বহে।
তেও বিসফি পড়লে রহে॥"

অদ্যাবধি বিদ্যাপতির বংশধরেরা এই গ্রাম ভোগ করিয়া আসিতেছেন।১৩

রাজ শিবসিংহ দিল্লীশ্বরকর্তৃক তৃতীয় বার আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে স্বীয়, পুরমহিলাদিগকে বিদ্যাপতিসহ নেপালের নিকটবর্ত্তী রাজ বনৌলী নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাপতি এই স্থানে দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি রাজা পুরাদিত্যের আদেশে ২৯৯ লসংএ লিখনাবলী নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই স্থানে তিনি সমস্ত ভাগবতগ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া ৩০৯ লসংএ সমাপ্ত করেন।১৪ বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবতগ্রন্থ অদ্যাপি তরৌণী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাণী লখিমাদেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাস দেবী, রাজা নরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও বীরসিংহের রাজ-সভা সুশোভিত করেন।

বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি ঠাকুর ও পুত্রবধূর নাম চন্দ্রকলা

১৩। এক্ষণে এই গ্রামের জন্য তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

১৪। "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন, এই ভাগবতগ্রন্থ ৩৪৯ লসংএ লিখিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ৩৩০ লসংএ বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন। পক্ষান্তরে বিদ্যাপতি ৩৪৯ লসংএ জীবিত থাকিলেও এত বৃদ্ধবয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করা অতি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ৩০৯ লসংএ ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করেন।

ছিল। ইনি বিদুষী রমণী ছিলেন। ইঁহার রচিত কএকটি পদ লোচন নামক কবির সঙ্কলিত "রাগতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী ও কন্যার নাম দুলীহ বা দুর্লভা ছিল; ইহা তাঁহার কোনও কোনও কবিতা হইতে জানিতে পারা যায়।

পদকল্পতরু গ্রন্থের দুইটি কবিতা পাঠে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে কবিকল্পনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ-কারের যথার্থতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। বীরভূমের অন্তর্গত নানুর গ্রামে খৃীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই কবি ও কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী। এমত অবস্থায় যে উভয়ে পরস্পরের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। চৈতন্যদেবের অনুচর অদ্বৈত প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণকালে মিথিলায় বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ হয়।

বিদ্যাপতি আনুমানিক ৩৩০ লসং এ অর্থাৎ ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে রাজা ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে কার্ত্তিক শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে গঙ্গাতীরে পরলোকগমন করেন।১ কথিত আছে যে, বিদ্যাপতির চিতা-

১। "বিদ্যাপতিক আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদশী জান॥"

২। বিদ্যাপতির মৃত্যু-সম্বন্ধে এক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে স্বীয় অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিতে পারিয়া বিদ্যাপতি গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করেন। যখন গঙ্গাতীর পঁহুছিতে ২ ক্রোশ বাকি আছে তখন তিনি বলিলেন যে, আমি

ভূমি ভেদ করিয়া এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। B. N. W. Ry. ষ্টেশন দলসিংসরাইএর নিকটবর্ত্তী মলকলিপুরে অবস্থিত একটি শিব-মন্দিরকে স্থানীয় লোকেরা বিদ্যাপতির চিতাধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর নির্ম্মিত মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মৈথিলিভাষায় রচিত পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি প্রায় অপ্রাপ্য বা বিরল প্রাপ্য। এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইস্থলে প্রদত্ত হইল।

১। কীর্ত্তিলতা—এই গ্রন্থ রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময় রচিত হয়। ইহাতে রাজা কীর্ত্তিসিংহের পৈত্রিকরাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দিল্লী গমন ও পৈত্রিকরাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল-মহারাজের লাইব্রেরিতে দেখিতে পান এবং সেথান হইতে নকল করাইয়া আনান। শ্রীনগরের রাজা ৺কমলানন্দ সিংহ মহাশয় ইহার পাঁচটি শ্লোক "সরস্বতী" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত নয়। ইহা কতক সংস্কৃত ও কতক প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত। বিদ্যাপতি এই ভাষাকে অবহট্টভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

২। পুরুষ-পরীক্ষা—এই গ্রন্থ রাজা শিবসিংহের আদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে কথাচ্ছলে ধর্ম্ম এবং রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ৪৮টি উপাখ্যান আছে। পুরুষনামধারী সকলেই যে পুরুষ নহে; প্রকৃত পুরুষের পরীক্ষা কি, উপাখ্যানচ্ছলে ইহাতে তাহাই

মাতা ভাগীরথীর ক্রোড়লাভ জন্য এতদূর আসিলাম, তিনি কি সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার জন্য এতটুকু পথ আসিবেন না। এই বলিয়া তিনি ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রির মধ্যেই গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া উক্ত স্থানে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি গঙ্গার স্তব করিতে করিতে উক্ত স্থানে দেহত্যাগ করিলেন।

বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গাররসও আছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন :—

শিশূনাং সিদ্ধয়র্থং নয় পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুক যুষাম্।
নিদেশাবিশঙ্কং সপদি শিবসিংহ ক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতি কবিঃ ॥৩॥

অর্থাৎ অপরিণতবুদ্ধি শিশুদিগের নৈতিক শিক্ষার জন্য ও পৌরস্ত্রীদিগের জন্য রাজা শিবসিংহের আদেশে কবি বিদ্যাপতি নিঃশঙ্কিতচিত্তে এই সমস্ত গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এই বঙ্গানুবাদ উক্ত কলেজে পড়ান হইত।

৩। লিখনাবলী—বিদ্যাপতি যখন দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের রাজসভায় রাজবনৌলিগ্রামে বাস করিতেন, সেই সময়ে ২৯৯ লসং এ উক্ত রাজার আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত পত্র-লিখন-প্রণালী লিখিত আছে।

৪। শৈবসর্ব্বস্বসার—রাণী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে রাণী লখিমাদেবী ব্যতীত ভবসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বাসদেবী পর্য্যন্ত মিথিলা-রাজবংশের দানশীলতা, দেবভক্তি ও বীরত্বাদি যশোবর্ণনকরা হইয়াছে। ইহাতে রাজ-কুলদেবতা মহাদেবের পূজা-অর্চ্চনার পদ্ধতিও লিখিত আছে।

৫। গঙ্গা-বাক্যাবলী—এই গ্রন্থও রাণী বিশ্বাসদেবীর আদেশে রচিত। এই গ্রন্থের শেষে এইরূপ শ্লোক আছে :—

"কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতি সূরিনা
গঙ্গাবাক্যাবলীদেব্যা প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা

৬। বিভাগসার—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের সময় রচিত। ইহা দায়াধিকারসম্বন্ধীয় স্মৃতি গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে :—

রাজ্ঞো ভবেশাদ্ধরিসিংহ আসীৎ।
তৎস্নুনা দর্পনারায়ণেন
রাজ্ঞো নিযুক্তোঽত্র বিভাগসারং
বিদ্যাপতি রাতনোতি।

৭। গয়া-পতন।—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের পত্নী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত হয়।

৮। দানবাক্যাবলী—এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞী ধীরমতিদেবীর আদেশে রচিত হয়।

৯। দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী—এই গ্রন্থ রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে রচিত হয়।১ ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহাতে দুর্গাপূজাপ্রণালী বিবৃত আছে। অদ্যাপি মিথিলায় এই গ্রন্থানুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও মৈথিলীভাষায় রচিত কবিতাবলীর জন্যই তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কবিতাবলীর কোনও প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ মিথিলায় পাওয়া যায় না। তদ্দেশে বিদ্যাপতির কবিতাবলী লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বরং বঙ্গদেশীয় পদকল্পতরু, পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদাবলীসংগ্রহ গ্রন্থ প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ লিখিত না

১। এতদসম্বন্ধে কেহ কেহ মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন।

থাকায় মিথিলাতেও বিদ্যাপতির পদাবলী যে অবিকৃত অবস্থায় আছে তাহা বলা যায় না। লোকমুখে ক্রমে সেখানেও পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। দেখা গিয়াছে যে, একই কবিতা দুই জন মিথিলাতেই সংগ্রহ করিয়াছেন অথচ উভয়ের মধ্যে মিল নাই।

বর্ত্তমানকালে গ্রিয়ারসন সাহেব প্রথমে মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইংরাজি অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তৎপরে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন।

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গদেশ প্রচলিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সুবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বেহারের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় নাগরি-প্রচারিণী-সভা হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মিথিলার অনেক ঐতিহাসিক-তত্ত্ব ও বিদ্যাপতির জীবনীসহ "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" নামে বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

চারি পুরুষ হইতে বিদ্যাপতির বংশধরগণ বিসফিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত গৌরাব নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতির দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র।

মালদহের কবি ও গায়কগণ

বঙ্গদেশে লোকসাহিত্য, সঙ্গীতসাহিত্য প্রভৃতিতে অশিক্ষিতপটুত্বের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। কত মেঠো কবির গানে কেমন মাধুর্য্য, কেমন ভক্তির উচ্ছ্বাস, সমাজের কেমন পরিপূর্ণ চিত্র আমরা পাইয়া থাকি। লোকের মুখে মুখে সেগুলি ফিরিয়া থাকে। শিক্ষার গুণে সেগুলি পরিমার্জ্জিত না হইলেও, তাহাদের আদর বড় কম নহে। স্বভাব-কবিত্ব তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট।

আমাদের দেশের পাঁচালী, কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাহাদের ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। মালদহের গম্ভীরা-গানও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ ইহার সুর যাঁহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না—তাহার মাধুর্য্য এতই বেশী। সুরও এক রকম নহে। নানা রকম। আমরা সেই সুরগুলিকে কোন্ রাগ-রাগিণীতে ফেলিব, ঠিক করিতে না পারিয়া "গম্ভীরার সুর" নামে প্রচার করিলাম। কিন্তু কেবল সুরই গম্ভীরা-গানের বিশেষত্ব নহে। গানের বিষয় এবং অভিনয়-ব্যাপারও বড় চমৎকার। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহাদের নৃত্য-গীতের ভঙ্গিমা এত সুন্দর যে বর্ত্তমান বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের দোসর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সকলের নাচ এবং গান গাহিবার প্রণালীও এক রকম নহে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কল্পনা অনুসারে নৃত্যের ভঙ্গিমা উদ্ভাবন করেন—সে নৃত্য বড় সহজ নহে। তালে তালে নানা রকমে পা ফেলিবার কায়দা বড়ই কঠিন। কিন্তু এত অবলীলাক্রমে তাহা সাধিত হয় যে

দেখিলে অবাক্ না হইয়া থাকা যায় না। বাঙ্গালীর থিয়েটারে এখন বিলাতী বা পার্শী-ধরণের নাচ সুরু হইয়াছে। কিন্তু সে নাচ যদি মনোরম হয়, তবে বাঙ্গালীর এই সহজ-সুন্দর গ্রাম্যনৃত্য—এই নিজেদের কত প্রাচীন ঘরের জিনিষ, ইহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

তার পর গান গাহিতে গাহিতে গান ছাড়িয়া দিয়া কথাবার্ত্তা বা রং-তামাসা করা, এবং হঠাৎ তাল না কাটিয়া গান ধরা বড়ই সুন্দর। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে এ প্রথা খুবই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কত কাল হইতে মালদহে এই গম্ভীরার বোলবাই গানে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, ঠিক করা কঠিন। দেখিলেই মনে হয়, অভিনেতারা বুঝি থিয়েটার দেখিয়া এই সব অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু এমন দূরতম পল্লীবাসী অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই অভিনয়-প্রথার প্রচলন আছে, যাহারা থিয়েটারের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও এই প্রথার অস্তিত্বের কথা জানাইয়া থাকেন। অতএব ইহা যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা অসঙ্গত।

গম্ভীরা-গানের আর একটি বিশেষত্ব—ইহা সর্ব্ববিষয়ক। ইহাতে দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সমাজ-সংসার, শিক্ষা, অর্থ, শিল্প-কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা হইয়া থাকে। তাই গম্ভীরা-গানে রামপ্রসাদের ভক্তিরস, বাউলের দেহতত্ত্ব, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রসিকতা, কৃষক কবি বার্ণসের নবযুগ-প্রবর্ত্তনের কবিত্বধারা সকলই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা পাঠকগণকে একে একে এই গানগুলি ও তাহাদের রচয়িতাদিগের জীবনী-সম্বন্ধে পরিচয় দিব। তবে জীবনী-সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ইহাঁদের জীবিকা-উপার্জ্জনের কথাও বলিতে হইবে। কিন্তু পাঠকবৃন্দের নিকটে অনুরোধ তাঁহারা যেন জীবিকানির্ব্বাহ-প্রণালীর মাপকাঠিতে

ইহাঁদের কবিত্ব বিচার না করেন। দেশের নাড়ীর সঙ্গে যাঁহারা জড়িত, যাঁহারা দেশের প্রকৃত অধিবাসী, তাঁহারা প্রাণের ভাষায় দেশসম্বন্ধে কিছু জ্ঞাপন করিলে তাহাও আমাদের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইহাঁদের রচনায় উচ্চ সাহিত্যের ভাষা না থাকিলেও ভাব আছে, তাহাই আমাদিগকে উপভোগ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দের জীবনী ও গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—

১। ৺ধনকৃষ্ণ অধিকারী, চণ্ডীপুর।
২। ৺কৃষ্ণদাস দাস, আইহো, মোচিয়া।
৩। ৺কেশবচন্দ্র দাস গুরজী, মকদুমপুর।
৪। ৺ডাক্তার ঠাকুরদাস দাস, মকদুমপুর।
৫। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গিলাবাড়ী।
৬। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, মহেশপুর।
৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীকান্ত চৌধুরী, পুরাটুলী।
৮। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, মকদুমপুর।
৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় হালদার, টাঁপাজানি।
১০। মহম্মদ সুফী, ফুলবাড়ী।
১১। শ্রীযুক্ত হরিমোহন কুণ্ডু, সাহাপুর।
১২। শ্রীযুক্ত গদাধর দাস, গণিপুর।
১৩। শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, গণিপুর।
১৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত কাব্যরত্ন, আইহো মোচিয়া।
১৫। পণ্ডিত আবদুল জব্বর, মেজেমপুর কালিয়াচক।
১৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাস, কাশিমপুর ভোলাহাট।
১৭। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোতয়ালী।

১৮। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস, কোতয়ালী

১৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সাহা আলিমগর, কালিয়াচক।

২০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দী, নিমাসরাই।

উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে আমরা অগ্য কয়েকজন মাত্র লোকের পরিচয় দিতেছি। বারান্তরে অন্যান্য সকলের বিষয় লেখা যাইবে।

মহম্মদ সুফী

ইহাঁর বাসস্থান—ইংরেজ-বাজারের নিকট ফুলবাড়ী। বয়স ২১।২২ বৎসরের বেশী নহে। জেলাস্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইহাঁর বিদ্যা। ইনি এখন দুই একটি ছেলের শিক্ষকতা এবং পোষ্টাফিসের পিয়নগিরি করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কিন্তু ভগবান্ ইহাঁকে যে কবিত্বশক্তি দিয়াছেন তাহা কিছুতেই অবজ্ঞেয় নহে। ইহাঁর কবিত্ব বাস্তবিকই মনোরম— বাস্তবিকই তাহা অনায়াসলব্ধ সাহিত্যসম্পদ। ইহাঁর বর্ণনা-বিষয় বর্ণনা-ভঙ্গী "ঘরোয়া" উপমাগুলি অনুধাবন করিলেই ইহাঁর চিন্তাশীলতা এবং অনুসন্ধান-তৎপরতা বুঝা যায়। বস্তুবর্ণন এবং বিষয়-পরিকল্পনায় ইহাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। ইহাঁর রচনার কিছু নমুনা দিতেছি।

মালদহ রেল-ষ্টেশনের নিকটে কলিশন হয়, তদুপলক্ষে নিম্নের গানটি রচিত। একজন সাজিয়াছিল কলিশনে আঘাতপ্রাপ্ত যাত্রী। সে তাহার দুঃখের কাহিনী বন্ধুকে জানাইতেছে—

গম্ভীরার সুর

রেলে চাপিব না আর সাফ
বাপরে বাপ—।
এমন কর‍্যা কি এসিষ্ট্যাণ্ট-মাষ্টার লেন টেলিগ্রাফ ;

১। নয়টার সময় ছাড়ে ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন,
ছটা সাত মিনিটে এল মালদা ষ্টেশন (রে)
লাইন-ক্লিয়ার সাইন কর‍্যা, দিলেন গার্ড
গাড়ী ছাড়্যা, ডিষ্ট্যাণ্ট-সিগন্যালের কাছে,
প্রায় আপট্রেনটি পৌছে, তখন বেগতিক
দেখ্যা গাড়ী থাক্যা মারলেন ড্রাইভার লাফ।

২। কি বলব রে দাদা দুঃখের কথা হামি তোরে
এঞ্জিনের এক লোহা ছুট্যা ন্যাড়া গেল পুড়ে (রে)
পুড়ে যাওয়ায় মরি লাজে
কয়েকদিন থাক্যা যাইনি কাজে
দেখ্যা হাসেন কত ডাক্তার বাবু, উকিল
কবিরাজ, মোক্তার ; এই দেখ ঘরের পয়সা দিয়া
রেলুয়াক, ন্যাড়ায় আনলাম ছাপ—।

৩। রেলে রেলে ঘর্ষণ দেখ্যা, বাবু গিয়া দৌড়্যা,
ডি, টি, এসের কাছে খবর দিতে বসলেন তারে (রে)
বোল উঠাতে টক্কা টরে, হাত বাবুর থর থর করে,
সাহেবকে দিতে এ সংবাদ, কয়েকটা ফারম্ হ'ল
বাদ, তখন ভালুকজ্বরার মত বাবুর গায়ে
আ'ল কাঁপ—।

৪। খবর পায়্যা জেলার সাহেব এলেন তাড়াতাড়ি
তদন্তে জানিতে পারলেন উল্টিল মালগাড়ী (রে)
সাহেব তখন জিজ্ঞাসিলেন
ক্যেন এরূপ হ'ল বলেন

(বাবুর) মুখে ধান দিলে হয় খৈ
এখন হ'ল হৈ চৈ
রেলওয়ার একশ এক ধারায় বাবুর ঘটবে কি যে পাপ—॥
ঘ্যাচা—পাছা রেলুয়াক—রেলওয়েকে।

কলিশন ঘটনাটির অবিকল বর্ণনা এবং রেল-বাবুর অবস্থা কল্পনা বড়ই কৌতুকপ্রদ। কবি স্কট উচ্চ-সাহিত্যের ভাষায় যাহা করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত কবিও তাঁহার গ্রাম্য-ভাষায় তাহাই করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

করোনেশন-উপলক্ষে কয়েকজন খালাস-প্রাপ্ত কয়েদির গান :—

গম্ভীরার সুর

করোনেশনে মোরা খালাস পেলেম ভাই,
প্রাণ ভরে' সমস্বরে রাজার যশ গাই।

১। মোদের মহারাজা যিনি, ইংলণ্ডে বাস করেন, তিনি,
দেখিতে তাহারে কভু নাহি পাই মোরা ভাই,
পঞ্চম জর্জ্জ নামটি তাঁহার এই শুনিতে পাই।

২। প্রজারা সুখে থাকে যা'তে, পা'ন সোহাগা
এনে সাথে, কাটা বঙ্গের অঙ্গ এঁটে রাখলেন,
সাবেক রায়।*

৩। লর্ড হার্ডিঞ্জের পরামর্শে,
শান্তি এল ভারতবর্ষে,
ধন্য দয়ার-সাগর এমন সংসারেতে নাই।

৪। এডুকেশন-ডিপার্টমেণ্টে, জয়ধ্বনি উঠে উচ্চ কণ্ঠে,
শিক্ষার তরে ভারতবাসী অর্দ্ধ কোটি পায় (টাকা)।

* সোহাগা পাইন দিয়া যেমন অলঙ্কার জোড়া দেওয়া হয়, সদাশয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সেইরূপ দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গকে এক করিয়াছেন।

৫। শোন ভাই আজ সবাই মিলি, প্রাণভরে' বাহু তুলি,
রাজা-রাণীর জয়-ঘোষণা করি সবে আয়।

৬। চল ভাই আপন আপন দেশে,
ভোগ করলাম জেল কর্ম্মদোষে,
এমন পথে চলব না আর কাণমলা সবে খাই।

(কয়েদীরা কোন্ কোন্ অপরাধে কোন্ কোন্ জেলে ছিল, তাহার পরিচয়)

গম্ভীরায় সুর

প্রথম কয়েদী—প্রথমে ছিলাম আমি কলিকাতা আলিপুরে,
দ্বিতীয়—ঢাকা রাজসাহী রঙ্গপুর এলাম্ ঘুরে,
তৃতীয়—জানি তিনটি সহর, দিল্লী, লক্ষৌ, লাহোর,
চতুর্থ—আমি মালদা ভিন্ন অন্য জানি না জেলা
চারিজন একত্রে—জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুল্যা (এখন)
প্রথম—সখের সাইকেল গাড়ী চুরিতে ধরা পড়ি,
দ্বিতীয়—গণি মিঞার বাড়া ঢাকাতে ডাকাতী করি
তৃতীয়—গিয়ে সাহেব-হাত্তা, চুরি শিকারী-কুত্তা,
আর (মেমের) বিলাতী জুতা,
চতুর্থ—বাবুর হাতী চুরি, ধরা পড়ি গঙ্গার কূলে।
চারিজন—জেলের বিবরণ ইত্যাদি।

(জেলে কয়েদীরা কে কি পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বিবৃতি)

প্রথম—ফুলকপি গাজর মূলা, জল যোগাতাম ডুবেলা,
দ্বিতীয়—পীড়তাম সরষার ঘানি ও বড় বিষম ঠেলা,
তৃতীয়—আমার কাযটি ফাঁকা, টানতাম জেল দারোগার পাখা।

চতুর্থ—আমি ছিলাম সর্দ্দার বি, সি কয়েদীর দলে।

চারিজন একত্রে—জেলের বিধরণ সবাই বলেক খুল্যা।

এইরূপে এক একটি পালাহিসাবে গানগুলি রচিত হয়। কবির আরও দুইটি পালার গান নিম্নে না উঠাইয়া থাকিতে পারিলাম না! এই দুইটি পালায় তিনি যে ভাব নিম্নশ্রেণীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুধু নিম্নশ্রেণী নহে, আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকদলও বহু বিষয় শিখিতে পাইবেন।

প্রথম পালাটি কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি দ্বারা গীত। শ্রীমান অমর নাথ মণ্ডল ও শ্রীমান মদনমোহন মণ্ডল উক্ত সমিতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও নর্ত্তক। দ্বিতীয় পালাটি ইংরেজ-বাজার বোলবাই-সমিতির গীত।

প্রথম পালার বিষয়—অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং চাকরী করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। কিন্তু দেশের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতি মোচন করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। আমরা শিক্ষার অর্থই এখন পরীক্ষায় পাশ করা বুঝিয়া লইয়াছি এবং পাশ করিয়া চাকরী ও বিলাসিতায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। একজন চাষা গানে ও কথায় একজন চাকরীপ্রার্থী গ্র্যাজু-য়েটের কাছে খেদ করিয়া এই সব বলাতে গ্র্যাজুয়েটের মন ফিরিল ও তাঁহার দেখাদেখি পরীক্ষামোহমুগ্ধ আর একজন বাবুরও চৈতন্য হইল।

দ্বিতীয় পালার বিষয়—কয়েকজন ছাত্র নানা রকম বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে গেল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিদ্যা নিজের দেশ-বাসীকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইল। তাহাদের সকলেই সাহেবী হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেহ লাঙ্গল কাঁধে কৃষকের সহিত, মাকু হাতে তাঁতীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রথম পালা

কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি

(দেশের বর্ত্তমান অবস্থা র্ষণ)

(শিবের বন্দনা)

গম্ভীরার সুর

কি কলি হে দশা দৈন্য, (শিব)

দ্যাশের লোকে পায় না অন্ন ॥

হায় কি যে পস্তানার কথা সায়েস্তা খাঁর

আনল (শিব-হে)

তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী টাকায় আট

মনের ভাও চা'লে হে—

কুণ্ঠে গ্যালো সেই সুখের দিন,

হ'নু দিনে দিনে দীনের অধীন,

এখন আট সের ভাও ছুটে না,

দু'ব্যালা প্যাটে ভাত জুটে না,

(তোর) নন্দী, ভৃঙ্গী, বুঢ়া দামড়া

কি দিয়া পূজবো কহেক হামরা হে।

বছর বছর আস্‌ছিস ক্যান্ দ্যাশ লক্ষীছাড়া শস্যশূন্য।

২। লক্ষীছাড়া কলি যদি, দ্যাশে রাখ্‌লি না ক্যান্

মা সরস্বতী (শিবহে)

তাকেও গাঁজার ধুয়াঁং উড়ালি তোর এমনি

পাগ্‌লা মতি হে—

মা সরস্বতী অভাবে এই দ্যাশে

লোক বোকা হ'য়া আছে ব'সে

চোখ দেখ্না একনা খুল্যা
ভোলা গেলি কি তুই ভুল্যা (এই দ্যাশ্)
ত্রিশ কোটী লোকে ত তোকে
ববাবম ববাবম ক'হা ডাকে'হে
আজ তাঘ্রে ভুল্যা সাগর পারের লোক
গুলাক কল্লি গণ্য মান্য।

৩। যে দ্যাশেতে সওয়া পহর ব'র্ষা ছিল সোনা (শিবহে)
আজ সেই দ্যাশের লোকগুলাকে পিহ্যিয়া
দিলি তানা হে—
হায়রে সেই কুরুক্ষেত্র
রাখলি না তার চিহ্ন মাত্র
কত কীর্ত্তি কল্লি টুকরা
কহিতে উঠে প্রাণ ডু'করা
আদিনা, পাণ্ডুয়া, গৌড়, রামকেলী,
এ সব নগর সমৃদ্ধিশালী হে
সেই সব নগর কল্লি কিহে বাঘ-ভালুকের বাস অরণ্য।

৪। সুফী কহে মা লক্ষ্মী সরস্বতী গেলে, তাতো নাই
হামাদের ক্ষতি (ভাইরে)
কিন্তু এই বুঢ়া ছাড়্যা পালালে, হামাদের বাস্ত্ডা
হ'বে দুর্গতিরে—
যতই ভাবি সবই ভুল
এই আদম হামাদের আদি মূল,
ভক্তিডোরে বান্ধেক ক'স্যা,
দেখিস যায় না যেন খ'স্যা,

স্নেহবাৎসল্য যদি না থা'কৃত
খাঁটী বুঢ়া বিলাতে পালাত (ভাই)
হামাদের ভালবাসে, তাইত আসে,
বছর বছর খা'তে পরমান্ন।

ক'লির—কলি, কুণ্ঠে—কোথায়, ধুঁয়াৎ—ধুঁয়াতে, তাঘরে—তাদেরে, লোক গুলাক—লোকগুলাকে, পহর—প্রহর, পিহ্নিয়া—পরাইয়া, ত্যানা—ন্যাকড়া, এক্না—একটু।

শিবের বন্দনার মধ্যে দেশের জন্য কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা! রবি বাবু প্রমুখ বহু কবি দেশের জন্য কাঁদিয়াছেন। কিন্তু ভগবানকে ডাকিতে যাইয়া দেশের দুর্দ্দশায় কাহারও এমন বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠ শুনিতে পাই নাই। একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিতেছেন, আমাদের লক্ষ্মী গিয়াছেন, আমাদের সরস্বতী গিয়াছেন, কিন্তু তবুও এই "বুঢ়া" এই মঙ্গল এখনও আমাদিগকে ছাড়েন নাই।"—কি সুন্দর কথা—কি আশার বাণী। আশা করি পাঠকবৃন্দ বন্দনাটি একটু তলাইয়া দেখিবেন।

চাষা ও একজন গ্র্যাজুয়েটের প্রবেশ

চাষার গীত

গম্ভীরার সুর

আহে বাবু হন্নু কাবু কেমনে হে জান, কহেক কেমনে হে জান, বাঁচবে কেমনে হে জান? আট সেরের ভাও লাগ্যাছে চাউল চারিদিকেই টান।

১। তোরা এ সব চাল ছাড়্যা (বাবুগিরি চাল ছাড়্যা)
নিজে যদি হাল ধর্যা, আবাদ কর্যাত অন্নর্ব্বরা
থাকত দ্যাশের মান, সে—না কোচম্যান ছাঁট্যা,
টেড়ী কাট্যা, লম্বা কোঁচান (ধরলি)।

২। উত্তিম চাঁদ সাক বড় করছিস, হামাঘরে ভোখে
মারছিস, বাজে কাযে তেল উঠাছিস, খাছিস
চুরুট পান, দ্যাখ ত্থাশের দশা হল খোসা,
এমনি কি অজ্ঞান ? (তোরা)

৩। করি হামরা এ মিনতি, ত্থাশের কাযে দে মতি,
রাবণ-রাজার রাজনীতি নাই কি তোদের জ্ঞান ?
যায় সময় চল্যা বাহু তুল্যা ধর ধর্ম্মনিশান (উড়া)।

কোচম্যান ছাঁটা—গাড়োয়ানের মত চুল ছাঁটিয়া ; কোঁচান—কোঁচা ;
উত্তিমচাঁদ সাকে—(উত্তিমচাঁদ মালদহের একজন প্রসিদ্ধ মদ-বিক্রেতা)

চাষার গান ও তাহার কথাবার্ত্তায় জ্ঞানপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটের গান—

গম্ভীরার সুর

ঝক্‌মারাগ্‌গে বি এ এম এ পাশ,
করব নিজেই জমি চায।
দানা বিনা দেশের লোকে করছে হায় হুতাশ !

১। সায়েস্তা খাঁর আমলে
টাকায় আট মণের ভাও চা'লে
তিন পয়সার চা'লে একটা লোক খেত গোটা মাস।

২। সেই সুখের দিন গিয়েছে উড়ে (এখন) মরছি
পেটের আগুনে পুড়ে। বাপ-দাদার হাল তাঁত
ছেড়ে হ'ল সর্ব্বনাশ !

৩। নাই গৌড়ের উচ্চচূড়া ভেঙ্গে এসব হল গুঁড়া
খালি ভিঁটায় ইটা প'ড়ে আছে চারি পাশ।

৪। বুক ফাটছে হায়রে সেনবংশ
কেমনে হল এ সব ধ্বংস
গৌড়ের ভাঙা অংশে হল চামচিক্কারই বাস।
ঝকমারাগ্‌গে—ঝকমারি হোক গিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশলোভী একটি যুবকের প্রবেশ। গ্রাজুয়েটের মতিপরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়া এবং তাঁহার সহিত আলোচনাকরতঃ নিজের রুচি ফিরান ও মাকু লইয়া নিম্নের গানটি ধরেন।

গম্ভীরার স্থর

ঝকমারাগ্‌গে এফ এ বি এ আমিও আজ
তাঁত নিয়ে কাপড় বুনব ভাই।

১। বুদ্ধির দোষে খেলে পাশা;
হারিয়াছি ধন নাই এক মাসা;
হব না আর ভাক্কু; *
ধ'রে এবার মাকু;
বসব তাত-গাঢ়ায়। †

২। বিলাসিতা করে ত্যাজ্য শিখব শিল্প-জ্ঞান-বাণিজ্য
পলু পোষা মাটী হ'য়ে দিনে দিনে গেনু ব'য়ে"
উন্নতি আর নাই (পলুর)

কতগুলি চাষা প্রবেশ করিয়া বাবুদের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া গান ধরে—

গম্ভীরার স্থর

বাবুরা হাল তাঁত ধর্‌যাছে দেখ্যা যা ভাই তোরা, ভাঙা চীনাবাসন কখনু থুথুৎ লাগে যোরা?

* ভাক্কু—হতবুদ্ধি; † গাঢ়া—গর্ত্ত

১। পারবে কি জাগাতে বঙ্গ ? হবে বুঝি (এদের)
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, পচা দড়িৎ বাঁধছে মাতঙ্গ ; গুলির
সুতাৎ ঘোড়া।

২। ছাশ যে জাগাতে আ'ল ওরা পারবে কি খা'তে
ভাদই-বোরা ? বিলাতী নক্সাপাড় ছাড়্যা,
পিন্ধবে মোটা কোরা (দেশী কোরা) ?

কথনু—কখনও, থুথুৎ—থুথুতে, দড়িৎ—দড়িতে সুতাৎ—সুতার ভাদই-বোরা—মোটা ধান্যবিশেষ।

চাষারা এই সন্দেহ প্রকাশ করিলে বাবুরা বলেন "আমরা আর বড়াই করিব না এবার কার্য্যে কতদূর কি করিতে পারি দেখা যা'ক।"

দ্বিতীয় পালা

বিদেশযাত্রীদের এক এক করিয়া গান ধরিয়া প্রবেশ।

গম্ভীরার সুর

প্রথম—আমি শিখবার লাগি আমেরিকা যাব
দ্বিতীয়—মনের আরমান মিটাতে আমি জার্ম্মান পালাব
তৃতীয়—আমার উঠল ঝাঁপান যাব জাপান
চতুর্থ—আমার বাসনা যাব বিলাতে কে কে যাবি ভাই, আয়
আমার সাথে।
সকলে—ভাই করে সুশিক্ষা দিয়ে পরীক্ষা আসব ঘুরে দেশেতে।
(কে কি শিক্ষা করিবে তাহার পরিচয়)
প্রথম—শিথব কৃষিবিদ্যা বেশী করে ভাই ;
দ্বিতীয়—শিল্প শিথে অল্প দিনে আসব এ বাংলায়।
তৃতীয়—আমার আশা শিথব পলু পোষা

চতুর্থ—আমি যাব ব্যারিষ্টার হতে কে কে যাবি ভাই আয়
আমার সাথে।

সকলে—ভাই করে সুশিক্ষা—ইত্যাদি।

(শিক্ষার্থীদিগের আত্মপরিচয়)

প্রথম—আমার নাম নবীন—বাড়ী কালিয়াচকে

দ্বিতীয়—ধীরেন বলে ডাকে ইংরেজ-বাজারের লোকে

তৃতীয়—আমার প্রবোধ নাম জন্ম জামালপুর,

চতুর্থ—খবিরুদ্দিন নাম; ধাম কান্সাটাতে; কে কে যাবি ভাই
আয় আমার সাথে।

সকলে—ভাই করে' সুশিক্ষা—ইত্যাদি।

আরমান—সাধ; ঝাঁপান—ঝোঁক।

জননী জন্মভূমির প্রবেশ ও গীত

যাও—যাও পুন আসিয়ো।

জননী জনমভূমির দুঃখ বৎস নাশিয়ো।

১। যা বলি তা রেখে মনে পালন ক'রো প্রাণপণে
দেখ কুসঙ্গীদের সনে কভু নাহি মিশিয়ো।

২। কি ছিলি তোরা এদেশে দাঁড়িয়েছিস ভিক্ষুকের
বেশে, আর কি হবে অবশেষে ভেবো দিবা নিশিও।

৩। (প্রথমের প্রতি)—ত্রিশ কোটি প্রাণ সমস্বরে
হা অন্ন হা অন্ন করে, অনুর্ব্বরা ভূমি নিজ করে
ধরে' লাঙ্গল চষিয়ো।

৪। (দ্বিতীয়ের প্রতি)—পিপীলিকা ক্ষুদ্র জাতি; পরিশ্রমে দৃঢ়মতি,
লক্ষ্য করে, তাদের প্রতি, শিক্ষামূলে বসিয়ো।

৫। (তৃতীয়ের প্রতি)—হয়ে আমরেশম ব্যবসা মাটী, গৌড়ের অবনতি খাঁটি, কিসে হয় এর উন্নতি পরিপাটী, শিখ জ্ঞান-বিজ্ঞান রাশিও।

৬। (চতুর্থের প্রতি)—বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়, তাঁরা ত হয় তোদেরই ভাই,

কি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা পায়, জানে সর্ব্বদেশীয়।

৭। ভবে বিদ্যারত্ন মহাধন, লভে যেন সর্ব্বজন,

এই ধন যাদের নাহি জ্ঞান, তাদের প্রতি শাসিয়ো।

৮। জাগরে জাগরে বঙ্গ, কর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ,

দেখ দেখ জাপানী, ইঙ্গ, তাদের গুণে পশিয়ো।

সকলের নিষ্ক্রামণ।—বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের পুনঃ-প্রবেশ ও গীত।

গম্ভীরার সুর

সকলে—

আমরা শিক্ষা করে, এলাম ঘুরে, সবাই দেশেতে;

দিব জীবন দেশের লাগি ক্ষতি নাইক তাতে, (ভাইরে)।

১। করে' মুষ্টিভিক্ষা দ্বারে দ্বারে গিয়াছিনু সাগর-পারে,

এই দেশের উন্নতি-তরে মিলে এক সাথে (ভাইরে)।

২। শিখেছি জ্ঞান-বিজ্ঞানরাশি, পলু পোষা আর শিল্প-কৃষি,

সে সব শিক্ষা দিব ভারতবাসীকে ধ'রে নিজ হাতে (ভাইরে)।

৩। আজ এক বুটের দুই দা'ল* মিলে, জ্ঞানের বাতী দিব জ্বেলে;

নয় ত শিক্ষাভাবে সোণার বাঙলা যায় অধঃপাতে (ভাইরে)।

প্রত্যেকের সাহেবী-পোষাক পরিবর্ত্তন ও দেশীবেশ গ্রহণ।

* এক বুটের দুই দাইল—এক ভারতমাতার দুই সন্তান—হিন্দু ও মুসলমান।

গীত

গম্ভীরার সুর

এতে নাই আমাদের কোনই লাজ
ধর ভাই দেশের কাজ।
হেলাতে হয় কার্য্য নষ্ট তাই স্পষ্ট কথা কহি আজ।

১। পরব দেশের মোটা কাপড়, করব না আর হাঁপর ফাঁপর, ছাড়ব হাট প্যাণ্ট বুট কলার, ধরব না আর সাহেব-সাজ।

২। ইতিহাসে এই প্রমাণ পাই, বাঙ্গালী মাটী হয়েছে জুতায়, সোণার বঙ্গ বিলাসিতায়, হারিয়েছেন নবাব সিরাজ।

৩। দেখে শিখ এই তালবইর বাসা, কারিগিরি কেমন খাসা, তার চেয়ে কি আমরা চাষা ধিক্ তবে মানব-সমাজ!

৪। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, থনপত ভিখু তার আছে সাক্ষী, তাদের ঐ পথ দেখাদেখি বাণিজ্যে চালা জাহাজ।

৫। মালদাহ আছিল আট হাজার তাঁত, গরীব দুঃখী সবাই পেত ভাত, সেই মালদাতে আজ ঢুকে কাভাত, উজুল সোণার গৌড়রাজ।

৬। শুন ভাই মালদার উন্নতির আশে, বেড়াতেন ঘুরে দেশ বিদেশে নাম রাধেশ বাবু কংগ্রেসে গিয়েছিলেন যিনি মান্দ্রাজ!

৭। মহম্মদ সুফীর এই উক্তি, মায়ের পদে বেখে ভক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে দেখ শক্তি করছেন মা বঙ্গে বিরাজ।

তালবই—বাবুই পাখী; কাভাত—দুর্ভিক্ষ।

উল্লিখিত গানগুলির রচনা ও ভাবুকতার বিষয় বেশী কিছু না বলিলেও চলে। পাঠক তাহার বিচার করিবেন!

শ্রীযুক্ত হরিমোহন কুণ্ডু

ইঁহার নিবাস ইংরেজবাজারের অপর পার সাহাপুরে। বয়স অনুমান

পঞ্চাশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার বেশ জ্ঞান আছে। ইংরাজী বেশী কিছু জানেন না। আশৈশব ইনি সঙ্গীতপ্রিয়। নানা রকম রাগ-রাগিণী ও তাল-মানে ইহার অধিকার আছে। শুনা যায় ইহার নিজের একটা কবির দল ছিল, তাহাতে ইনি উপস্থিত মত গান বাঁধিয়া বাদ-প্রতিবাদ করিতেন। ইনি এখন ইংরেজবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার গোঁসাঞী প্রতাপচন্দ্র গিরি মহাশয়ের কাছারীতে দেওয়ানী কার্য্য করিতেছেন।

ইহার রচিত শিবের বন্দনাগুলি সাধক-প্রবর রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ধরিবার উপায় নাই। একবার ইনি মহাদেবকে তাঁতী সাজাইয়াছিলেন—সে গানটি ভাবুকতার চরম দৃষ্টান্ত। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(ওহে হর)—

তুমি এই ভবেতে তাঁতবুনা কায
খুব ভালই জান,
ব্রহ্মাণ্ডের একদিক হতে ফেলে মাকু
আর দিকেতে টান।

১। এ বিশ্ব বিশ শ'য়ের তানা,
গাঁথিতাছে বিস্ময়-সানা,
হর-রকমের হরেক বানা
নিত্য নূতন আন।

২। সৃষ্টি করে' মায়ার নরদ,
তাহে জড়িয়া দারা পুত্র গরদ,
ঝাঁপ উঠায়ে পরদ পরদ
আচ্ছা বুঁটা বুন।

স্থষ্টিস্থিতি প্রলয় করা,
তোমার পক্ষে মশরা জড়া,
পাপীগণকে পেলাম করা
কাযেধৃতরা ধুম।

৪। এমনি তুমি তাঁতের তাঁতী, (তোমার)
ব্রহ্মা বিষ্ণু সাঁতের সাঁতী,
ফুলকী বা'ছে পাঁতি পাঁতি
মৃত্যু দপ্তি হান।

৫। তোমার আদ্যাশক্তি চরকা লাটা
ত্রিগুণ স্থতা কাটনাকাটা,
হরিমোহন বলে তানা ছাঁটা
এতই করাও কেন।

তানা—সুতা ; সানা—ছিদ্র ; যাহার মধ্য দিয়া স্থতা প্রবেশ করে ; বানা—সরু খিল ; নরদ—গোল একখানা লম্বা কাষ্ঠখণ্ড যাহাতে কাপড় বা স্থতা জড়ায় ; ঝাঁপ—যাহার উপর পা দিয়া চাপ দেওয়া হয় ; মশরা জড়া—ছিন্ন স্থতাকে জোড় দেওয়ার নাম ; পেলাম করা—মোলায়েম করা ; সাঁতের সাঁতী—সাথের সাথী ; ফুলকী—উদ্বৃত্ত স্থতা ; বাছে—বাছিয়া ; দপ্তি—সানার উপর ও নীচের কাঠ ; লাটা—লাটাই, যাহাতে স্থতা জড়ানো থাকে।

যাঁহারা তাঁতের কায জানেন, তাঁহারা গানটি ভাল বুঝিবেন। এই সব কল্পনায় কবির কোনই কষ্ট নাই। গ্রামের নীচশ্রেণীদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ আছে, তিনি তাহাদিগের ঘরের লোক, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় তাঁহার চোখের সম্মুখে সকল সময় ভাসিতে

থাকে। সেই জন্য গান লিখিবার সময় ভাবের জন্য তাঁহাকে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয় না।

তাঁহার তাঁতী শিবকে পাঠক দেখিলেন, এখন তাঁহার চাষী শিবকে একবার দেখুন—

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর
কর্ম্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।

১। (লয়ে) মদন রতির লাঙ্গল ঈশ
বিষম বেগে জগদীশ
ঘুরাও নিরন্তর।

২। মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে;
কর্ম্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়ারজ্জু নাসায় ছেঁদে
কতই বা আর তাড়;

৩। সুখ-দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুয়ালে আছে যোতা
(পাছাতে) আশা-লাঠির দিচ্ছ গুঁতা
ওহে দিগম্বর।

৪। সৃষ্টি হতে লয় পর্য্যন্ত
চাষের কি হবে না অন্ত
কিঞ্চিৎও কি হও না ক্লান্ত
ওহে গঙ্গাধর;

৫। ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণুর কুমার
বীজ বুনানি মজুর তোমার
কতই যে বীজ হয় না শুমার
ওহে বিশ্বেশ্বর।

তুমি বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভোগাও
বিষ্ণু দ্বারা ফসল যোগাও (নিজে বসে)
টুমরু তালে ডুমরু বাজাও
ঝুমরুতে গান কর।

৭। তব ক্ষেত্র এ ত্রিসংসার
দিনে দিনে হচ্ছে অসার
হরিমোহন বলে ও সারাৎসার
সান বিতরণ কর।

কবির ভাবুকতা এবং ভাবপ্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতায় আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমম মানব-জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোণা।" কবি হরিমোহন মনকে চাষী না করিয়া শিবকেই চাষী সাজাইয়াছেন—তাঁহার এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাঁহার অন্যান্য গান সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস

ইহাঁর বাসস্থান ইংরেজরাজারের দক্ষিণ মহেশপুর গ্রামে। বয়স ২৮।২৯ বৎসরের বেশী নহে। ইহাঁর বিদ্যাশিক্ষা ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্য্যন্ত। ইনি বেশ মেধাবী কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ইহাঁকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ইনি এখন ইংরেজবাজারের একজন মহাজনের দোকানের হিসাবরক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁর সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য কথা এই যে আজ পর্য্যন্ত ইহাঁকে কেহ কখন রুষ্ট হইতে দেখে নাই।

ইনি জন্মগত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। ইহাঁর সুললিত শব্দযোজনা, অনুপ্রাসের সুমধুর ঝঙ্কার, মাধুর্য্যময়ী কল্পনা, ভাবুকতা সত্যসত্যই বড় মর্ম্মস্পর্শী। ইনিই সর্ব্বপ্রথম শিবের বন্দনায় জাতীয় রোদন আনয়ন করিয়াছেন। গত চৈত্র মাসের "গৃহস্থে" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় ইহাঁর কয়েকটি গানসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "হামরা বছর বছর তোকে পূজিয়া"—গানটি জাতীয়-রোদনের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। তারপর ইনি দেশ ও সমাজসম্বন্ধে কতখানি ভাবেন নিম্নের গানগুলিতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

গ্রামোফোনে আমাদের কি অনিষ্ট করিতেছে একটু শুনুন—

গম্ভীরার সুর

এখান হতে পালিয়ে চল সবাই,
ত্রষমন ঘুরছে পিছে পিছে কলে ভরবে ভাই।

১। লালচাঁদ বড়াল আদি করে, বড় বড় ভাইকে ধরে,'
রেখেছে ভাই বন্ধ করে' কলেতে ভরে,'
আবার রেখেছে এক মাগীক ধরে,'
তার নাম গহরজান বাই।

২। সেতারের ঝন্‌ঝনি, বেহালার কুন্‌কুনি,
মন্দিরার টুন্‌টুনি স্পষ্ট শুনা যায়।
কেমন কন্‌সার্টপার্টি, তবলার চাঁটী,
কলেতে বাজায়।

৩। যাত্রা-থিয়েটার-কীর্ত্তনাঙ্গ, সকলকেই করেছে
সাঙ্গ, কলের মধ্যে সবাই বন্ধ কাউকেও ছাড়ে
নাই, (কেবল) বাকীর মধ্যে আছে যারা
গম্ভীরা গায়!

৪। (কলের) চেহারা দেখে পিলাই কাঁপে,
ফিরে বেড়ায় চুপে-চাপে, একলা দোকলা
পেলে তাকে ছাড়াছাড়ি নাই ; আমাদের কেও
ধরবার জন্য গম্ভীরা বেড়ায়।

৫। ধন-দৌলত টাকাকড়ি, যুড়ি-ঘোড়া ঘর-বাড়ী,
কলেতে গিয়েছে সব বাকী কিছু নাই !
এখন কলের গানে মাতিয়ে প্রাণে ন্যাংটা
করতে চায় !

৬। সুশিক্ষিত মহাত্মারা, কলের গানে আত্মহারা
বিলাসপুরণে তারা কলের গান আনায়,
ঘরের পয়সা যায় ভাই খস্তা, দিশা কর তাই।

৭। দাস গোপালে ভেবে বলে কলের গান চলিত হলে
দেশের বিদ্যা গানবাদ্য যাবে ভাই ভুলে,
(এখন) দেশের মাল সব হচ্ছে পয়মাল,
সামাল করা চাই।

উক্ত গানটি মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে গীত হইয়াছিল। দুইজন গম্ভীরাওয়ালা এবং একজন গ্রামোফোনওয়ালা সাহেব সাজে। সাহেবকে দেখিয়া গম্ভীরাওয়ালাদ্বয় এমন ভীত-ত্রস্তভাবে গান ও অভিনয় করিয়াছিল যে, দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। গানটিতে আমাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শিক্ষিত দেশবাসী অনেক যুক্তি-তর্ক শুনিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্র মথিত করিয়াছেন। কিন্তু অশিক্ষিত একজন কবির হৃদয়ের যুক্তি—শাস্ত্রের যুক্তি নহে !—একবার শুনুন,—

(বিধবা-বিবাহের একজন স্বপক্ষ, আর একজন বিপক্ষ,
এতদুভয়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ)

গম্ভীরার সুর

স্বপক্ষ—জাতি কুল গেল মোদের বিধবাদের
বিবাহ না দিয়ে রে।
মুখ তুলে, চোখ তুলে, দেখ
কত বি, এ দিচ্ছে বিয়ে রে।
বিপক্ষ—হল মতিগতির অধোগতি দুনিয়ার
কাগজ পড়্যা রে,
অসম্ভব কি সম্ভব—এ সব অধর্ম্মেই যায়
লক্ষ্মীছাড়্যা রে।
স্ব—এসব মনের ভুল ভাই মনের গোল,
জ্ঞান থাকতে সেজেছ পাগল,
অশিক্ষিতের দলেই কেবল এই গণ্ডগোল
ছাড়েক এ দুর্ম্মতি যাস্‌নে ভাকিয়া রে।
বি—মূর্খের সঙ্গে তর্ক মিছে
আগেই দৌড়ে দেখে না পিছে
খালি তুষে পাহার কচ্‌কচি সার হাণ্টামু আছে
(একটু) মাথা খেলিয়ে দেখেক তলিয়ে রে।
স্ব—যেমন পাকলে ফল খসে' পড়ে
তালিম হলেও ঐ রোগ ধরে
জাতি ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কাণ্ডজ্ঞান ছাড়ে
(তখন যায়) মূলটা ছাড়্যা উল্টা গর্য্যা রে।

বি—সাহেবদের লেখা লেখে সাহেবদের দেখা দেখে
মুনি-ঋষির সব পুঁথিকে দিয়াছিস ফেঁকে
(জানি তুই) কত জ্ঞানী বিশেষ কর‍্যারে।

স্ব—ভেবে দেখ বিধবারা সর্ব্ব সুখে হয়ে হারা
কুশাসনের হুতাশনে জীয়ন্তে মরা ;
তাদের মুখ পানে দেখ চেয়ে রে।

বি—বৈধব্য-যন্ত্রণা যার পূর্ব্বজন্মের আছে ধার
শোধিবারে এ সংসারে জন্ম বিধবার
কেবল ভোগাভোগি দেহ ধর‍্যা রে।

স্ব—স্ত্রী মরিলে সুখের তরে পুরুষ কেন বিয়ে করে
রাঁড়ী হয়্যা থাকবে সহ্যা নারী কার ডরে
এ কোন্ দেশী ধর্ম্ম দেখ ভাবিয়ে রে।

বি—একবার অন্যে সমর্পিয়ে
আবার কেমনে দিবে বিয়ে
হবে ধর্ম্মনাশী নরকবাসী পরলোক গিয়ে
পুরুষ চিরস্বাধীন দেখ স্মর‍্যা রে।

স্ব—জীবভরা এই ধরা রচয়িতার এমনি ধারা
পুরুষ প্রকৃতি এরা তিলেক নয় ছাড়া
কেমনে বিধবারা বাঁধবে হিয়ে রে।

বি—মানুষ হয়ে নীচ-আচার
এই বুঝি পণ্ডিতের বিচার
এটা ছ্যাড়া ওটা ধরা পশু-ব্যবহার
(তাহ'লে) সতীধর্ম্ম যাবে উড়্যারে !

ষষ্ঠ অধিবেশন

স্ব—সেদিন কি আর কাছে ভাই
(এখন) ভ্রূণ-হত্যার সীমা নাই
(এখন) ইজ্জত ঢাকা বংশ রাখা
সব দিক দেখা চাই
ঘুচবে লুকাচুরি পরকে নিয়ে রে।

বি—হবে ভালবাসা দোকানদারী
সংসারের সুখ ছাড়বে বাড়ী
মৃত স্বামীর বিষয় নিয়ে হবে মারামারি
আগে আইন গোলা বদলা লড়্যারে।

স্ব—ও সব গোলমাল থাকবে না ভাই
আগে এমত চালান চাই
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বলিহারি যাই
আর বাঁচলে ক'দিন যেত চালি রে।

বি—সাগরের বিদ্যা সাগরে থাক
চোখের দেখা চোখ খুলে দেখ
অনুরাগী জাত-বৈরাগীর সমাজের ধাক
এমনি যাবে গর‍্যা ঐ পথ ধর‍্যা রে।

স্ব—লোক দেখা সমাজের সতী
সমাজের অধোগতি (হচ্ছে)
নিতি নিতি দুর্নীতি প্রবল অতি
(তাই বলি) হিত-হেতু দিতে বিয়ে রে।

বি—একে কুমারীদের বিয়ের দায়ে
ঘাড়ে ঝোলা গুদরি গায়ে (শেষে)

রঁাড়ী বিহা চল্লে মরতে হবে বিষ খা'য়ে
আরও ব্যভিচার আসবে দোর্‌্যা রে।

(একজন মীমাংসক সাধুর প্রবেশ ও গীত)

গম্ভীরার সুর

জেদাজেদী ছাড়েক তোরা গোড়া খুজে চা।
রঁাড়ী বিহা চল্লে ভাল মুস্কিল জান বাঁচা।

১। কত সধবা বিধবার হালে জ্বলে ইন্দ্রিয়-জঞ্জালে
সুখী হবে কি না স্বামী কিন্যা বিচার কর বাছা।

২। সাধু পথ থাকতে পরে কেন যাবে কুপথ ধরে
শিখাও ব্রহ্মচর্য্য মানুষ করে' দোনো কুল বাঁচা।

৩। পড়াও ঋষিদের শাস্ত্র-পুরাণ নীতিজ্ঞানের পাবে
সন্ধান, শিখিয়ে পরসেবা গরীব গোরার কায
কামে নাচা।

৪। কাযে ব্যস্ত থাকলে মতি (হবে) পুত্রস্নেহ
সবার প্রতি, গড়িয়ে না ধঁাচা।

৫। তখন ইন্দ্রিয়জয় আপনি হবে হাণ্টামু লুকাচুরি
ঘুচে যাবে, দাস গোপালে বলে ভেবে সকলে চল
কাছা।

থালি তুষে পাহার—থালি তুষকে পেষণ করিতে; হাণ্টামু—মিথ্যা তর্ক; উল্টা গর্‌্যারে—উল্টা গড়িয়া যায়; সহ্যা—সহিয়া; আইন গোলা—আইনগুলা; ধাক—পল্লা গর্‌্যা—খারাপ হইয়া; বিহা—বিয়ে। কিন্যা—কিনিয়া; ধঁাচা—ধরণ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত গানটিতে বিধবাদিগকে সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত

রাখিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রাদি-আলোচনার ব্যবস্থা করিবার কথা আছে। বিধবারা পরসেবায় লাগিলে সমাজের কত বড় একটা কল্যাণ-শক্তি বাড়িয়া যায় সুধীজন সে কথা বিচার করিবেন। ফলকথা গানটিকে আমরা হাসিয়া উড়াইতে পারি না। কবির সাধু ইঙ্গিত অনেক সুফল প্রসব করিতে পারে।

গোপাল বাবুর বোলবাই-সমিতির গায়ক ও নর্ত্তকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার নৃত্য মৌলিকতাপূর্ণ—বড়ই রমণীয়। নৃত্যের সঙ্গে সমস্তটা অঙ্গের নানারূপ ভঙ্গীও বিশেষ কৌতুক-প্রদ। ইঁহার ন্যায় এক পায়ের উপর নানারকম অনায়াসনৃত্য-মাধুর্য্য কোনও থিয়েটার বা যাত্রায় উপভোগ করিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না! রাজধানী হইতে বহুদূরে নিভৃত এক পল্লী-ক্রোড়ে নিতান্ত অখ্যাতভাবে আমাদের একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী এমন নৃত্যবিদ্—নৃত্যবিষয়ে এমন উদ্ভাবিনীশক্তিসম্পন্ন কেমন করিয়া হইতে পারে ভাবিলেও আশ্চর্য্য বোধ করি। এটা কি গৌড়ীয় সভ্যতার ফল?

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

ময়মনসিংহের নিরক্ষর কবি

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং কাশী-দাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ যখন এই সকল কবিদিগের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ময়মনসিংহের সীমান্তপ্রদেশ সেই সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে নারায়ণদেবের

সুমধুর কবিতায় তরঙ্গায়িত হইতেছিল। তাহার পর চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষ, অন্ধকবি ভবানীদাস, মহাভারত-রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী, ক্রিয়াযোগসার-রচয়িতা অনন্ত দত্ত, কবি কৃষ্ণদাস, ভারতীমঙ্গল রচয়িতা রাজা রাজসিংহ, পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস, ভাস্কর-পরাভব-রচয়িতা গঙ্গানারায়ণ, জগন্নাথদাস, দুর্গাপুরাণ-রচয়িতা মুক্তারাম নাগ, "দারা-শেকোর" বঙ্গানুবাদক সদানন্দ মুন্সী, চণ্ডীকাব্য-রচয়িতা রামানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অশেষ উন্নতি ও ময়মনসিংহ জেলাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। যে সকল কবির কথা উল্লেখ করিলাম, ইঁহারা সকলেই রীতিমত লেখাপড়া জানিতেন। অদ্যকার প্রবন্ধে যে কবির কথা উল্লেখ করিব, ঐ কবি নিরক্ষর! নিরক্ষর যে কবি হইতে পারে, ইঁহার জন্মের পূর্ব্বে এই ধারণা কাহারই ছিল না, এবং থাকিতেও পারে না। "নিরক্ষর কবি" কথাই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহার রচিত কবিতা লিখিয়া না রাখায় ভাল ভাল কবিতাগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে! একবার অনেক দিন হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত রামুসরকার তাঁহার রচিত ভাল ভাল কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখার প্রস্তাব রামগতি সরকারের নিকট করিয়াছিলেন, তদুত্তরে রামগতি সরকার বলিলেন, "কুম্ভকারের হাঁড়ির দুঃখ কি", যখন প্রয়োজন হইবে তখনই কবিতা রচনা করিতে পারিবেন, লিখিবার প্রয়োজন কি। এই ভ্রমে পড়িয়া রামু সরকার তাঁহার রচিত কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখেন নাই। এখন এ বৃদ্ধবয়সে ভাল ভাল কবিতাগুলি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, যে ২।১টি বলিতে পারিয়াছেন, প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করা গেল।

জেলা ময়মনসিংহ পরগণে হোসেনসাহীর অন্তর্গত নান্দাইল থানার এলাকাধীন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৮ সনের মাঘমাসে মঙ্গলবারে শ্রীরামচন্দ্র মালী (রামুসরকার) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রাম-

প্রসাদ মালী, মাতার নাম রামমণি দাসী। উক্ত আউটপাড়া গ্রামে একটি কবির দল ছিল। তাঁহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, তখন ঐ দলে গিয়া গান শুনিতেন, সন্ধ্যাকালে সকল রাখাল বালকসহ একত্রিত হইয়া ঐ সকল ছড়া-পাঁচালীর আলোচনা করিতেন। ইহার স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল যে, যাহা একবার শুনিতেন তাহাই অভ্যস্ত হইত। ইহার এরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আউটপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাকে নিজ বাড়ীতে আনাইয়া কবির গান ও ছড়া-পাঁচালী রচনার উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রস্তাব-গুলি মুখে-মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং অক্ষরে অক্ষরে কিরূপে মিল হয়, তাহাও মুখে মুখে শিক্ষা দিলেন। এইরূপ শিক্ষাতেই কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত রচনা-শক্তি জন্মিল। পাঠকগণের কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য তাঁহার রচিত ভক্তি-সঙ্গীত একটি ও ঈশ্বর-বন্দনা প্রভৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

হরি ব'লে ডাকরে আমার মন।

এল' নিকটে শমন তুমি কার আশায় বসিয়ে রয়েছ,
তোমার গণার দিন যে দিনে দিনে গত হ'ল তাকি টের পেয়েছ॥

যাবে যদি ভব-পারে বল কৃষ্ণ হরে হরে
কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ
ঠেকে ভবের ফান্দে রামু কান্দে
ভক্তি-ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ
এ দেহ থাক্‌তে চেতন হরি বল মন
জীবনের ভরসা আর কি
যখন এসে শমন দিবে দরশন
তখন ঘোর হবে দুই আঁখি

যার জন্ত খাট বেগারী তারা সব রবে পড়ি
একা পলাবে প্রাণ-পাখী
তোমার ভবের কামাই ভবে রবে,
মন তোমায় দিবেই বা কি নিবেই বা কি।
আমি মূর্খ নিতান্ত ভ্রান্তে হই অশান্ত
শ্রীকান্ত জানি না কখন
সদায় করি দুশ্চিন্তে চিন্তামণি করি চিন্তে
নিশ্চিন্ত মন থাকে না কখন
যার করিলে চিন্তে দূরে যাবে সকল চিন্তে
চিন্তামণি চিন্তার কারণ
কে পারে তাঁহারে চিন্‌তে যে চিন্‌তে সে চিন্‌তে
আমার জন্ম গেল চিন্‌তে চিন্‌তে, চিন্‌তে পারিনে কখন।
মুক্তিকর্ত্তা জনার্দ্দন এধন-বিনে আর কি ধন
ত্রিজগতের মোক্ষ ধন চিন্তা কল্লে সে চরণ—
মোক্ষধামে হয় গমন।
ত্রিজগতের তারণ-কারণ যিনি হন কারণের কারণ
ক এতে কৃষ্ণনাম লিখন আমি তা জানিনে কখন।
উদ্দেশ্যেতে নিবেদন করি প্রভু-জনার্দ্দন
বিপত্তে মধুসূদন যা কর এখন॥

ঈশ্বর-বন্দনা

হে প্রভু জনার্দ্দন উদ্দেশ্যে করি নিবেদন
শ্রীচরণ পাবার আশার আশে
পাপাশ্রিতে মতিচ্ছন্ন ভক্তি হয় না সে জন্ত
মোক্ষ-চরণ পাব আর কিসে

আমি মূর্খ ভক্তিহীনে পাবার আশা হয় না মনে
যদি তোমার দয়াগুণে পাই আমি দীনহীনে
কে আছে তুমি বিনে এ তিন ভুবনে
পাপী-তাপী কত জনে উদ্ধারিলে নিজগুণে
কিঞ্চিৎ করুণা গুণে দয়া কর এ অধীনে
তুমি কৃষ্ণ ব্রজের বনমালী
আমি তোমার হইত ভক্ত
যেদিন হবে জীবনমুক্ত
কইরো মুক্ত বলে রামুমালী

গুরু-বন্দনা

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক দেহ
জীব উদ্ধারিতে ভবে আর নাই কেহ
সেই গুরুতে ভক্তি হয় না, আমার আমার করি
কেবা আমার আমি বা কার জান্তে নয়কো পারি
কিসে হব অন্তে মুক্তি ভব-পারে নাই কো যুক্তি
গুরু-মুখে আছে উক্তি কর্ণে দিলেন নাম
সে নাম ভজিলে পরে যাওয়া হবে ভবপারে
শুদ্ধ হইবে পরিণাম।
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অনুবাদ কবি বাদে পড়েছি ঘোর বিপদে
তব পদে নিলাম শরণ॥

বিগত ১২৬৯ সনে শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় তারাকান্ত

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে শ্রীপঞ্চমী-উৎসব উপলক্ষে প্রথম চণ্ডী ঘোষ সর-কারের সহিত রামু সরকারের কবির গান হয়। চণ্ডী ঘোষ প্রশ্ন করিলেন—ব্রহ্মার পঞ্চমুণ্ড ছিল, একমুণ্ড বিলুপ্ত হইল কেন? তদুত্তরে রামু সরকার বলিলেন :—

শিব হইলেন পঞ্চানন ব্রহ্মা হইলেন পঞ্চানন
এই বলে পঞ্চানন করিলে ভাবনা
সমান সমান হলে এই যে ভূমণ্ডলে বর্ণিবে যে
সমান তুলনা।
আমার সমান ত্রিসংসারে এমন কে হইতে পারে
এই বলে ব্রহ্মারে বলিলেন পঞ্চানন
আমার বাক্য ধর এক বয়ান ত্যাগ কর
বলিলেন তখন॥
ব্রহ্মা বলেন ত্রিপুরারি তোমার বাক্য ধরি
বয়ান কেন ত্যাগ করি এ বাক্য বলনা কখন
তাতেই শিব রাগের ভরে এক মুণ্ড ছেদন করে
কপালী নাম শিবের সেই কারণ॥

রামু সরকার পাবনা জেলানিবাসী বড়হরি সরকার, কৃষ্ণনগরনিবাসী চণ্ডীগোপাল সরকার, বিক্রমপুরনিবাসী ভৈরব মজুমদার, রামকানাই শীল, বরিশালনিবাসী মথুর সরকার, বিধুভূষণ সরকার, ফরিদপুরনিবাসী মহিম শীল, মহেশ চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরানিবাসী কানাইনাথ, ভগবান দাস, শ্রীহট্টনিবাসী গোলক মুন্সী, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য রামগতি শীল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবির সরকারগণের সহিত কবি গান করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। এখন অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, এখনও গান করিয়া থাকেন, ঐ ব্যবসা দ্বারা তালুকাদিও করিয়াছেন।

রামু সরকারের দুই বিবাহ—১ম পক্ষের পুত্র হরনাথ, বয়স ২৭।২৮ বৎসর। সে পৈতৃক-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি হরনাথ পিতৃ-গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ৪টি; ১ম অখিলচন্দ্র, দ্বিতীয় জলধর, তৃতীয় ভগবান, চতুর্থ ঠাকুরদাস, ইহারা স্কুলে পড়িতেছে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বাঙ্গালা ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য।

জাতীয় সাহিত্য দ্বারাই জীবন গঠিত হয়। এজন্য জাতীয় উন্নতি-সাধানার্থ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন অত্যাবশ্যক। মৎ-প্রণীত সামাজিক ইতিহাসে আমি দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত আধুনিক নহে। কিন্তু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা কোন জাতির ধর্ম্মভাষা বা রাজভাষা ছিল না। বাঙ্গালী হিন্দুদের উচ্চ-শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় হইত এবং মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা পারসী ভাষায় হইত। কেবল সাধারণ কথোপকথনে ও লিখন-পঠনে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইত। এইজন্য তখন বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞলোকেরা বাঙ্গলা ভাষাকে কেবল সংস্কৃত ও পারসী ভাষার অনুচর জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কোন গ্রন্থাদি রচনা করিতেন না। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্যের সত্তা মাত্র ছিল না।

বঙ্গীয় দশম শতাব্দাতে সহজিয়া ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উপচিত হইল। তাহাদের অধিকাংশ লোকই সংস্কৃত ও পারসী জানিত না। তাহারা আপনাদের গান, সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া-

ছিল। ইহাই বাঙ্গলাভাষার প্রথম উন্নতি। তাহার পর ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কালিদাসের কালিকাবিলাস, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি বড় বড় কাব্যগ্রন্থ সমূহ বাঙ্গলাভাষায় রচিত হইয়াছিল। হিন্দুরা গদ্য রচনা করা কাপুরুষের কার্য্য জ্ঞান করিতেন, তজ্জন্য কোন গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গলাভাষায় ছিল না। বাঙ্গলাভাষায় কোন ব্যাকরণও ছিলনা।

ইংরেজী ১৮৩৫ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সাহেব বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়সমূহে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহাই বাঙ্গালাভাষার উন্নতির দ্বিতীয় সোপান। তখন আদালতে যে প্রকার বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা পারসী, বাঙ্গলা এবং সংস্কৃত সংমিশ্রিত ছিল। কেবল বাঙ্গলা বর্ণমালায় লিখিত হইত মাত্র। কিন্তু তাহাকে ঠিক বাঙ্গলা ভাষা বলা যায় না এবং তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধবিচার কিছুমাত্র ছিল না। সেই সময়ে বাঙ্গলা অক্ষরের ছাপাখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থাতেই বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রথম মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময়েই রামমোহন রায় এবং গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য এক খানি ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ছিল। জনসমাজে তাহা সমাদৃত হয় নাই।

ইংরেজী ১৮৫৮ সালে বঙ্গীয় প্রথম ছোট লাট হোলিডে সাহেব সাময়িক বড়লাট ক্যানিং সাহেবের সম্মতিসূত্রে গ্রামিক বঙ্গবিদ্যালয় সমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দিবার বিধান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক যোগাইবার জন্য প্রধান প্রধান নগরে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে মাসিক ৫৲ টাকা

করিয়া ছাত্রবৃত্তি দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গলাভাষার উন্নতির তৃতীয় সোপান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান। সেই ১৮৫৮ সালে আমি যখন গ্রামিক বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম, তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারপ্রণীত শিশুশিক্ষা, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক অনূদিত বেতাল পঞ্চবিংশতি এইমাত্র গদ্যগ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল। আর পাদরী কীথ সাহেব ইংরেজী লেনিজ্ গ্রামারের অনুকরণে একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাই আমার প্রথম পাঠ্য হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক যত কেন তুচ্ছ না হউক, তাহাই ভাবী গ্রন্থকারদের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালাদেশে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব ছিলনা। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনে উদাসীন ছিলেন। যখন গ্রামে গ্রামে বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল তখন দেশীয় অনুরাগিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া বুঝিলেন এবং তাহার পুষ্টিসাধনে অনুরাগী হইলেন। শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রজ-কিশোর গুপ্ত রীতিমত বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকটিত করিলেন। অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ। তাহার পর গোবিন্দ রায় এবং লোহারাম শিরোরত্ন উৎকষ্টতর ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমেই সমধিক শ্রেষ্ঠতর ব্যাকরণসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজী পুস্তকের অনুসরণে বহুসংখ্যক গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া পাঠ্য পুস্তকের অভাব বিদূরিত করিলেন। বিদ্যাসাগর সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল সামান্যরূপ লেখাপড়া জানিতেন অথচ তদ্রচিত গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ গদ্য রচনা। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে, রচনা-

শক্তি একটি পৃথক গুণ। বিদ্যা পরিমাণসহ উক্ত গুণের কোন অনুপাত নাই।

বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের পর গদ্য, পদ্য, গান, নাটক রাশি রাশি প্রতি-বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষার পুরাতন রচনাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতিহাস, ভূগোল, আদিগণিত, বীজগণিত এবং রেখাগণিতও বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বহুতর সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিদেশীয় ভাষার অনুকরণে, অনুসরণেও বহুপুস্তক হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নূতন পুস্তকও অনেক হইয়াছে। সংবাদ পত্র, নাট্যাভিনয়, ব্রাহ্মসমাজ, যাত্রাগান দ্বারাও বঙ্গ-ভাষার যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছে। এখন পারসী ভাষা হইতে বাঙ্গালাভাষা শ্রেষ্ঠ বই অপকৃষ্ট নহে। নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুতর বিঘ্ন না ঘটিলে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ এত বেশি হইত যে, কোন ভাষা হইতেই বঙ্গভাষা হীনতর গণ্য হইত না: সেই বিঘ্নগুলির প্রতি সভাস্থ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

(১) বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক ইংরেজী ভাষার অত্যধিক চর্চ্চা। যখন অল্প পরিমাণ লোক ইংরেজী পড়িত তখন যে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, সেই গবর্ণমেণ্টের চাঁকরী অনায়াসে পাইত এবং জনসমাজে বিদ্বান্ লোক বলিয়া গণ্য হইত। সেই লোভে প্রলোভিত হইয়া বহু লোক আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিল। গ্রামে গ্রামে ইংরাজী স্কুল হইল এবং কলেজের সংখ্যাও চতুর্গুণ হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ বালক ইংরাজী পড়িতেছে—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে; অতি মন্থনে

অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। বালকেরা বর্ণপরিচয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করে আর সুদীর্ঘ কাল সেই বিজাতীয়, বিদেশীয় ভাষা পড়িতে পড়িতে তাহাদের দেহ এবং মন ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হয়। প্রচুর ধনক্ষয়ে তাহারা নিঃসম্বল দরিদ্র হয়। তাহারা অলস, বিলাসী এবং স্বার্থপরায়ণ হয়। অথচ অনেকেরই কোনরূপ উপার্জ্জন হয় না।

ইংরাজীভাষা ইংরাজদের জাতিভাষা। তাহা শিখিতে তাহাদের অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং শারীরিক কষ্টও অতি কম হয়। তাহারা লেখা-পড়া শিখিয়া সাংসারিক নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত হয়। তাহারা ধোপা, নাপিত, কামার, কুমাররূপে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশীয় কোন বালক ইংরাজী পড়িয়া কেবল লেখাপড়ার চাকরী, ওকালতী, মোক্তারী বা ডাক্তারী করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসা করিতে পারে না। এত বেশী লোকের মধ্যে অনেকেরই চাকরী যোটে না। আবার উকীল, মোক্তার, ডাক্তার এত বেশী হইয়াছে যে, ঐ ঐ ব্যবসায়ীর অনেকেরই জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায় হয় না। বাঙ্গালী পরিচারক অপ্রাপ্য, পাচক অপ্রাপ্য, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি ব্যবসায়ীর সংখ্যা আবশ্যক অপেক্ষা অনেক কম। অথচ কেরাণীগণের উমেদার অসংখ্য। সাধারণ পরিচারক ও মুটিয়া-মজুরে যাহা উপার্জ্জন করে, উপাধিধারী ভিন্ন নিম্নতর ইংরাজীনবিশ তত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না। সাধারণ চাকর একটু কষ্ট দেখিলেই চাকরী ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু বিদ্বান্ চাকর বহুকষ্ট ও অপমান সহ্য করিয়া থাকে তবু চাকরী ছাড়িতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষার বাহুল্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালী সমাজের যে গুরুতর অপকার হইতেছে তাহা গবর্ণমেণ্ট এবং বিজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই সকলেই অনুভব করিতেছেন সুতরাং তাহার অধিক লেখা অনাবশ্যক।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেন লোকে নিজ নিজ সন্তানগণকে ইংরাজী পড়ায়, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আজকাল ইংরাজী না জানিলে কোন উচ্চপদ পাওয়া যায় না; গবর্ণমেণ্টের চাকরী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা জানা আবশ্যক। জমিদার, মহাজনগণও ইংরেজীনবিশ কর্ম্মচারী চাহেন। যখন ইংরাজী না পড়িলে কোনই উন্নতির আশা নাই তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই আশা-বিমোহিত হইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বালকগণকে ইংরাজী পড়াইতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও নিষেধ করিতে পারেন না এবং করেন না। কেবল ছাত্র কমাইবার জন্য শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পাঠার্থী কম হয় নাই বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; পরন্তু পাঠের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্রদের অভিভাবকদিগের কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথচ অনেকেই বহুব্যয়ে বহু কষ্টে সুদীর্ঘ কাল ইংরাজী পড়িয়া শেষে দেখিতে পায় যে, তাহার পঠদ্দশায় মাসিক যে ব্যয় হইয়াছে, তত টাকা তাহার মাসিক উপার্জ্জন হয় না। তখন অতসীফুলের সহ ইংরাজী-শিক্ষার তুলনা করিয়া বলিতে হয় যে—

"সুবর্ণং সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্ন ভবিষ্যতি
আশয়া রোপিতং বৃক্ষং পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে !"

একজন নামজাদা বিলাতফেরতা বাবু তর্ক করেন যে, কেবল অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে বরং জ্ঞানলাভই প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ইংরাজী খুব ভাল জানেন অথচ বাঙ্গলা ভাষায় নিতান্ত অর্ব্বাচীন। তাঁহার তর্কের সদুত্তর এই যে, ইংরাজী ভাষায় যে শাস্ত্র পড়িলে যে পরিমাণ জ্ঞানলাভ হয়, জাতীয়ভাষায় তাহা পাঠ করিলে তদপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প জ্ঞান লাভ হয় না বরং অল্প ব্যয়ে অল্প কালে বিনা কষ্টে সমধিক বিজ্ঞতা জন্মে শ্রোতৃবর্গ মনে করিবেন না যে আমি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী। আমার

অভিপ্রায় এইমাত্র যে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ইংরেজী পড়ুক। তাহারা সহজেই ভাল উপার্জ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের উপকার হইতে পারিবে; ইংরাজী শিক্ষিত দরিদ্র লোকদ্বারা অনেক কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে এখানে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্যক। কলিকাতায় কতিপয় বিএ, এম্‌এ, উপাধিধারী মিঠাইদোকান, সেলাইএর দোকান এবং ছুতারী-দোকান করিয়াছেন। এ সমস্ত কার্য্যের জন্য এত ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী পড়িবার আবশ্যক কি? এখন ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতিশয় বেশী হওয়াতে যে, দেশের বিবিধ প্রকার অনিষ্ট হইতেছে ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীস্বীকৃত। সেই অনিষ্ট নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে কুফল ভিন্ন সুফল কিছুই নাই। যাবৎ বাঙ্গালা পড়িলে লোকে উচ্চপদ না পাইবে ততদিন ইংরাজী পাঠার্থীর সংখ্যা কম হইবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় সুবিজ্ঞ লোকের সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদই লাভ হইতে পারিবে আর ইংরাজী উপাধিধারীদিগের সমাদর ও দাবী বাঙ্গালা উপাধিধারীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র বেশী হইবে না। তাহা হইলেই ইংরাজী পড়ার আকর্ষণ কমিয়া যাইবে। আর পল্লীগ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাহা হইলেই ইংরাজী-চর্চ্চা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

এখন সমস্ত উচ্চ শিক্ষা ইংরাজীতে হয়; স্থানে স্থানে সংস্কৃতেও কিছু হয়। বাঙ্গালাভাষায় কোন উচ্চশিক্ষা হয় না। সেইজন্য বাঙ্গালাভাষায় উচ্চ শাস্ত্রাদি পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয় না, যদি হয় তবে তাহা অনাদরে বিলুপ্ত হয়। আমার বন্ধু বরদাকান্ত মিত্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালাভাষায় উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক রচনা করা জ্ঞানকৃত মহাপাপ। উহা কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া পড়ে না এমন কি বিনামূল্যে দিয়া অনুরোধ

করিলেও কেহ তাহা পড়িতে চায় না। কারণ যাহারা অশিক্ষিত উচ্চ সাহিত্যাদি তাহাদের বোধগম্য হয় না। শিক্ষিত বিদ্বান্ লোকেরা বাঙ্গালা পুথি পড়া অপমানকর বোধ করেন। তাহারা ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত পড়ে কদাচ বাঙ্গালা পড়ে না"। সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গলা গ্রন্থের পাঠক নাই"। তাঁহার এই বাক্যের যাথার্থ্য আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; যাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা না হইবে তবেৎ এই দোষের শান্তি হইবে না। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শাস্ত্র শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক নাই, তাহাতে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব। তাহার সহজ উত্তর এই যে, প্রয়োজন না থাকাতেই তাদৃশ গ্রন্থ তৈয়ারী হয় নাই; বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব নাই; যে প্রকার গ্রন্থ যখন আবশ্যক হইবে তখনই তাহা প্রকটিত হইতে পারিবে। তখন বাঙ্গালীরা অতি অল্প পরিশ্রমে, অল্প ব্যয়ে, অল্পকালে বিদ্বান্ হইতে পারিবে এবং বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের সমীচীন উন্নতি হইতে পারিবে।

ইংলণ্ডে যতদিন লাটিন ভাষায় উচ্চ শিক্ষা হইত ততদিন তাহাদের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। জাতীয় ভাষায় উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হওয়া অবধি জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ভাবের সমুন্নতি হইয়াছে। জাপানীরা ইংরাজী ভাষায় মার্কিন দেশে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশে জাতীয় ভাষায় তাহা শিক্ষা দিয়া অতি শীঘ্র সমস্ত বিষয়ে মহোন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব যাহাতে ইংরাজীর চর্চ্চা কম হইয়া জাতীয় ভাষার প্রসার হয়, তদর্থে চেষ্টা করা বাঙ্গালীর একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা সভা করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কোন উপকার হইবে না।

(২) বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুন্নতির দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বুঝিয়াছি জমিদারদিগের দারিদ্র্য-দশা। বুনিয়াদি বড়-মানুষের সকলেরই কতকগুলি

সৎক্রিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। তাহা তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। পূর্ব্বে সেই সকল কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইত এখন সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সেই ব্যাপারের ব্যয় চতুর্গুণ হইয়াছে। জমিদারগণের ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি হয় নাই। শস্যের মূল্য বৃদ্ধিহেতু জমা-বৃদ্ধির বিধান আইনে আছে বটে, কিন্তু আইন ও আদালতের কূটনীতিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। কাজেই জমিদারগণের অবস্থা মন্দ। যাহাদের বাণিজ্য, মহাজনী প্রভৃতি প্রধান ব্যবসায় তৎসঙ্গে সঙ্গে জমিদারী আছে তাহাদেরই অবস্থা ভাল। নতুবা জমিদারীই যাহাদের একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের কাহারো অবস্থা স্বচ্ছল নহে। বরং অনেকেই ঋণগ্রস্ত। বুনিয়াদি জমিদারেরা প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিদ্বানের আদর করিতেন। এখনও তাঁহারাই জাতীয় বিদ্যার উন্নতি চেষ্টা করেন বটে কিন্তু অর্থের অনাটনহেতু প্রচুর সাহায্য করিতে পারেন না। অপর বিদ্যোৎসাহী মধ্যে উকীল ও মোক্তারগণ এখনও সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। কিন্তু তাঁহাদেরও অবস্থা তত ভাল নহে। আমি সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ঘুরিয়া দেখিলাম যে, কেবল দুই শ্রেণী লোকের উন্নতি আর সকলেরই অবস্থার অবনতি হইতেছে। কর্ষক লোকদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা এখনও মূর্খ ও দরিদ্র। তাহাদের দ্বারা বিদ্যোন্নতির কোন সাহায্য হইতে পারে না। আর বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকদের মহোন্নতি হইতেছে। সেই বণিক মধ্যে হিন্দুস্থানী বণিকই অধিক। প্রত্যেক সহরে, বন্দরে, হাটে-বাজারে এমন কি অধিকাংশ পল্লীগ্রামে হিন্দুস্থানীর দোকান আছে। বাঙ্গালাদেশে তাহাদিগকে খোট্টা বা কাঁইয়া বলে। তাহারা অনেকে জমিদারী, তালুকদারী খরিদ করিয়া বড়লোক হইয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্খ। বিদ্যার উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি

কাহাকে বলে তাহা তাহারা বুঝে না এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন ব্যয় বা পরিশ্রম করে না। বাঙ্গালী শেঠ-মহাজনেরাও অনেকেই বাণিজ্য দ্বারা বড় হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু তাহারাও মূর্খ। বিদ্যার উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে তাহা তাহাদের বোধগম্যই হয় না। সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদের দ্বারাও কোন সাহায্য হইতে পারে না। মূর্খ কর্ষক ও বণিকদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও রাজপুরুষেরা উৎসাহ দিলে তাহারা আর্থিক-সাহায্য করিতে পারে, নতুবা তাহাদের সাহায্য আশা করা যায় না।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের তৃতীয় বিঘ্ন অর্ব্বাচীন ধনীদের উপাধি-লিপ্সা। গবর্ণমেণ্ট যে সকল লোকদিগকে রাজভক্ত বা সদাশয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে সেই উপাধি যোগ্যপাত্রে দেওয়া হয় না। যেমন একটি লোকের একবিঘা জমিও নাই, সে ভাড়াটিয়া বাড়াতে বাস করে। সে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের চাটুকারী করিল, অমনি সে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি পাইল। একজন বণিক যৎকিঞ্চিৎ জমিদারী খরিদ করিয়াছিল। সে যাবজ্জীবন কৃপণতা করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা জোটাইয়া দান করিল, অমনি তাহার 'রাজা' বা 'মহারাজা' উপাধি হইল। ঐ সকল উপাধিদ্বারা কোন সম্পত্তি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় না। গবর্ণমেণ্টে উপাধিধারীর বাহিক কিছু সম্মান হয় বটে কিন্তু সেই সম্মান রক্ষা করিতে তাহাদের বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য হয়। দেশীয় লোকেরা কেহ সেই উপাধি উল্লেখ করে না বরং উপহাস করিয়া থাকে। দেশের বিদ্বান্ লোকেরা ঐ সকল উপাধিগুলিকে কেহ ব্যাধিবিশেষ, কেহ জেলবিশেষ, কেহ বা ক্লীবের বিবাহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অনেক অদূরদর্শী ধনীর পক্ষে ঐ সকল উপাধি মারাত্মক ব্যাধিবিশেষ

হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সর্ব্বপ্রকার সদ্ব্যয় ত্যাগ করিয়া যাহা সঞ্চয় করে তাহা সমস্ত এবং ঋণ করিয়া যাহা আনিতে পারে তাহা সমস্ত কোন রাজপুরুষের হস্তে সদ্ব্যয়ের জন্য ন্যস্ত করিয়া উপাধি লাভের চেষ্টা করে। তাহারা যদি কখন একটি পয়সা দান করে অমনি একটাকা খরচ করিয়া কোন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তারযোগে নিজ দাতৃত্ব-সংবাদ পাঠায়। এরূপ ব্যয়ে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়ে। স্বদেশের মঙ্গলার্থ অর্থব্যয় করিতে তাহাদের সামর্থ্য থাকে না এবং ইচ্ছাও থাকে না। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দোষ নাই বরং অদূরদর্শী ধনীদের স্বকল্পিত অলীক বিশ্বাসই উক্ত দোষের মূল। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, লালগোলার রাজা কেবল দেশীয় নিয়মে সদ্ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন; কাশীমবাজারের মহারাজ স্বদেশের শিল্প-সাহিত্যাদির উন্নতিকর কার্য্যে একান্ত ব্রতী থাকিয়াও গবর্ণমেণ্টে বিলক্ষণ সম্মানিত আছেন। তাহাতে অনুমান হয় যে, উপাধি-লালায়িত ধনীগণ স্বদেশীয় লোকের এবং ভাষার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিলেও গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্টকর্তৃক সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচার হওয়ার চতুর্থ প্রতিবন্ধক মুসলমান-বিচ্ছেদ। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে রাজসাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কিছু কম। সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ধরিয়া গণনা করিলে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান। এজন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবাক্যে স্বদেশের এবং জাতীয় ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিলেই সহজে সুফল হইতে পারে।

বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিতৃষ্ণ হইয়া পারসী পড়িতেছে। অথচ তাহাতে তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই নাই।

বাঙ্গলাভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা। তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা ও বৈষয়িক কাজকর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় হয়। পারশী তাহাদের ধর্ম্মভাষা নহে। তাহাদের ধর্ম্মভাষা আরবী প্রায় কেহই পড়ে না। মুসলমান নবাব ও বাদশাহগণ পারসীভাষী ছিলেন। তজ্জন্য মুসলমান রাজত্বকালে পারসী রাজভাষা ছিল। এইজন্য সেই সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই পারসী শিখিত। এখন পারসী বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্ম্মভাষা, রাজভাষা বা জাতীয়ভাষা নহে তবে তাহা পড়িয়া অযথা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা পড়াই বিহিত। সাধ্য হইলে রাজভাষা ইংরেজী এবং ধর্ম্মভাষা আরবী পড়া উচিত বটে। তুরুষ্ক, মিশর, মোরক্কো দেশীয় মুসলমান-রাজ্যসমূহে কেহ পারসী পড়ে না। ফলতঃ মুসলমান ধর্ম্মেরসহ পারসীর কোনই সম্বন্ধ নাই। অতএব বঙ্গীয় মুসলমানদের পারসী ছাড়িয়া যথাসাধ্য বঙ্গভাষার উন্নতির চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

বৈদিক-সাহিত্য।*

খ্রীষ্টান বাইবেলকে, মুসলমান কোরাণকে, হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় মনে করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ মানবই এই গ্রন্থগুলির অনুশাসনে পরিচালিত হইতেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা কেবল বেদশাস্ত্রেরই আলোচনা করিব।

'বেদ' প্রধানতঃ দুই প্রকার :—(১) ক্৯প্ত ও (২) কল্প্য। হিন্দু-সাহিত্যে দেখিতে পাই :—

"যা তু স্মৃতি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা ক্৯প্তা।"

আর "যা তু সদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্যা।"

অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে তাহা 'ক্৯প্ত' শ্রুতি, আর স্মৃতি ও সদাচার-বলে যাহা কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা 'কল্প্য' শ্রুতি। সরল-হৃদয় আর্য্যগণ প্রকৃতির বৈচিত্র্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যে সকল স্তব-স্তুতি গাহিয়া গিয়াছেন তাহাই ক্৯প্ত, ইহা ঋগাদি চারি ভাগে বিভক্ত। আর কল্প্যশ্রুতি সাময়িক কল্পনামাত্র, মানবের আচার-ব্যবহার কালে-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে সামাজিক অনুশাসন-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ থাকিত। ইহারই ফলে আজও আমরা হিন্দুসাহিত্যে সত্য ত্রেতাদি বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহারের উল্লেখ ও উদাহরণ পাই। সময়-বিশেষে এক এক প্রকার কল্পনা করিয়া লইতে হইত বলিয়া ইহার নাম কল্প্য শ্রুতি।

'ক্৯প্ত শ্রুতি' মন্ত্র-ভেদানুসারে ত্রিবিধ ঋক্, যজুষ্ ও সাম মন্ত্র। পঞ্চ

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত।

ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম "ঋক্", গদ্য ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম "যজুঃ" এবং ছন্দোবদ্ধ গেয় মন্ত্রের নাম "সাম"। এই কৃ১গু" শ্রুতি গ্রন্থভেদানুসারে আবার চতুর্ব্বিধ যথা,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ। ঋগ্বেদে পদ্যমন্ত্র, সামবেদে ছন্দোবদ্ধ গেয় মন্ত্র, যজুর্ব্বেদে গদ্য মন্ত্র ও অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত বেদত্রয়ের মিশ্রিত মন্ত্র-সমষ্টি।

'কৃ১গু-শ্রুতি' আবার কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ব্বোক্ত বেদ চতুষ্টয়ের সমস্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহের কোন কোন অংশ কর্ম্মকাণ্ড, আর উপনিষৎগুলি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

কর্ম্মকাণ্ড 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ' ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল বাক্যে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনার সহিত কোন দেবতাবিশেষকে উপলক্ষ্য করা হয় তাহা মন্ত্র, আর যে সকল গদ্যগ্রন্থে কোন মন্ত্র কি কার্য্যে প্রযুক্ত ইহার উল্লেখ আছে, অথবা মন্ত্রসমূহের বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভাগ আবার 'বিধি' ও 'অর্থবাদ' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রাহ্মণসমূহের যে অংশে যজ্ঞীয় মন্ত্রের বিনিয়োগ সহ, যজ্ঞ-নির্ব্বাহের প্রণালী লিখিত আছে, তাহা 'বিধি' আর মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাবিশিষ্ট অংশের নাম 'অর্থবাদ'।

'বিধি' আবার দুই প্রকার—'অজ্ঞাতজ্ঞাপক' ও 'অপ্রবৃত্ত প্রবর্ত্তক'। আর্য্য-কালে যে সকল যজ্ঞের বিলোপ ঘটিয়াছিল, যাহাতে সেই সকল যজ্ঞের বিধান বর্ণিত আছে, তাহা 'অজ্ঞাত-জ্ঞাপক'; আর, পরবর্ত্তী-কালে যে সকল নব নব যজ্ঞের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তক।

এই গেল বৈদিক-সাহিত্যের মোটামোটি কথা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থভেদানুসারে বেদ চারি প্রকার, এখন তাহারই আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ যজুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'। তৈত্তিরীয়-সংহিতার অপর নাম কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ

সংহিতা, নব্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। 'চরণ ব্যূহ' মতে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা, আর পতঞ্জলির মতে ১০০ শাখা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ১২টি শাখা ও ১৩টি উপশাখার বেশী পাওয়া যায় না। বারটি শাখা যথা:—(১) চরক, (২) আহ্বারক, (৩) 'কঠ' বা 'কাঠক', (৪) প্রাচ্যকঠ, (৫) কাপিষ্ঠ কঠ, (৬) চারায়ণীয়, (৭) বারতন্তবীয়, (৮) শ্বেত, (৯) শ্বেততর (১০) ঔপমন্যব, (১১) পাতাণ্ডিনেয়, (১২) মৈত্রায়নীয়। এই বারটি শাখার প্রশাখা-সমষ্টি ত্রয়োদশ—'চরক' শাখার প্রশাখা দুইটি—'ঔখীয় ও 'খাণ্ডীকীয়, খাণ্ডীকীয় প্রশাখার উপশাখা পাঁচটি—'শাট্টায়নী, 'হিরিণ্য-কেশী' 'বৌধায়নী', 'সত্যাষাঢ়ী' ও 'আপস্তম্ব'। মৈত্রায়নীয় শাখার প্রশাখা ছয়টি—'মানব' 'বারাহ' 'ছাগলেয়' 'হারিদ্রবীয়' 'দুন্দুভ' ও 'শ্যামায়নীয়'। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগবিশিষ্ট কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে অষ্টাদশ সহস্র যজুর্মন্ত্র আছে। ইহার মন্ত্রভাগ তৈত্তরীয় সংহিতায় সাতটি অষ্টক ও প্রত্যেক অষ্টকে সাত আটটি করিয়া অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির অপর নাম 'প্রশ্ন' এবং অষ্টকগুলির অপর নাম প্রপাঠক। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় অনেকগুলি অনুবাকে বিভক্ত, এই গ্রন্থে সাত শত অনুবাক আছে। ইহাতে কোনও মানব ঋষির নাম পাওয়া যায় না। প্রজাপতি সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবগণই ইহার ঋষি। এই গ্রন্থে নৃমেধ, পিতৃমেধ, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিঃষ্টোম, রাজসূয় ও অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই গেল কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ডের কথা, ইহার জ্ঞানকাণ্ডে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ প্রভৃতি এবং মৈত্রায়নীয় শাখার মৈত্রায়নীয় উপনিষৎ, কঠ শাখার কঠোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, নারায়ণোপনিষৎ এবং বারুণি উপনিষৎ প্রভৃতি।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অপর নাম 'বাজসনেয়ী-সংহিতা'। যোগীশ্বর 'যাজ্ঞবল্ক্য'

ইহার ঋষি। ইহাতে ১৯০০ শত এবং ইহার ব্রাহ্মণে ৭৬৭০ শত যজুর্মন্ত্র আছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ১৫টি শাখা:—(১) কাণ্ব, (২) মাধ্যন্দিন, (৩) জাবাল, (৪) শাকেয়, (৫) বুধেয়, (৬) তাপনীয়, (৭) কাপীল, (৮) পৌণ্ড্রবৎস, (৯) আচটিক, (১০) পরমাবটিক, (১১) বৈনেয়, (১২) পারাশরীয়, (১৩) বৌধেয়, (১৪) গালব ও (১৫) ঔধেয়। বাজসনেয়ী-সংহিতা চত্বারিংশ অধ্যায়ে এবং ৪৮৬টি অনুবাকে বিভক্ত। ইহাতে অনেক ঋঙ্‌মন্ত্র পাওয়া যায়। 'দশ পৌর্ণমাস' 'পিতৃপিণ্ডযজ্ঞ' 'অগ্নিষ্টোম' 'বাজপেয়' 'রাজসূয়' 'অগ্নিহোত্র', 'চাতুর্মাস্য' 'ষোড়শী' 'অগ্নিচয়ন' 'চরক সৌত্রামণি' 'অশ্বমেধ' 'পিতৃমেধ' 'সর্ব্বমেধ' 'পুরুষমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণে এই গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ। এই পাঠে বৈদিক যুগের আচার-ব্যবহারাদি অনেক জানা যায়।

বিখ্যাত 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' শুক্ল-যজুর্ব্বেদের 'মাধ্যন্দিন' শাখার অন্তর্গত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে ১০টি কাণ্ড ও দ্বিতীয় ভাগে ৪টি কাণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কাণ্ডিকা আছে। বিখ্যাত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইহার চতুর্দ্দশ কাণ্ডের অন্তর্গত।

এই গেল যজুর্ব্বেদের কথা, এখন 'সামবেদ সম্বন্ধে বলিতেছি, পুরাণ-মতে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে সকলগুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র পাঁচটি শাখা অবশিষ্ট আছে। যথা—'রামায়ণী', 'শাট্যমুগ্র', 'কাপোল', 'মহাকাপোল', 'কৌথুম', 'লাঙ্গলিক', ও 'শার্দ্দূলীয়',। এই শাখাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'কৌথুম' শাখার ছয়টি প্রশাখা পাওয়া যায়—'আসুরায়ন', 'বাতায়ন', 'নৈগেয়', 'প্রাচানযোগ্য', 'প্রাঞ্জলীয়' ও 'বৈনধৃত'।

সামবেদের মন্ত্র-পরিমাণ 'চরণব্যূহ' মতে ৮০১৪, যথা—

"অষ্টৌসাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ"।

কিন্তু সামবেদের বর্ত্তমান সংস্করণের মন্ত্র পরিমাণ এতদপেক্ষা অনেক কম।

সামবেদ প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্ব-সংহিতা ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত, ইহার অপর নাম 'ছন্দ-আর্চ্চিক', ইহা ছান্দোগ্য পুরোহিতগণের অবশ্য পাঠ্য। এই অংশকেই তান-লয়সংযুক্ত স্বর-প্রক্রিয়া অনুসারে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া 'গ্রামগেয়গণ' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। সামবেদীয় উদ্‌গাতৃগণ ইহাই গান করিতেন, ইহাকেই সপ্তদশ সাম বলে। সামবেদের উত্তর ভাগের নাম 'উত্তরার্চ্চিক' বা আরণ্যগণ। বঙ্গদেশে সামবেদের কৌথুমী শাখা ব্যতীত অপর কোনও শাখার প্রচলন নাই। এই গেল সামবেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগের কথা। ইহার ব্রাহ্মণ ভাগে নয় খানি প্রধান গ্রন্থ আছে, যথা—'আর্ষেয়' 'দেবতাধ্যায়' 'বংশ' 'সামবিধান' 'অদ্ভুতব্রাহ্মণ' 'ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণ' 'পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ' 'তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ' এবং 'সংহিতোপনিষৎ-ব্রাহ্মণ'।

সামবেদের প্রধান উপনিষৎ দুই খানি—ছান্দোগ্য এবং কেন, নাতি-পরিপূর্ণ ছান্দোগ্য উপনিষদে আটটি প্রপাঠক আছে। পঞ্চম প্রপাঠকের আত্মবিষয়ক ও ব্রহ্মবিষয়ক তর্ক ও সিদ্ধান্ত অতি মনোরম। কেনোপনিষৎ চারি কাণ্ডে সম্পূর্ণ এবং ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় ইহার কলেবর পরিপূর্ণ। সামবেদের সংহিতা ও মন্ত্রভাগের প্রধান ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য। ইহার ভাষ্যের নাম বেদার্থ প্রকাশ।

অতঃপর অথর্ব্ববেদের কথা বলিব, 'চরণব্যূহ' মতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-পরিমাণ ১২৩০০ শত। যথা—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতাণি চ"

কিন্তু আজকাল কেবলমাত্র ৭০০০টি মন্ত্র পাওয়া যায়, বাকী ৫৩০০

মন্ত্র বিলুপ্ত। অথর্ব্ববেদ ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা-(১) পৌপ্পল পাদ, (২) শৌনকীয়, (৩) দামোদ, (৪) তোত্তায়ন, (৫) ব্রহ্মপালাশ, (৬) জায়ল, (৭) চারণবিদ্যা, (৮) দেবদর্শী; (৯) কুনখা। অথর্ব্ববেদের বহুসংখ্যক শাখা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কেবলমাত্র শৌনকশাখা পাওয়া যায়। এই শৌনকশাখা বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক কাণ্ড আবার কয়েকটি অনুবাকে, অনেকগুলি সূক্তে ও বহুসংখ্যক ঋকে বিভক্ত। ইহাতে শত্রুপীড়ন, আত্মরক্ষা ও বিপদ দূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বহুপ্রকার মন্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বোধ হয়, তন্ত্রের ষটকর্ম্ম (মারণ, বিদ্বেষণাদি) অথর্ব্ববেদ হইতে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

অথর্ব্ববেদের জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি উপনিষদ আছে, যোগতত্ত্ব, সন্ন্যাস, আরুণীয়, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্মা, নৃসিংহ-তাপনীয়, কেনেষিত, নারায়ণ, বৃহন্নারায়ণ, হংস, পরমহংস, আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী, গরুড়, কালাগ্নিরুদ্র, রামতাপনীয় কৈবল্য, জাবাল, মণ্ডুক, প্রশ্ন, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চুলিকা, গর্ভ, মহা, ব্রহ্ম, প্রাণোগ্নিহোত্র, মাণ্ডুক্য, নীলরুদ্র, অথর্ব্বশিরস, আশ্রম প্রভৃতি।

অতঃপর ঋগ্বেদের কথা বলিতে হইল, 'চরণব্যূহ' মতে ঋগ্বেদসংহিতায় দশ হাজার পাঁচ শত আশীটি ঋক্ আছে যথা;—

"ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপারায়ণমুচ্যতে।"

কিন্তু বর্ত্তমানে ১০৭১৭ টি ঋক্ মাত্র পাওয়া যায়, 'শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য' মতে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখা, যথা—'আশ্বলায়ন', 'শাকল', 'বাস্কল', 'শাঙ্খ্যায়ন' ও 'মাণ্ডুক'। ঋগ্বেদের উপশাখা অনেক, যথা,—'ঐতরেয়ী', 'পৈঙ্গী', 'শৈশিরী', 'কৌষিতকী', 'মুদ্‌গল', 'গোকুল', 'বাৎস্য', 'শিশির',

প্রভৃতি। যে ঋষি বা আচার্য্য যে শাখার প্রবর্ত্তক তাঁহার নামানুসারে তৎপ্রবর্ত্তিত শাখার নামকরণ হইয়াছে। যেমন শাকল ঋষির প্রবর্ত্তিত শাখার নাম শাকল শাখা ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণমতে মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির ও শিশির এই পাঁচটি শাখা শাকল-শাখার প্রশাখামাত্র; এবং এই পাঁচটি শাখার প্রবর্ত্তক ঋষি-পঞ্চক শাকলের শিষ্য। এতগুলি শাখা-প্রশাখার মধ্যে বর্ত্তমানে ঋগ্বেদের কেবলমাত্র শাকল শাখাটি বিদ্যমান আছে। যেমন দ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন, তেমনি 'শাকল' শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তন করিয়া 'বেদমিত্র' নামে খ্যাত হন। ইনি বৈদিক-সাহিত্যের অধ্যয়ন-প্রণালী প্রবর্ত্তক। ঋগ্বেদীয় পুরোহিতগণের নাম বহ্বৃচ।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০১৭টি সূক্ত, ২০০৬টি বর্গ, ৬৪টি অধ্যায়, ৮টি অষ্টক, ১০টি মণ্ডল এবং কিঞ্চিদধিক এক সহস্র অনুবাক আছে। কতকগুলি বেদমন্ত্রের সমষ্টির নাম সূক্ত; এক বিনিয়োগ-উদ্দেশ্যে এক ঋষি কর্ত্তৃক এক দেবতা-স্তোত্র-জ্ঞাপক যতগুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাই সূক্ত। সূক্ত আবার নানা প্রকার—মহাসূক্ত, মধ্যমসূক্ত, ও ক্ষুদ্রসূক্ত। শৌনক বলেন—

"দশার্কত্তায়া অধিকং মহাসূক্তং বিচক্ষ্ণাঃ"

দশটি ঋকের অধিক ঋক্ যে সূক্তে আছে তাহা মহাসূক্ত। পাঁচের অধিক এবং দশের অনধিক ঋক্ এক সূক্তে থাকিলে তাহা মধ্যমসূক্ত, এবং পাঁচ বা তন্ন্যূন সংখ্যক ঋক্ থাকিলে ক্ষুদ্রসূক্ত।

এই সকল সূক্ত আবার 'ঋষিসূক্ত', ছন্দসূক্ত' ও দেবতাসূক্ত ভেদে ত্রিবিধ, যথা—একজন ঋষির সঙ্কলিত যতগুলি সূক্ত একত্রে আছে, তাহা একটি ঋষিসূক্ত, একছন্দে রচিত যতগুলি সূক্ত একত্রে আছে, তাহা একটি ছন্দসূক্ত এবং যতগুলি একত্রিত সূক্তে এক দেবতার স্তোত্র

করা হইয়াছে, তাহা লইয়া একটি দেবতাসূক্ত। যাহা একটি ঋষিসূক্ত, স্থলবিশেষে তাহাই একটি ছন্দসূক্ত ও দেবতাসূক্ত উভয়ই হইতে পারে। যেমন—ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৯ম পর্য্যন্ত ৬টি ঋক এক মধুচ্ছন্দাঃ ঋষি-বিরচিত বলিয়া একটি ঋষিসূক্ত, ইহাতে এক ইন্দ্রদেবের স্তব করা হইয়াছে বলিয়া ইহা একটি দৈবতসূক্ত, আবার এক গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া এক ছন্দঃসূক্ত।

প্রত্যেক সূক্তেরই ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ আছে। সম্বন্ধে নিরুক্ত বলিতেছেন——

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ",
যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
যদক্ষর পরিমাণং তচ্ছন্দঃ।

এইরূপে বৈদিক-সাহিত্যসম্বন্ধে আমাদের কত কথা জানিবার রহিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী

ভারতীয় কলা-শিল্প।

The Gandhar or Peshwar Sculptures would be admitted by most persons competent to form an opinion to the best specimens of the plastic arts ever known to exist in India. Yet even these are only schools of the 2nd rate Roman art of the 3rd and 4th Centuries. In the Elaboration of minute intricate and often extremely pretty ornamentation on stone,